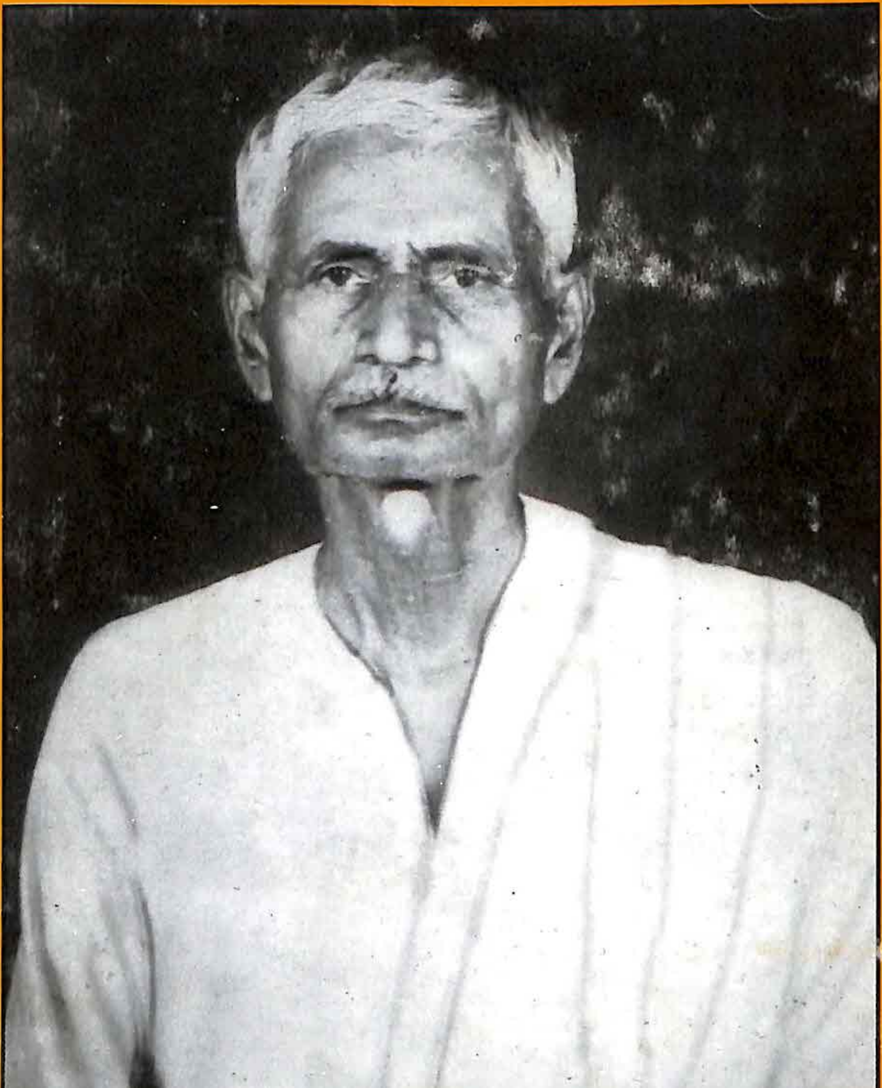
কিছু কথা, কিছু অনুভব

রমণীমোহন মাইতি



পশ্চিমবঙ্গ
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ
পরিষদ গ্রন্থাগারে
শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রদত্ত হল :

আলোকনাথ মাইতি
রাজ্য
শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ
১৩ জানুয়ারী ২০০২

কিছু কথা, কিছু অনুভব

কিছু কথা, কিছু অনুভব

রমণীমোহন মাইতি

সম্পাদনা
ড. প্রভাতকুমার দাস

মোহন-মায়া প্রকাশন উদ্যোগ

Kichu Katha, Kichu Anubhab (Collection of Essays and Poems)
by RAMANIMOHAN MAITY

র ম ণী মো হ ন মা ই তি জ ন্ম শ ত ব র্ষ সূ চ না উ প ল ক্ষে
প্রকাশ ১ ফাল্গুন ১৪০৬। ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০০

প্রচ্ছদ : প্রভাতকুমার দাস

প্রকাশক : শ্রীমতী আলপনা মাইতি
মোহন-মায়া
টাঁঠারিবাড়, দক্ষিণ কাশিমনগর
মেদিনীপুর ৭২১ ৬৩২

পরিবেশক : দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক : সার্ভিস প্রিন্টার্স
৫৫/৬৪ কালীচরণ ঘোষ রোড, কলকাতা ৭০০ ০৫০

দক্ষিণা : ১৩০ টাকা

সূচি

অনুসন্ধান

কবিতা

পরিশিষ্ট

সম্পাদকের প্রণিপাত

বছর কয়েক আগেও তাঁর নিজের গ্রাম টাঠারিবাড় সংলগ্ন এলাকায় একটি পরিচিত দৃশ্য দেখা যেত, সকালে কিংবা বিকালে— মাটির রাস্তায় মন্থর পায়ে হেঁটে চলেছেন এক প্রবীণ মানুষ, খালি পা, হাঁটুর উপরে ধুতি, অধিকাংশ সময় খালি গা,—কিংবা যৎসামান্য একটি ফতুয়া মাত্র, কাঁধে সাদা উত্তরীয়, প্রচণ্ড রৌদ্রে সেটি কখনো পাগড়ি হয়ে যায় মাথায়। কোনো দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই, ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি কিংবা ওড়িয়া ভাষায় লেখা হাতে ধরা একটি বইয়ের পাতায় নিবিষ্ট হয়ে তিনি পথ হাঁটছেন, বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলেছেন দক্ষিণ কাশিমনগর বাজারের পথে কিংবা খালপাড় ধরে সোজা দক্ষিণে হরিখালি কিংবা সুদূর উত্তরে মহিষাদল তাঁর গন্তব্য। তারও বিশ তিরিশ বছর আগে, সেই একই মানুষকে দেখা যেত অন্য চেহারায়, দশটা পাঁচটা গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতার সময়টুকু বাদ দিলে—ভোর থেকে রাত—ইউনিয়ন বোর্ডের ঋণ-ডোল রিলিফ-সালিসির ব্যস্ততা। কোনো কোনো দিন এমন হয়েছে সাইকেল থামিয়ে হঠাৎ নেমেছেন কোনো প্রাক্তন বা বর্তমান ছাত্রের বাড়িতে, নিজেই চেয়ে নিয়েছেন দিনের খাবার, কিংবা বাড়ি যাওয়ার সময় হবে না বলে অল্প সামান্য মুড়ি ওড়নার খুঁটে বেঁধে নিয়ে, আবার সাইকেলে উঠে সোজা পৌঁছে গেছেন স্কুলে। হয়তো স্কুল বসে গেছে তখন— সোজা ঢুকে গেছেন ক্লাসে, জিরোনোর অবকাশ নেই, শুকনো মুড়ি খেতে খেতে পড়াচ্ছেন, সেদিনের মধ্যাহ্নভোজন বলতে তা-ই। তখন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট তিনি, তাঁর দায়-দায়িত্ব কত। সহায়সম্বলহীন কোনো বৃদ্ধা বিধবা হয়তো আসতে পারছেন না, বর্ষায় কাদা রাস্তায় হেঁটে সরকারি ডোল-রিলিফের দান গ্রহণ করতে, সুতরাং তিনি নিজেই চাল-গম বেঁধে নিয়ে একহাঁটু কাদা ভেঙে পৌঁছে দিয়েছেন তাঁর কুঁড়েঘরে। অন্য কারো উপর এ দায়িত্ব তিনি ছেড়ে দিতে পারেন না, কেননা যদি যার পাওয়ার কথা সে যথাসময়ে কিংবা আদৌ না পায় এই সন্দেহে।

মেদহীন দীর্ঘ ঋজু দেহ, নিজের নামের অর্থ সার্থক করে উজ্জ্বল গৌরবর্ণ মানুষটি প্রকৃতপক্ষে রূপবান। নিজে প্রায়ই বলতেন 'লগনচাঁদা' লোক তিনি, তাঁর লগ্নে রাহু— বহু মানুষ ঘুরবে তাঁর পিছু পিছু,— অবশ্য তাঁর জীবনে একথা সত্য হয়েছিল। তাঁর জনপ্রিয়তা, সম্মান নিজের এলাকা ছাড়িয়ে বহু দূর দূর গ্রামে-জনপদে প্রসারিত হয়েছিল। রাস্তা দিয়ে চলে গেলে মাথা নিচু করে সরে দাঁড়ায় মানুষ জন, প্রণাম করে, তাদের পরম শ্রদ্ধেয় 'মাস্টারমশাই'কে, খুব কাছের মানুষ, প্রাণের মানুষ বলে মনে করে তারা। মহাত্মা গান্ধীর ভাবশিষ্য, সাদাসিধে সরল প্রকৃতির, শতাব্দীর সমান বয়সী সত্যনিষ্ঠ মানুষটিকে তাঁরা 'জালপাই-এর গান্ধী' বলে জানে, হয়তো চেহারায়, চলাবলায় গান্ধী মহারাজের সঙ্গে মিল আছে বলে। ভক্তি, জ্ঞান ও কর্মযোগের প্রেরণায় তাঁর

পঞ্চনবতি- উত্তীর্ণ দীর্ঘ জীবনযাপন, আমাদের দেখাশোনার জগতের বিরল অভিজ্ঞতা।

বস্তুতপক্ষে রমণীমোহন একেবারে শৈশব অবস্থা থেকেই নানা কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়েই বড় হয়েছেন। পড়াশুনা ছাড়াও নাটকের প্রতি তাঁর এতটাই আগ্রহ ছিল যে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়বার সময় যাত্রাপালা লেখাতেও হাত দিয়েছিলেন। আজীবন নাট্যাভিনয়ের প্রতি তিনি গভীর অনুরাগ পোষণ করে গেছেন। বাল্যাবস্থায় যিনি পিতাকে হারিয়েছেন, সংগীত কিংবা নাটকের আকর্ষণে, নিছকই আমোদ-প্রমোদের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলাটাই হয়তো তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারত, কিন্তু পরিবর্তে তাঁর সে জীবন ধীরে ধীরে দেশ ও দশের প্রয়োজনেই উৎসর্গীকৃত হতে পেরেছে। ছাত্র হিসেবে মেধাবী হয়েও, দারিদ্র্যের প্রতিবন্ধকতা জয় করেছেন, তাঁর অমিতশক্তিময়ী মা, অভিভাবক দুই নিঃসন্তান কাকা এবং বহু বিচিত্র বিষয়ে পারদর্শী জ্যেষ্ঠাগ্রজের প্রবল উৎসাহে। ভাগ্যগুণে যথার্থ অর্থে কয়েকজন ছাত্রানুরাগী শিক্ষকের আনুকূল্যও অর্জন করেছিলেন— যদিও প্রবল স্বাদেশিকতার আহ্বানে উত্তর-প্রবেশিকা অধ্যয়ন-পর্ব প্রায় সূচনাতেই সমাপ্ত হয়েছিল। তারপর একে একে শিক্ষকতা, সন্ন্যাসী-সাধুসঙ্গ, সমাজসেবা, পঞ্চায়েত পরিচালনা, সমবায় সংগঠন, সংবাদপত্র সম্পাদনা,— এত সব কাজের মধ্যে শেষপর্যন্ত শিক্ষকতাই হয়ে উঠল তাঁর জীবনের ব্রত। দক্ষিণকাশিমনগরের মতো এক অনুন্নত গ্রাম, উৎসাহী মানুষদের সংগঠিত করে দেশের মানুষের কল্যাণসাধনার উদ্দেশ্যে ধাপে ধাপে একটি উচ্চবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সার্থক করেছিলেন।

একই সঙ্গে নিত্যনতুন জ্ঞানান্বেষণ আর জ্ঞান বিতরণের উদ্দেশ্য সফল হতে পারে মনে করেই তিনি শেষ বয়সে গ্রামীণ সংবাদপত্র সম্পাদনা করা ছাড়াও স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় প্রায় ছয় শতাধিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। লোকাচার, প্রবাদপ্রবচন, লোকশিল্প বা লোক- সংস্কৃতি ছাড়াও আঞ্চলিক ভাষার বৈশিষ্ট্য নিয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল থানাকে কেন্দ্র করে চতুর্দিকের স্থান-পরিচয়, বিচিত্র সব পদবীর উৎস উদ্‌ঘাটনের অনুসন্ধান করেছেন অত্যন্ত আন্তরিকভাবে।

সাহিত্যের প্রতি আবাল্য আকর্ষণের কথা বলেছেন নানা প্রসঙ্গে। দেশি বিদেশি পুরাণ, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও ইতিহাস পড়েছেন সুযোগ পেলেই। রাস্কিনের রচনা টলস্টয়ের জীবন ও সাহিত্য তাঁর কাছে গভীর প্রেরণা হয়ে উঠেছিল। অবশ্য নিছক কোনো সাহিত্যযশোপ্রার্থী হয়ে সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেননি — সমাজসেবার অঙ্গ হিসেবে তিনি ছোটোবড়ো নানাধরনের নিবন্ধ ও রম্যরচনা লিখেছিলেন। শিক্ষকতা ও পঞ্চায়েত প্রধানের দায়িত্ব থেকে অবসর নেওয়ার পর, স্থানীয় জনজীবনের সঙ্গে বিশেষত অল্পশিক্ষিত মানুষের সঙ্গে সংযোগ অব্যাহত রাখবার কারণেই তাঁর সমাজ সচেতন রচনাগুলি প্রকাশ করে দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করতে চেয়েছিলেন। বহুপ্রচারিত সংবাদমাধ্যমে নিজের নাম মুদ্রিত দেখাবার কোনো অলীক বাসনা পোষণ করেননি, স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে সুস্থ চেতনার কথা মাথায় রেখেই তিনি কলম ধরেছিলেন— এদিক থেকে বহুবিশ্রুত দাদাঠাকুরের

বহু বিচিত্র কর্মধারার সঙ্গে তাঁর অনেক মিল খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

বর্তমান সংকলন 'কিছু কথা, কিছু অনুভব' শুরু হয়েছে তাঁর লেখা আত্মকথা 'পথিক হৃদয়' দিয়ে, পরবর্তী অংশ 'পুরানো সেই দিনের কথা'ও তাঁর অন্যতর এক স্মৃতিসম্ভার— জীবনে যেসব স্মরণীয় মানুষের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন সেসবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় সমৃদ্ধ। 'কথার মত কথা' আর 'কথায় কথায়' শীর্ষক দুটি পৃথক বিভাজন দেশ ও সমাজের যেসব কল্যাণমুখী দিকগুলি আমাদের অযোগ্যতায় ও উপেক্ষায় যথার্থ ফলপ্রসূ হয়ে উঠছে না, তিনি প্রধানত সেগুলির দিকে মনোযোগী করে তুলতে চেয়েছেন। 'অনুসন্ধান' অংশটিতে আমরা সমাজ ও স্থানীয় জনজীবনের কাছে আর এক দায়বদ্ধতার পরিচয় পাই— পৃথক দুটি গবেষণামূলক তথ্য সংগ্রহের সূত্রে। তাঁর লেখা কিছু কবিতাও সংকলিত হয়েছে বর্তমান সংকলনে। সহজ সরল ভাষায় লেখা চিঠিপত্র এবং তাঁকে লেখা চিঠিপত্রও সংকলিত হয়েছে পরিশিষ্ট অংশে। প্রকৃতপক্ষে একথা স্বীকার করা দরকার, বিস্মৃতিপ্রবণ বাঙালি জাতির দুর্ভাগ্যের দুর্নামের মধ্যে সীমিত এই উদ্যোগ, তাঁর প্রতি নিছক কোনো শ্রদ্ধা প্রকাশের আয়োজন নয়, যেসব বিষয় নিয়ে তিনি নিরন্তর ভেবেছেন, দেশের কল্যাণ কিংবা শুভবোধের প্রাসঙ্গিকতায় এখনো পর্যন্ত তার তাৎপর্য হারিয়ে যায়নি। দেশের মানুষের কোনো ক্ষুদ্রতম অংশের কাছে যদি তার কোনো প্রকৃত মূল্য নিরূপিত হয় তবেই আমাদের এই কাজের দায় সার্থক হবে।

দেশ ও সমাজের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা চিরদিন অটুট ছিল বলে, নিছক কোনো জাগতিক মোহে পারিবারিক স্বার্থের দিকে কখনো ফিরে তাকান নি। প্রয়াণের কয়েকদিন আগে, তাঁর শিক্ষক শ্রুতিনাথ চক্রবর্তীর উপদেশ স্মরণ করে প্রিয়-পরিজনদের কাছে নিজের জীবনের চরম সত্যটি প্রসঙ্গে বলেছিলেন : 'প্রকৃত শিক্ষকের কাছে তার নিজের ছেলের থেকেও ছাত্ররা অনেক বেশি আদরের ভালোবাসার— তাদের সম্মানে গৌরবেই শিক্ষকরা আনন্দ পান বেশি— আমি সেই গুরুবাক্য অনুসরণ করেই চলেছি।' তাঁর ছাত্রদের পক্ষে কত সৌভাগ্যের ঘটনা, এমন একজন সদামঙ্গলময় শিক্ষককে পাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। সেই অভিভাব প্রকাশিত হয়েছে তাঁর এক প্রিয় ছাত্রর কবিতায়, যেটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হচ্ছে নিম্নে :

আচার্যের কাছে বিরল অবসরে

পূর্ণ দিন্দা

শব্দায়মান পৃথিবীতে নীরবতার ভাষা খুঁজে খুঁজে
আমি সেই আচার্যের কাছে চলে আসি
সবুজ কৈশোর ফিরে পাবো বলে।

যেখানে ঝুরি-নামা বটের ছায়া নিরালায় প্রতিদিন
সায়রের জলে খেলা করে,

প্রান্তরে এলোমেলো ঝাউ ফল পড়ে থাকে,
দু'একটি টিয়ার পালক সবুজের আলপনা আঁকে,
সেখানে আমার স্বপ্নেরা বেঁচে আছে
পরিণত দিন যাপনের অন্তরালে।

আমি সেই আচার্যের দেখা পাব বলে
উন্মত্ত কলরোল দূরে রেখে চলে যাই
মনের গভীরে একা একা
নীরবতার ভাষা খুঁজে খুঁজে।

মানুষের মুখে মুখে শার্দুলের আদল দেখতে চাইনে তাই
আর একবার আচার্যের পদপ্রান্তে বসে আমি
মানুষ হওয়ার মোহন মন্ত্র শিখে নিতে চাই;
তাঁর কাছে জেনে নেবো— যে মাটিতে এখনো
সরল শিশুরা নির্ভয়ে হেঁটে যেতে চায়,
হানাদারী হাত সে মাটিতে অতর্কিতে রক্ত ঝরায় কেন;
যে মেঘ বর্ষণ আনে তার কাছে হাত পেতে আছি—
এত আবর্জনা-আবিলতা নিঃশেষে ধুয়ে যায় যদি।

আচার্যের তর্জন বিবেকের রুদ্ধ দ্বার খুলে দেবে এক দিন
আমরা সবাই জেনে যাবো— পৃথিবীতে এখনো তো
সত্য-দয়া-প্রেম-প্রীতি-মহানুভবতা আছে,
অসূয়া-বিদ্বেষ-লোলুপতা পৃথিবীর শেষ কথা নয়—
নিরবধি কাল কেবল ভালবাসায় বহমান!

অসুস্থ পৃথিবী এখন মৃত্যুর ঘণ্টাধ্বনি শোনে প্রহরে প্রহরে;
আমি সেই আচার্যের হাত ধরে তার দ্বারে যেতে চাই
হৃদয়ে রোদন নিয়ে দুঃসাহসী পদচারণায়
যন্ত্রণার হাত থেকে তাকে নিষ্কৃতি দিতে পারি যদি!

অহেতুক ভালোবাসা ভীতিহীন মৃত্যুঞ্জয়—
সব আত্মসুখ তার কাছে পরাভূত চিরদিন,
চিরায়ত আনন্দের নিভৃত নিলয়ে সংগোপনে জানি
বিজয়ী জীবনের মানে লেখা হয়।

আমি সেই আচার্যের বরাভয় হাতে হাত রেখে
মেঘ সরিয়ে আকাশ দেখতে চাই—
যেখানে আদিগন্ত নিরবচ্ছিন্ন নীলিমায়
অনবনত বিশ্বের শঙ্কাহীন জীবনের বাণী লেখা আছে;
অসীম শূন্যের গ্লানিহীন নীল মাখামাখি হলে
আচার্যের সাহচর্যে অমল অবসরে
নির্দ্বিধায় বলতে পারি :

তোমরা সবাই শোনো — মাটির এ উঠোনে
মানুষ এখনো মানুষকে ভালোবাসে।

শব্দায়মান পৃথিবীতে নীরবতার ভাষা খুঁজে খুঁজে
আমি সেই আচার্যের পদপ্রান্তে চলে আসি;
তাঁর কাছে জেনে নিতে চাই —রোদনভরা এ পৃথিবী
প্রশান্তির স্নিগ্ধ ছায়া কবে ফিরে পাবে,
সরল শিশুরা নির্ভয়ে আবার অমল আলোয় হেঁটে যাবে,
সংকটময় সংসারের নরনারী
ফিরে পাবে ফলবতী আশা—
জেনে যাবে, চিরদিন ভীতিহীন অহেতুক ভালোবাসা।

আমার মতো একজন অকিঞ্চিৎকর মানুষ যে এই সংকলনটি সম্পাদনার যোগ্য অধিকারী নয় সে বিষয়ে সসঙ্কোচ স্বীকারোক্তি জানানো কর্তব্য মনে করছি। সামগ্রিক ভাবে এ কাজটি সংগঠিত করেছেন তাঁর আর এক ছাত্র শ্রীআলোকনাথ মাইতি, রক্তের সম্পর্কে তিনি আমাদের পরমপূজ্য মাস্টারমশাই-এর একমাত্র পুত্র। যদিও পুত্রের অধিকার নয়, ছাত্রের প্রগাঢ় কর্তব্য রক্ষার প্রেরণাতেই এরকম একটি জরুরি কাজের প্রয়োজন তিনি বোধ করেছিলেন। নামকরণ থেকে, রচনা নির্বাচন ও বিন্যাসের ক্ষেত্রে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত বর্তমান সম্পাদকের কাছে সব চেয়ে বড়ো অবলম্বন ছিল। এ প্রসঙ্গে একটি বড় কৃতজ্ঞতার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন, বর্তমান সাময়িক পত্রিকা জগতে পরিচিত 'কৌশিকী'-র ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দের বার্ষিক সংখ্যায় 'রমণীমোহন মাইতি/জালপাইয়ের গান্ধী' নামে বর্তমান সম্পাদকের একটি দীর্ঘ জীবনকথা প্রকাশিত হয়েছিল শ্রীইন্দ্রজিৎ চৌধুরীর উৎসাহে। সেই রচনাটির সঙ্গে শ্রীআলোকনাথ মাইতি কৃত বিষয়ানুযায়ী রমণীমোহনের রচনা বিভাগটি বন্ধনীর মধ্যে সংখ্যা সহ এই উপলক্ষে উল্লেখ করছি :

অনুবাদ (৮); আইন/বিচার (১৫); ইতিহাস / ইতিহাসের গল্প/স্বাধীনতা সংগ্রাম/ সেকালের কথা (৪২); ঈশ্বর/ধর্ম/শাস্ত্র ব্যাখ্যা (১৭); কবিতা (৬২); গ্রাম/সমাজ উন্নয়ন (৩৪); দৃষ্টিপাত 'পথের খবর' ও 'উলটপুরান' শিরোনামে মোট ৬৫টি রচনা, ('শ্রীপথিক' ছদ্মনামে রচিত), নাটক/নাটিকা (২); পত্র-পত্রিকার কথা (৭); পঞ্চায়েত ও সমবায় (৭); বিবিধ (৫৫); ভারত ভাবনা / জাতীয় সংহতি (১৭); ভাষা / সাহিত্য (১৫); ভ্রমণ কাহিনী (৯); রাজনীতি/নির্বাচন (১৭); শিক্ষা/শিক্ষক/মূল্যবোধ (২৬); সমসাময়িক বিষয় (৮৭); সামাজিক আচার-বিচার-সংস্কৃতি (১৬); স্থানীয় পরিচয় (৩৪); এবং স্মৃতিকথা/মনীষী কথা (৫৬)।

পাণ্ডুলিপি ও মুদ্রিত, এ পর্যন্ত প্রাপ্ত প্রায় ছ'শোর বেশি রচনার মধ্যে উপর্যুক্ত পাঁচ শত একানব্বইটির বিষয়ানুযায়ী একটি তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন আলোকনাথ, সেসবের

থেকে মাত্র একশত একটি বর্তমান সংকলনে মুদ্রিত হল। বলাবাহুল্য, তাঁর বহুমুখী রচনার তুলনায় এই পরিমাণ যৎসামান্যমাত্র,—তবু উৎসাহী অনুরাগী যাঁরা এই স্বল্পতার মধ্যেও তাঁর অনুভবের বিস্তারটি উপলব্ধি করতে পারবেন। একথা আজ তাঁর শতবর্ষ উদ্‌যাপনের মুহূর্তে আমাদের স্মর্তব্য কবির সেই মহাসত্যবাণী : 'মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায়।' সংকলিত এই রচনার মধ্যে মানব হিসেবে তাঁর বহুতর বোধটিই, তাঁর জীবনেরই গভীরতর সত্য হয়ে ধরা দিয়েছে—তাঁর 'কিছু কথা, কিছু অনুভব' সংকলনে। এই গ্রন্থের বহুল প্রচার সম্ভব হলে, তাঁর মতো মনীষীর শতবর্ষ উদ্‌যাপনের উদ্যোগও অনেকাংশে সার্থক হতে পারে।

আলোচ্য সংকলনের জন্য আমার ব্যক্তিগত ভাবে গৌরব করার কিছু নেই, কিন্তু আমার জীবন ধন্য যে এরকম একটি পুণ্য কাজে আমি অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছি।

প্রভাতকুমার দাস

১৩২৭

জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীপ্রভু চরণপদ্ম হৃদয়ে ধরিয়া
অতীব সভীত চিত্তে সযতনে স্মরিয়া
দীন চাহে ভক্তলীলা গান করিবারে
বামন যেমন চাহে চাঁদ ধরিবারে
হে প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণ হইয়া সদয়
শক্তি দেহ যেন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়
দুরন্ত আকাঙ্ক্ষার মম জাগিয়াছে প্রাণে
ক্ষুদ্র হব কাঙ্খিত ভক্তগুণ গানে
প্রভুপদে সমর্পিয়া নিজ কায় মন
যাহারা করিল তাঁর মহিমা ঘোষণ
সেসব মহাত্মাদের লীলা কথার
প্রভু। প্রিয় ভক্তগণ প্রিয় যে আমার
কাতরে করুণা মায়ের যাচি বারে বারে
তাঁর কৃপা বিনা মুখে বাক্য নাহি সরে
অসংখ্য সুভক্তবৃন্দে করিলাম পালন
এই অভাজন। কিন্তু না পাইল চরণ
অক্ষম সন্তানে স্নেহ সমধিক মার
সেই ভরসায় করি এ হেন বিচার
অভাগা সন্তানে যদি দয়া না হইবে
মাতৃ নাম তবে তব কলঙ্ক রটিবে
মাতঃ অপরাধী হই তবু সুত তব
এই গর্বে বক্ষঃস্থল ফুলাইয়া রব।।

ജയ രാമകൃഷ്ണ
जय रामकृष्ण
JOY RAMAKRISHNA 4.12.85
জয় রামকৃষ্ণ
ଜୟ ରାମକୃଷ୍ଣ To Swami Dheerananda
Kerala

Our Gurudev in my Memory

All glory to Sree Ramakrishna

So delighted to have your letter of invitation to the Anniversary Ceremony this year. But I feel pained to have lost the signature of Swami Vishadananda my brother who used to send me letters every year from 1968–84. I knew he was very ill and wrote me a year ago. It is a pity I could not know about his departure to the Lord's abode.

In 1968 I came to know from Swami Tripuranandaji of Holy memory of Calcutta that at Ottapalam a memorial temple was built and Swami Vishadananda is the Adhyaksha there. I wrote him that I intend a visit to that sacred place where my Gurudev, Srimat Swami Nirmalananda Maharaj spent his last days in 1938.

To সমরেশ বসু লেখক শ্রী 'আমার কালের প্রবীণ সাথীদের' (3)

প্রিয় ভাই সম্বোধনের জন্য মাপ করো, আমার
থেকে তোমরা বয়সে কিছুটা ছোট; আর আমি যতটা
জেনেছি তুমি আমাদের প্রয়াত প্রশান্ত প্রামাণিক ভাই এর
অনেকদিনের জানাশোনা লোক, তুমি একজন
সংগ্রামী লোক, অনেক ঘাত বিঘাতের মধ্যে তোমার জীবন চলেছে
এই চিঠির উদ্দেশ্য খুব স্পষ্ট – 'দেশ' পত্রিকায়
শিল্পী রামকিঙ্কর বেজ মহাশয়ের বিচিত্র জীবন নিয়ে যে
একটা লেখা লিখছ তা তোমাকে নূতন যশ প্রদান
করবে, এরকম লেখা বাংলায় খুব কম আছে মনে হয়,
এ একটা নূতন লাইন – একটা প্রতিভার সফল মূল্যায়ন,
অথচ কি সুন্দর তোমার প্রকাশ ভঙ্গী ও বাঁকুড়ার ভাষার
বৈচিত্র, আমার নিজের জীবন আরম্ভ হয়েছে ১৯০২ সালের
প্রথমে – এখনও তোমাদের লেখা পড়ি – তোমার সমনামা
নাম সমরেশ মজুমদারের লেখা পড়েও খুব আনন্দ
পাই, কিন্তু আমাদের বাংলা দেশের প্রায় সমস্ত
জেলার ছেলে আমার ছাত্র রূপে পেয়েছি – তবু সত্য
বাঁকুড়ার স্থান সবার আগে, লোকেদের বলে রাখি – আমার
সব জায়গার ছেলেদের মধ্যে বাঁকুড়ার ছেলেরা বেশী প্রিয়
ছিল; প্রথম জীবনে কলেজ ছেড়ে অসহযোগ আন্দোলনের
বেলায় বাঁকুড়ায় গিয়ে পড়ি – জাতীয় বিদ্যালয়ে এক
বছরের বেশী থাকি – তোমার লেখা পড়ে যে আনন্দ
পেয়েছি – মনে হচ্ছে যেন আমার সে সব দিন ফিরে
আসছে, বাঁকুড়া শহরের নূতনগঞ্জে আমাদের জাতীয়
স্কুলের হোষ্টেল ছিল – আমি ছিলাম সুপারিন্টেন্ডেন্ট – স্কুল
ছিল লালমাটির ধারে – স্মৃতি এখনও মলিন হয়নি

DIARY

Ramani Mohan Maity

শ্রীরমনী-মোহন মাইতি

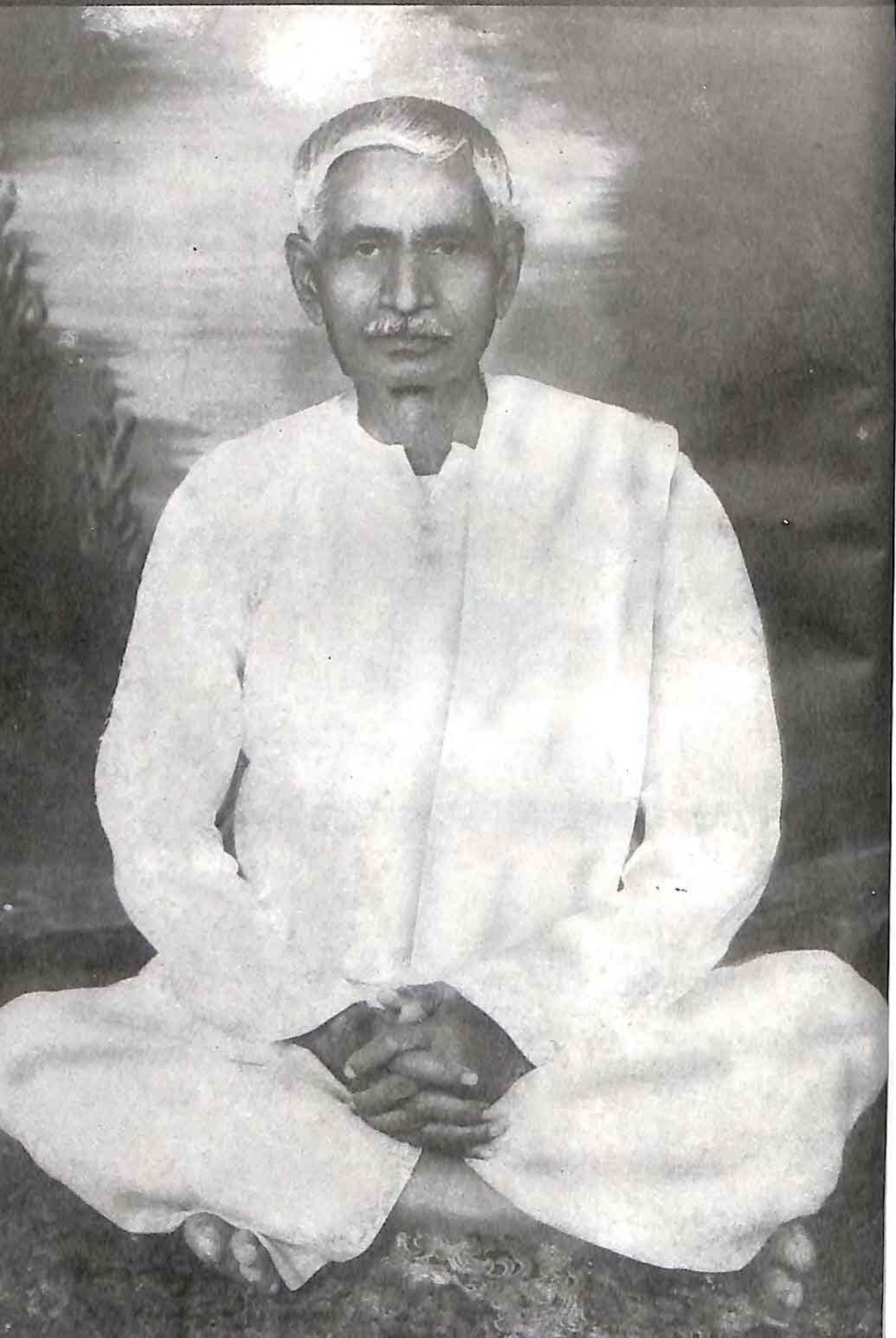


श्रीरमणी मोहन मायति

ଶ୍ରୀରମଣୀ ମୋହନ ମାଇତି

ശ്രീരമണി മോഹന മാഇതി

1974



মু খ ব ন্ধ

রমণীমোহন, ১৯৪০ সালে তাঁর স্বরচিত 'আপনকথা' নামক একটি রচনার ভূমিকায় লিখেছিলেন :

> 'একটি আত্মজীবনী লিখিবার বাসনা বহুকাল হইতে মনে উদিত হইয়াছে—কিন্তু সুযোগ হয় নাই। আত্মপ্রতিষ্ঠা ঘোষণার উদ্দেশ্যে নয়, সাহিত্যিক খ্যাতি অর্জনে আত্মপ্রসাদ লাভও নয়—কেবল ক্রমবর্ধমান স্মৃতিহীনতাকে স্মরণ করিয়া ভবিষ্যতে নিজের ও পরবর্তীপুরুষগণের উপকারের জন্যই এই চেষ্টা। ১৯০১ হইতে ১৯৪০ পর্যন্ত এই কাহিনী। সুতরাং কিছু জানিবার মতো ব্যাপার থাকিবেই। গতদিনের কথা কতো মধুর। আজ শুধু এই মনে করিয়া ক্ষোভ হইতেছে, যেদিন সময় ছিল, স্বাস্থ্য ছিল, বন্ধন ছিল না, শারীরিক ও মানসিক উদ্বেগ ছিল না, সেদিন লিখিলাম না কেন? আজ ক্লান্ত দেহে শ্রান্ত মনে মনের ভাব প্রকাশ যথোপযুক্তভাবে করিতে পারিব কি? চল্লিশ বৎসরের জীবন বাঙালীর মধ্যে বেশী নয়। অনেক কীর্তিমান বাঙালী ইহা অপেক্ষা অল্পবয়সে অনেক কালজয়ী কীর্তি স্থাপন করিয়াছেন। এই লেখকের জীবনে তেমন অলৌকিকত্ব নাই বটে তবে ছোটখাট অনেক কথা ইহাতে পাওয়া যাইবে।'

এই রচনাটির প্রথম অধ্যায়ের শেষ অনুচ্ছেদে তিনি লেখেন :

> 'এই ব্যস্ততার মধ্যেও বহু অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা আমার মধ্যে রহিয়া গেল। আমি আজীবন বালকগণের সঙ্গে আছি। কিছু দেশভ্রমণ করিতে চাই। এই দেশের বালকগণের শিক্ষার জন্য আরও উন্নত ব্যবস্থা এবং গ্রামের স্বাস্থ্য উন্নতির জন্য কার্য করিতে সর্বদা উৎসুক আছি। কিন্তু আমারই অযোগ্যতার জন্য দেশের প্রাণ জাগাইবার শক্তি আমার নাই। যদি তাঁহার অভিপ্রায় হয়, শ্রীগুরু আশীর্বাদে আমার জীবন এমনই কার্যের মধ্যে যুদ্ধরত সৈনিকের মহিমায় অবসান হোক। ইহাই একমাত্র প্রার্থনা।'

পরবর্তীকালে ১৯৭২ সালে রমণীমোহন পূর্বে লিখিত আত্মপরিচয়মূলক রচনা 'আপনকথা' লেখাটি 'একটি জীবন' নাম দিয়ে নতুন করে লেখেন। এবার তিনি 'শ্রীপথিক' নামে রচনাটি লেখেন। রচনাটির প্রথম দিকের কিছু অংশ তৃতীয় পুরুষের বয়ানে লেখা। 'তৃতীয় পুরুষের উল্লেখে বর্ণনা ইতিহাসের মত নীরস লাগে' মনে হওয়ায় এবং 'এখনকার ফ্যাশন হয়েছে উত্তমপুরুষের বয়ানে কাহিনী বলা—অবশ্য তাতে বলতেও সুবিধা হয়, অনেকটা বাস্তব বর্ণনা দেওয়া যায় পাঠকেরও ভাল

লাগে'—তাই শেষের দিকে রমণীমোহন 'একটি জীবন' উত্তমপুরুষে লেখেন। এই শেষ অংশে রমণীমোহনের চল্লিশোর্ধ বয়সের পরবর্তী কর্মময় জীবনের বর্ণনা আছে।

১৯৭৫ সালে মাস্টারমহাশয় রমণীমোহনের প্রিয় ছাত্রগণ তাঁর পঁচাত্তর বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে একটি সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেন, যেখানে রমণীমোহনের পূজ্যপাদ গুরুদেব শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী তাঁকে আশীর্বাদ জানাবার জন্য এসেছিলেন। এই উপলক্ষে পূর্বে উল্লিখিত রমণীমোহনের আত্মপরিচয়মূলক রচনাটি অবলম্বনে 'পথিক হৃদয়' নামে একটি আত্মজীবনী তাঁর ছাত্র প্রভাতকুমার দাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। লেখাটি মাত্র তেত্রিশ পাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ। আর্থিক কারণে মূল রচনার বেশ কিছু অংশ তখন ছাপা সম্ভব হয়নি।

'পথিক হৃদয়' রচনাটি যখন প্রকাশিত হয় তখন তার খসড়া লেখাটি দেখে দিতে পারেন নি বলে ১৯৭৮ সালে রমণীমোহন 'পথিক হৃদয়' রচনাটি পুনর্লেখন করেন এবং কোনো কোনো স্থানে কিছু পরিবর্তন করেন। রমণীমোহন আরও উল্লেখ করেন : 'আমার কর্মজীবনের বাইরে একটি লেখক জীবনও আছে। অনেকে আগ্রহ করেন তাহার কিছু নমুনা দেখতে। তাই পরিশিষ্ট সংযোজন করে অনেকগুলি বড় ছোট রচনা দিতেছি। কতকলেখা গবেষণামূলক—কতক ব্যঙ্গমিশ্রিত, কতক রম্যরচনা পর্যায়ে পড়ে।'

দেশবাসীর সৌভাগ্য শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় রমণীমোহন আরও প্রায় বিশ বছর জীবিত ছিলেন, যার মধ্যে প্রায় এক দশক ছিল তাঁর জেলা পরিষদ সদস্যরূপে সক্রিয় কর্মজীবন। কেবল তাই নয়, মৃত্যুর কয়েকমাস আগে পর্যন্তও স্থানীয় পত্রপত্রিকায় নিয়মিত তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে, যার সংখ্যা পাঁচ শতাধিক। অপ্রকাশিত রচনার সংখ্যাও বহু। এই সময়সীমার মধ্যে পঁচাশি বছর বয়সে তিনি সাপ্তাহিক 'গুণধর' পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা করেছেন যার প্রায় সব লেখাই তাঁর কর্মজীবনের দেখা শোনা জানার অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ।

স্বাভাবিক কারণেই রমণীমোহনের জন্ম-শতবর্ষের [২০০০-২০০১] সূচনায় তাঁর আত্মপরিচয়মূলক যে রচনাটি 'পথিক হৃদয়' নামে প্রকাশিত হল সেটিতে তাঁর পরবর্তী জীবন ও কর্মজীবনের কিছু কিছু তথ্য, অভিজ্ঞতা, অনুভব সংযোজিত হল—যা হয় তাঁর পরবর্তীকালের বিভিন্ন রচনার মধ্যে উল্লেখিত নতুবা তাঁর ডায়েরির পৃষ্ঠার মধ্যে তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন। যেহেতু রমণীমোহনের এই আত্মপরিচয়মূলক রচনাটি পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে বিভিন্ন সময়ে একাধিকবার পুনর্লিখিত বা তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্য থেকে সঙ্কলিত তাই সর্বত্র রচনাশৈলী হয়ত একরূপ নয়। কিন্তু এতেও 'পথিক হৃদয়'-এর পরিচয় সংবেদনশীল পাঠকের কাছে ধরা পড়বে বলেই আমাদের আশা।

জন্মেছি এই দেশে

আমরা কত আগ্রহে গল্প উপন্যাস পড়ি যার কল্পিত চরিত্রগুলি আমাদের মন আকর্ষণ করে কিন্তু যারা আমাদের চারপাশে ঘুরে বেড়ায়, তাদের যে কোনো একজনের বিষয় অনুসন্ধান করলে দেখতে পাব যে তৈরি আখ্যানের থেকেও ঐ ব্যক্তির জীবন কত মনোহর—কত বিচিত্র ঘটনাবহুল। বাংলাদেশের নিম্নঅঞ্চল, যেখানে শাল মহুয়ার বিশাল বন নাই, দামোদর, রূপনারায়ণ, গঙ্গার পলিমাটিতে সমুদ্রগর্ভ থেকে যে দেশ তৈরি হয়েছে, আর আজ যেখানে বাবলা, গেঁউয়া, ঝাউ, গরান প্রভৃতি দেখতে পাওয়া যায়, মাঠ যেখানে প্রায় সমতল সেই নিম্নবঙ্গে মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার [বর্তমানে হলদিয়া মহকুমা] মহিষাদল থানার অন্তর্গত ইটামগরা মৌজার মধ্যম অংশ টাঠারিবাড় গ্রামের কাদামাটি ডোবাখানা পরিবেষ্টিত একটি সাধারণ কৃষক পরিবারে বাংলা সন ১৩০৭ সালের পয়লা ফাল্গুন বুধবার [১৯০১ খ্রিষ্টাব্দ ১৪ই ফেব্রুয়ারি] আমার জন্ম হয়।[১] পিতা রতনচন্দ্র, মাতা কুমারীদেবী।

আমাদের পরিবার

পিতৃ ও মাতৃকুলের সামান্য কিছু বিবরণ লিখছি। শত বৎসর পূর্বে যে পূর্বপুরুষের নাম পাই তাঁর নাম ঝড়ুচরণ [পিতা—জগন্নাথ]। ঝড়ুচরণ এতদ্‌ঞ্চলে একজন স্পষ্টবাদী ও তেজস্বী লোক বলে বিখ্যাত ছিলেন।

প্রপিতামহ ঝড়ুচরণের তিন পুত্রের পরিচয় পাই—বৃন্দাবন, বৈদ্যনাথ ও সাধুচরণ। মেদিনীপুরের সবং অঞ্চল থেকে আগত কাশীনাথ খাঁড়ার কন্যা রোহিনীর সঙ্গে আমাদের পিতামহ বৈদ্যনাথের বিবাহ হয়। বৈদ্যনাথের চারি পুত্র—রতন, মাধব, শ্যাম ও রাম। রাম অবিবাহিত অবস্থায় মারা যান। তখন বহু দূরে দূরে কুটুম্বিতা ছিল। বন্যা প্রভৃতি কারণে অনেকে এদেশে এসে বাস করেন ও কেহ কেহ কন্যাদান করে কন্যার সংসারে অবস্থান করেন। আমাদের গ্রামস্থ কর, কাঁপ, সামন্ত প্রভৃতি প্রধান প্রধান গৃহস্থ পূর্বে ময়না দেউলি শ্যামপুর অঞ্চল হতে এসেছেন। দূরত্ববশত এখন আর সম্বন্ধ নাই। এদেশে আগত গৃহস্থগণ এদেশেই সমাজগঠন করেছেন। বৈদ্যনাথের চারিপুত্রের মধ্যে

আমাদের পিতা জ্যেষ্ঠ ছিলেন। মাত্র সাত মাস বয়সের সময় আমার বাবা মারা যান। বস্তুত সেই বয়স থেকে বাবা শব্দটাই আমার কাছে অপরিচিত রয়ে গেল। পিতৃদেবের গুণাবলী বিষয়ে সাক্ষাৎ জ্ঞান নাই। তখন আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বয়স দশ বৎসর ও মধ্যমের বয়স পাঁচ ছিল। পিতার সঙগীগণের নিকট যতদূর অবগত হয়েছি, তাহাতে বুঝা যায় তিনি একজন সামাজিক মজলিশী লোক ছিলেন, গান বাজনার কিছু খেয়ালও তাঁর ছিল। হরিখালি বাজারে কোনো কোনো দোকানে কাজ করতেন। বাবার এক সঙ্গী রাজারামপুর নিবাসী গদাধর সামন্ত আমাকে একসময়ে বলেছিলেন, তখন এমন দিন ছিল একজোড়া মন্দিরা পেলে তাঁরা সমস্ত রাত জেগে কাটিয়ে দিতেন।

গ্রামের প্রধান হিসাবে আমাদের বংশের কিছু প্রতিপত্তি ছিল। প্রপিতামহ ঝড়ুচরণের তেজস্বিতার কথা আগেই বলেছি। পিতার মধ্যম ভ্রাতা মাধবচন্দ্র মহিষাদলের রাজা জ্যোতিপ্রসাদ গর্গের কাছ থেকে গ্রাম-মুখ্যের সনন্দ পেয়েছিলেন। তিনি বহুবৎসর জনপ্রিয়তার সহিত সাধারণের কাজ করে ১৯২৩ সাল থেকে সুন্দরবনে বাস করেন এবং ১৯৪৪ সালে পরলোক গমন করেন। আমাদের সাংসারিক অবস্থা সেকালে বড় ভাল ছিল মনে হয় না। ১৩০৬ [১৮৯৯] সালে তাঁরা প্রচুর ধান্য ঋণ করেছেন এমন দলিল হাতে পড়েছে। পূর্ব হতে এযাবৎ বংশে কেহ কৃপণ হন নাই বরং অমিতব্যয়ী বলে কেহ কেহ অযশ লাভ করেছেন। সঞ্চয় অপেক্ষা ব্যয়ের দিকে, আয় অপেক্ষা কার্যসম্পাদনের দিকে আমাদের পূর্বপুরুষদের লক্ষ্য ছিল। লোকসমাজে ত্যাগের মাহাত্ম্য ঘোষণার জন্য তাঁরা পরস্পরের প্রতিযোগী, এজন্য ক্ষতিকে গ্রাহ্য নাই। সংগীতানুরাগ ও নির্জনবাসে অনিচ্ছা আমাদের জ্ঞাতিগোত্রাদি সকলের মধ্যেই বিদ্যমান।

পরমপূজনীয়া মাতৃদেবী কুমারী, পিতাম্বর সাঁতরা মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা। মাতামহের আদিবাস তমলুক পরগণার রাউতুড়ি গ্রামে [থানা মহিষাদল] ছিল। তিনি সেখান থেকে এসে আমাদের গ্রামের দক্ষিণদিকে জঙ্গলপূর্ণ জালপাই অঞ্চলের মধ্যে বাসস্থান স্থাপন করেন। মাতামহী হরিবালার পিত্রালয় আমাদের গ্রামের মধ্যস্থলে। তিনি রাউতুড়ির বাড়িতে কিছু কষ্টবোধ করায় এদেশেই থাকার ইচ্ছাবোধ করেন ও মাতামহ সেজন্য এখানে এসে বাসস্থান নির্মাণ করেন। মা বলতেন, সন্ধ্যা হলেই দরজা বন্ধ করা হত কারণ গ্রামের দক্ষিণ পার্শ্ব হতে হলদী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত দুমাইল জালপাই অঞ্চলে তখন বন্য জন্তুর ভয় ছিল। লবণ উৎপাদনের স্থানসমূহ এবং ভগ্নমৃৎপাত্র সমূহ এখনও ঐসব অঞ্চলে দেখা যায়। মাতামহ কিরূপ ছিলেন জানতে পারি নাই। তবে তিনি

একজন কবি ছিলেন এবং এখনও তাঁর রচিত দু চারটি ছড়া টিপ্পনী গ্রামে পাওয়া যায়। মজলিশী গল্পে তিনি সভাকে মুগ্ধ করে রাখতেন।

আমার মা, দুজন বড়ভাইকে নিয়ে আমাদের সংসার দেখাশুনার প্রধান দায়িত্ব নিয়েছিলেন আমার দুই নিঃসন্তান খুড়ো। আমরা তিনভাই তাঁদের স্নেহাদর পেয়েছি ঢের।

কৃষক পরিবারের একটা বৈশিষ্ট্য, মেয়েপুরুষ সবাই মাঠে ধানচাষের কাজে শ্রম করে। এখন থেকে সত্তর বছর আগেকার কথা বটে, কিন্তু আমার মা-যে কিরকম কাজ করতে পারতেন তা বিশ্বাস করা কঠিন। তিনি এক মন পর্যন্ত চাউল মাথায় করে হাটে নিয়ে যেতেন, সঙ্গে থাকতেন খুড়োরাও। হাটের দো-সেদ্ধ চাউল তৈরি করত মেয়েরা। দু একটি ধনীর ঘর বাদে ভোররাত্রি থেকেই পাড়ার ঘরে ঘরে ঢেঁকির শব্দ পাওয়া যেত। এখন বোধহয় শতকরা একটা ঘরেও ঢেঁকি আছে কিনা সন্দেহ।

দাদাদের বয়স আর একটু বড় হলে মা ও কাকাদের সঙ্গে তারা হাটে যাওয়ার বায়না ধরত—তাঁরাও নিয়ে যেতেন। আসল কারণ ছিল অন্য : ছেলেরা জানত তারা হাটে গেলে মা বা কাকা নিশ্চয়ই দুটি পয়সার চিড়ে বা মুড়ি কিনে দেবেন। সেই লোভেই তাদের আগ্রহ। এখনকার পাঠক জেনে আশ্চর্য হবেন, দু পয়সায় অন্তত এক পোয়া খাবার হত—গরীব চাষির বাড়ির কাছে যা ছিল অমৃত। তখনকার দিনে প্যান্ট ছিল না। ছেলেরা পাঁচ আনা দামের ধুতি পরে আনন্দে নাচত।

জীবন প্রভাতে

চারবছরের কিছু বেশি বয়সে মেজদার সঙ্গে স্কুলে যাওয়া আরম্ভ করি। ছোটছেলেরা তখন ধূলোর থলি নিয়ে পাঠশালায় যেত—তারা মাটিতে ধূলো ঢেলে দিয়ে মোটা খড়ি দিয়ে একসঙ্গে লাঙগল চালানো ও অক্ষর শিক্ষা করত। অবশ্য আমার ভাগ্য ভালো, ধূলো কুটতে হয়নি আমাকে, স্লেট-পেন্সিলের চলন হয়েছিল ততদিনে। কয়েকদিনের মধ্যেই অ আ ক খ শিখে ফেললাম। মনে আছে একদিনেই শতকিয়া শিখেছিলাম। ধারাপাত শিখেছিলাম ছুটির সময়ে রোজ ছেলেদের চিৎকার ও আবৃত্তি শুনে শুনে। এইসময়ে লেখার জন্য কাগজ ও কালি পাওয়া যেতে লাগল। বালি পেপার মিলের লাল আভাযুক্ত বালির কাগজ পাওয়া যেত বেশি—সাইজ ছিল ডিমাই—আটভাঁজ করে খাতা

করা হত। সাদা ফুলস্ক্যাপ কাগজও মিলত—দিস্তা তিন বা চার পয়সা ছিল। প্রথমে কাঠের ছোট কৌটায় জে. বি. দত্তের বা পি. এম. বাগচির গুঁড়ো কালি মিলত। নাম ছিল ব্লু ব্ল্যাক কালি। পরে ঐ কালির বড়ি আমদানি হয়ে খুব চালু হল। বোতলে ও দোয়াতেও তরল কালি মিলতে লাগল, আমি আমার মেজদার সঙ্গে চাউলপোড়া ভিজানো জলে কেরোসিন ল্যাম্পের ভুসো মিশিয়ে লিখতে শিখি। জার্মানির জন্ ফেবার কোম্পানির পেন্সিল তখন প্রচলিত ছিল। এদেশে পেন্সিল হত না। পরে কমদামের জাপানী পেন্সিল পাওয়া যেত। জার্মান এইচ.এইচ.বি. মার্কা পেন্সিল গুণানুসারে দু পয়সা থেকে দু আনা দাম ছিল। লেখবার কলম ছিল ময়ূর পালকের। দু পয়সার একটা পালক কিনলে ছুরি দিয়ে কেটে কেটে কলম তৈরী করে নিলে এক বছরও চালানো যেত। পরে কাঠের হ্যান্ডেলে পিতলের নিব লাগিয়ে লেখা অভ্যাস করতে হয়। নিবের উপর লেখা থাকত উজীরপুর। মাস্টারমহাশয় বলতেন উজীরপুর বরিশালে। সেখানে দেশের লোকে নিব তৈরী করেছে—বিলাতী নিবও মিলত—হিংকস্ জি, রেড ইংক পেন, রিলিফ পেন ইত্যাদি। তাতে ইংরাজিও বাংলা ভাল লেখা হত।

আমাদের সময়ে জার্মানীর ফ্রেবেল সাহেবের উদ্ভাবিত কিন্ডারগার্টেন শিশুশিক্ষা পদ্ধতি এদেশে চালু হয়েছিল। নানারকম বস্তু সহযোগে শিক্ষাদানই এর বৈশিষ্ট্য। স্কুলে বাগান তৈরী হল। গান ও ছড়ার চলন হল। তখনও শিক্ষাদানের জন্য শারীরিক শাস্তিদান ও অপমান করার প্রথা ছিল। অবশ্য বুদ্ধিমান এবং মেধাবী হিসাবে আমার পরিচয় ছিল। ভালো পড়া দিতে পারতাম বলে শাস্তিভোগ করতে হয়নি আমাকে। শাস্তিলাভের ভয়ে অনেক ছেলের কাছে স্কুল একটা ভয়ের জায়গা ছিল।

ছেলেবেলার কত কথা মনে পড়ে। সবেমাত্র ক খ শেখা হয়েছে, তার পরে আমার স্লেটটি গেল ভেঙ্গে। খুড়োর কাছে হাটের দিন পয়সা চাইলাম। তিনি তখন দুপুরের পর বিশ্রামের জোগাড় করছেন, বললেন পয়সা নাই। আমি খুড়োর ট্যাকের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বললাম ওখানে পয়সা আছে। খুড়ো দেখালেন ভিক্টোরিয়া মার্কা রূপার একটা টাকা [তখন একটাকার নোট চালু হয়নি]। সেটা তো দেওয়া যায় না। কিন্তু খুড়ো একটু পরে ঘুমিয়ে গেলে তখন তাঁর কোমর থেকে টাকাটি খুলে সোজা বাজারে চলে গেলাম। বাজার ছিল দু মাইল দূরে। সেদিন বাজারে খুব ভীড়। এক তাঁতির দোকানে গিয়ে ভাঙ্গানি করে এক এক করে চৌষট্টি পয়সা গুনলাম। দোকানি আমার মতো একটি ছোট ছেলের হাতে প্রথমে পুরো একটা টাকা দেখে সন্দেহ করে ভাঙ্গানি দিতে

চায়নি। কিন্তু আমার খুড়ো গ্রামমুখ্য জেনে ভাঙ্গানি দিয়ে দিল। এরপর একটা বড় দোকানে গিয়ে বারো পয়সা দিয়ে একটা বড় স্লেট কিনলাম, দু পয়সা দিয়ে একটা ধারাপাত। আর বাড়ীর জন্য কিনলাম দু পয়সার পান। সম্ভবত যাটটা। বাকী পয়সা কাপড়ের খুঁটে বেঁধে বাজার থেকে বেরিয়ে এলাম।

এমন সময় বাড়ী থেকে লোকেরা গিয়ে ধরে ফেললেন আমাকে। শেষ পর্যন্ত সব কথা শুনে তারপর তাঁরা শান্ত হলেন।

তারও কিছুদিন আগের একটা ঘটনা মনে পড়ে। ছোট ছেলেরা বেশী সময় আবদ্ধ থাকতে ভালবাসেনা। কোন না কোন অজুহাতে বাইরে বেড়াতে চায়। একদিন স্কুলের পাশে তেঁতুলতলায় লালরঙের একটা টাটু ঘোড়া বাঁধা ছিল। তখনকার অনেক ধনী লোক ঘোড়া রাখতেন চড়বার জন্য। সেই পথ দিয়ে আমরা কজন স্কুলের ছেলে যাচ্ছিলাম। আর সবাই ঘোড়াটাকে পেরিয়ে গেল কিন্তু আমি ভয়ে পেরুতে পারছিলাম না। বন্ধুরা উৎসাহ আর ভরসা দিতে লাগল—একদৌড়ে চলে আয়। যেই না ছুটে পেরুতে গেলাম, ঘোড়াটা চমকে গিয়ে ঘুরে পড়ে আমার মাথায় কামড়ে দিল। চিৎকার করে কেঁদে উঠতেই অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিয়েছিল ঘোড়াটা। মাষ্টারমহাশয়রা ছুটে এসে জল দিতে লাগলেন আমার মাথায়, তারপর বাড়ী পৌঁছে দিলে সবাই মিলে। কিন্তু আমার ডান চোখের উপরের ভুরুতে ঘোড়ার দাঁতের দাগ রয়ে গেল। তারপর থেকেই ঘোড়া দেখলেই সে পথ আর মাড়াই নি।

নরানাং মাতুলক্রমঃ কথাটা অনেকে নিন্দার্থে ব্যবহার করেন, আবার অনেকে বলেন যে ছেলেরা মামার অনেক গুণ পায় এবং তা খুবই স্বাভাবিক। ছেলেবেলা থেকেই নাটকের দিকে আমার একটু বেশী আকর্ষণ ছিল। ছোটমামা বড় বড় যাত্রাদলের বেশকারী ছিলেন এবং অভিনয়ও করতেন। বিশেষত যাত্রাদলের পছন্দমত পোষাক খরিদ করতে কলকাতা বড়বাজারের খ্যাংরাপট্টিতে তাঁকে প্রায়ই যেতে হত। আবার বড়দাও সখের থিয়েটারে অভিনেতা ছিলেন। তৃতীয় মানে (তখন প্রাথমিক স্কুলে শিশু শ্রেণীতে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ বর্ষ এবং প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ মান ছিল) পড়বার সময় আমার যাত্রাপালা লেখার শখ হল। বুদ্ধচরিত ও মহিষাসুর-বধ দু-এক দৃশ্য লিখেও ফেললাম। যদিও সে ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা ছিল না, আগ্রহ ছিল যাত্রা গানও বক্তৃতা শুনে শিখে নেওয়ার। পাড়ার ছেলেদের নিয়ে টিনের ঢোল বাজিয়ে একদিন কর্ণবধ যাত্রা করতে লেগে গেলাম। ভীমের গদার অভাব হতে দায়িত্ব পড়ল আমার ও আর একটি ছেলের উপর।

গোপনে ডাল কাটতে গিয়ে ধরা পড়ে মালিকের কাছে তিরস্কৃত হয়ে এই

উদ্যমে ভাটা পড়ল। যাত্রার দলও আর বাঁধা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু পরবর্তী জীবনে বড় হয়ে বিশ্বকর্মা নামের আট দৃশ্যের একটা নাটক লিখেছিলাম। তাতে শিল্প, সমবায়, অর্থনীতি নিয়ে অনেক গবেষণা আছে। একটি দৃশ্যে ভীম ও দুঃশাসন সাজা নিয়ে কৌতুক আছে।

দেউলপোতার স্মৃতি

তখন প্রাইমারি সেন্টার পরীক্ষা ছিল না। মাষ্টার মহাশয় নিজের পছন্দমতো যা শিখিয়ে দিতেন তাতেই ছেলেদের যথেষ্ট বিদ্যা হত। অবশ্য সিলেবাস একটা ছিল। তাঁরা অঙ্ক ও ব্যাকরণ ভালো করে শেখাতে চাইতেন। পরিদর্শক স্কুল দেখার সময়ে প্রাইমারি বৃত্তি পরীক্ষার জন্য ছাত্র বাছাই করে দিতেন। আমি মনোনীত হয়ে মহকুমা শহর তমলুকে পরীক্ষা দিতে গেলাম। এর আগে শহর দেখি নি। অবাক চোখে সব দেখছি। পরীক্ষার দিন বর্গভীমা মন্দিরের পশ্চিমে হ্যামিল্টন হাইস্কুলের একটা ঘরে শিক্ষকমহাশয় বসিয়ে দিয়ে এলেন আমাকে। চারিদিকে ছোট বড় অপরিচিত ছেলেরা (মাইনর বৃত্তি পরীক্ষাও একসঙ্গে হত) আর গম্ভীরমূর্তি গার্ডসাহেব। আমি জানালার খড়খড়ি দেখিনি কোনদিন, খুব কৌতূহল নিয়ে আমার বেঞ্চের পেছনে জানলার খড়খড়ি দিয়ে দেখছি অবাক হয়ে, অমনি গার্ডসাহেব ধমকে উঠলেন। সব মিলিয়ে এই অজানা পরিবেশ আমার মধ্যে তালগোল পাকিয়ে গেল। যেজন্য ভালো পড়াশুনার প্রস্তুতি নিয়েও সেবারে পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করতে পারলাম না। পরের বছর আমার ছোট খুড়ো মহাশয় শ্যামচাঁদ মাইতি অনেক চেষ্টা করে পাশের সুতাহাটা থানায় দেউলপোতা মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়ে আমার পড়ার ব্যবস্থা করলেন। আমাদের অঞ্চলে কোনো মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয় ছিল না। একটিমাত্র হাইস্কুল ও চারটি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় মহিষাদল থানার মধ্যে ছিল। তখনকার দিনে মাইনর স্কুল ছিল দুরকম—মধ্যইংরাজি ও মধ্যবাংলা। প্রথমোক্ত বিদ্যালয়ে ইংরাজি পড়ানো হত। হেডমাস্টারমহাশয় আই. এ. বা বি. এ. পাশ হতেন। মধ্যবাংলা বা মিডল্ ভার্ণাকুলার বা সংক্ষেপে এম. ভি. স্কুলে ইংরাজি নামমাত্র একটু পড়ানো হত। প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে হেডপণ্ডিত বলা হত।

আমার এই দেউলপোতা স্কুলের সম্পাদক মহাশয় আমাকে কয়েকদিন নিজের বাড়ীতে রাখেন। তারপর এক দূর আত্মীয়ের বাড়ীতে রইলাম প্রায় কয়েক মাস। পরে স্কুলের নিকটে এক গৃহস্থের ঘরে বাসা পেলাম। তাঁদের

কাঠের পুতুল নাচের দল ছিল। পুতুলেরা কথা বলত না—তাদের নাচের দ্বারাই নানারকম পৌরাণিক উপাখ্যান ও সামাজিক প্রহসন দেখানো হত—সমাজশিক্ষার পক্ষে এই দলটি বেশ লোকপ্রিয় ও শিক্ষামূলক ছিল। পুতুলদের খেতে দিতে হত না—কয়েকজন সানাই ও ঢোলবাদক এবং চার পাঁচজন নাচিয়ে থাকত। সুতরাং খরচ খুব কম লাগত। তাঁদের বাড়ীর দুটি ছোট ছেলেকে পড়াতে হত—সেই ছোটবেলা থেকে আমি মাস্টার ও ছাত্র। আমার সেই প্রথম ছাত্র যোগেন্দ্রনাথ দলই পরে নর্মাল পাশ করে পণ্ডিত হয়—জাতীয় সরকারের বিচারকও হয়েছিল। দেউলপোতা স্কুলের ন্যায় উত্তম বিদ্যালয় এ অঞ্চলে ছিল না। উৎকৃষ্ট পুস্তকের সমাবেশ বিদ্যালয়ের পুস্তকাগারে ছিল। এই মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয় থেকে পরবৎসর (১৯১৪) আমি মধ্য ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার জন্য মনোনীত হই। মহকুমা শহরের সেই বড় স্কুলের দোতলায় সেই ঘরে পরীক্ষা দিতে গেলাম। তখন সাহস বেড়েছে এবং স্থানটিও পরিচিত। ফলে সব প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর লিখলাম ও বললাম। জেলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে মাসিক চার টাকা বৃত্তি লাভ করি।

আমার আচার্যবৃন্দ

পরম সৌভাগ্যবশে যে গুরুবর্গের কৃপালাভ করেছি তাঁদের স্মরণ করি। তাঁদের মধ্যে দক্ষিণ কাশিমনগর উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ভুবনচন্দ্র জানার নাম বিশেষ করে মনে পড়ে। তিনি ছিলেন ধীর, স্থির, শান্ত প্রকৃতির শিক্ষক—আমার প্রথম পথপ্রদর্শক। পরবর্তীকালে উত্তর কাশিমনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে শিশু শিক্ষার মহৎ কর্তব্যে সারাজীবন কাটিয়েছেন। কোনোকারণে কোনো ছাত্রকে শাস্তি দিতে হলে তাঁর বড় কষ্ট হত। ঐ ছেলের সঙ্গে তিনিও কাঁদতেন।

দেউলপোতা মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক চুনীলাল কুইতি ছিলেন কীর্তিমান ও তেজস্বী। স্বাধীনতা সংগ্রামে বহু নির্যাতন বরণ করেছেন, কারাবাসও করেছেন। নর্মাল পরীক্ষায় প্রথম হয়ে সোনার মেডেল পেয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েতের কার্য করেছেন অথচ তখনকার দিনে সাহেবদের খয়ের খাঁ ছিলেন না—অত্যন্ত স্বাধীনচেতা ছিলেন। সরকার থেকে এজন্য লাঞ্ছনাও ভোগ করেন। তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিল অভিনব—ছাত্র বুঝতে পারত না সুকৌশলে তাদের মধ্যে জ্ঞান সঞ্চার করে দিতেন। ভাল ভাল বই পড়তে উৎসাহিত করতেন—ভাল লেখা শ্রুতলিখন করাতেন। আমার

আগে তিন বৎসরই বৃত্তি পরীক্ষার জন্য তিনজন ছাত্র যায়। তাদের দুজন বৃত্তি পায়। তারপর আমি ও আমার পরের বছরই একজন বৃত্তি পায় এবং পরে আরও দুজন জলপানি পেয়েছিল।

আমার হ্যামিল্টন হাইস্কুলের সংস্কৃত শিক্ষক চিন্তামণি ঘোড়ই সপ্ততীর্থ বাংলার অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি এমনই সাদাসিধে পোষাকে যাতায়াত করতেন যে পরিচয় করিয়ে না দিলে কেউ জানতে পারতেন না যে ইনিই সেসময়ে বঙ্গদেশের একজন সংস্কৃতজ্ঞ মহাপণ্ডিত যাঁর সাতটি উপাধি ছিল—কাব্য, ব্যাকরণ, পুরাণ, স্মৃতি, ন্যায়, দর্শন, আয়ুর্বেদতীর্থ। তাঁর জন্মস্থান ছিল নরঘাট থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে গোপীনাথপুরের ওদিকে ঢাকাচড়া গ্রামে।

তখনকার দিনে মোটর ছিল না—১৯১৬ সালে তিনখানি গাড়ী আসে, পাঁশকুড়া লাইনে চলে। সুতরাং রাস্তায় বই পড়তে পড়তে পণ্ডিতমহাশয় চলতেন। আমি তাঁর পিছু পিছু মহিষাদল ইটামগরার দিক থেকে তমলুক গিয়েছি—কারণ আমার বাড়ি ঐ অঞ্চলে ছিল। পণ্ডিতমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করতাম, এবারে কোন্ পরীক্ষা দিবেন? তিনি বলতেন—স্মৃতি বা পুরাণ বা দর্শন বা ঐরূপ কিছু। তারপর তাঁর পরীক্ষা পাশের খবরও আমরা শুনতাম। একবার মাত্র দেখেই শাস্ত্র অধিগত করতেন। আশ্চর্য ব্যাপার এই তখনও তিনি ইংরেজী কোনো পরীক্ষায় পাশ করেন নি—ইংরাজীকে তাঁর ভয় ছিল—ছেলেদের কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করতেও তাঁর সংকোচ ছিল। আমরা জিজ্ঞাসা করতাম, পণ্ডিতমহাশয় এবারে আমাদের সঙ্গে পরীক্ষা দিবেন তো। তিনি বলতেন : না এখনও প্রস্তুত হতে পারিনি—ইংরেজীটা বড় সুবিধের ভাষা নয় হে। আমরা ১৯২০ সালে স্কুল ছেড়ে এলাম। পরে শুনলাম তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন। সমাজসেবার ক্ষেত্রে পণ্ডিতমহাশয়ের আগ্রহ স্বাভাবিক ছিল। তখনকার দিনে নানারকম সামাজিক বিতর্ক উঠত। তিনি বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সভায় সসম্মানে স্থান পেতেন। তাঁর শাস্ত্রগ্রন্থাদি বহন করার জন্য একজন লোক লাগত—এত পুঁথি তিনি নিয়ে যেতেন। এখন বড় দুঃখ হয় আমাদের—ছেলেদের মধ্যে সংস্কৃত-চর্চার সুযোগ বড় কম হয়ে এসেছে—আগ্রহও কমে গিয়েছে।

আমার জীবনে স্মরণীয় আর একজন শিক্ষক উজ্জ্বল স্মৃতি রেখেছেন—তিনি তমলুকের স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী। তিনি হ্যামিল্টন হাইস্কুলের হেডমাস্টার হয়ে প্রথম যে ছাত্রদলকে ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্য পাঠান আমি তাদের মধ্যে প্রথমে ছিলাম এবং আমাকে তিনি প্রথম সন্তানের মতোই স্নেহধন্য করেছেন। শিক্ষকের মনের কথা সাধারণ মানুষে ধারণা করতে পারেন

না। আমরা সমস্ত জীবন দিয়ে বুঝেছি যে একজন যথার্থ শিক্ষকের কাছে তাঁর ছাত্রেরা নিজ সন্তান অপেক্ষা কম নহে। মাস্টারমহাশয় সর্বদাই আমার খোঁজ নিতেন। যখন বুঝলেন সম্বল অভাবে আমার পড়া বন্ধ হওয়ার উপক্রম তখন একদিন বললেন—তোমার বাড়ীতে কি কিছু দিতে পারবে না? আমি বললাম, আমি পিতৃহীন বালক—মাত্র সাতমাস বয়সে পিতাকে হারিয়েছি। বড়দাদা একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তাঁর মাহিনা দশটাকার বেশী নয়। তথাপি তিনি আমাকে মাসে পাঁচটি টাকা দিতে পারেন। তখন মাস্টারমহাশয় আমার জন্য তিনজন মাস্টারমহাশয়কে অনুরোধ করলেন—তাঁরা যেন আমাকে মাসে একটা টাকা সাহায্য করেন। তাঁরা সেই সাহায্য করেছিলেন। আমি আমার সৌভাগ্যের কথা ঘোষণা করে বলি—এমন গুরু পেয়েছিলাম, যিনি আমার জন্য ভিক্ষা করেছিলেন। তাঁর সকল ছাত্রই বোধহয় ঐরূপ অনুগ্রহের পাত্র ছিল। পরবর্তীকালে আমার 'পথিক' কাগজের জন্য অনেক উৎসাহ দিয়েছেন তিনি। তখন সমগ্র তমলুক মহকুমায় কোনো সংবাদপত্র প্রকাশিত হত না। মাস্টারমহাশয় যে আমার কাগজ প্রকাশের মধ্যে ছিলেন তাহা কেহ জানিতে পারে নাই। শ্রদ্ধেয় শ্রুতিনাথবাবুরই সহকারী আমার অপর মাস্টারমহাশয় পূজনীয় দ্বারকানাথ পাখিরা মহাশয়ও আমার 'পথিক' প্রকাশে উৎসাহী ছিলেন। হ্যামিল্টন স্কুলের সামনের সারি সারি পামগাছ তাঁরই কীর্তি।

১৯৩১ সালের শেষে আমাদের গ্রামাঞ্চলে একটি মাইনর স্কুল স্থাপনে উদ্যোগী হই। এখানেও আমার মাস্টারমহাশয় শ্রুতিনাথবাবুর কৃপা দৃষ্টিপাত ছিল। তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয় স্থাপনে তাঁর চেষ্টা সর্বজনবিদিত। তাঁর সমস্ত কীর্তির থেকেও তিনি মহান ছিলেন। তাঁর ছাত্রবৃন্দ যে ধন্য, ভাগ্যবান তাতে সন্দেহ নাই।

হ্যামিল্টন স্কুলের স্মৃতি

মাসে চার টাকা বৃত্তি পাওয়ার পর আমার বড়দাদার—যিনি ছিলেন একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, চেষ্টা আর উৎসাহে আমি তমলুক মহকুমার সেরা স্কুল অর্থাৎ সেই হ্যামিল্টন হাইস্কুলের ফিফথ্ ক্লাসে (অর্থাৎ এখনকার ক্লাস সিক্সে) ভর্তি হলাম। সেখানে পাঁচ বৎসর পড়ি বিনা মাহিনায়।

প্রথম হতেই হ্যামিল্টন স্কুল আমার চক্ষে বড় ভালো লেগেছিল। আমাদের দেশের মধ্যে একমাত্র আমিই এপর্যন্ত (১৯৪০) হ্যামিল্টন স্কুলের ছাত্র। এই

স্কুল ১৮৫২ সালে হ্যামিল্টন নামক কুঠিয়াল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন উহা মধ্যশ্রেণীর ছিল। কালক্রমে ইহা মহকুমার মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করে। আমাদের সময়ে হ্যামিল্টন বেশ জমজমাট ছিল। প্রতি বৎসর প্রাইজ বিতরণ হত। আমি তিন বৎসর প্রাইজ পেয়েছি। লংফেলোর গ্রন্থাবলী, বুদ্ধজীবনী, আঙ্কল টমস্ কেবিন প্রভৃতি বই পেয়েছিলাম। স্কুলের শিক্ষকমহাশয়গণের কথা না বললে স্কুল কি জিনিস বোঝানো যায় না। তাঁদের গুণবত্তার কথা চারিদিকে খ্যাত ছিল। আমার স্কুলে প্রবেশের সময় শ্রীযুক্ত অটলবিহারী ভাদুড়ী হেডমাস্টার ছিলেন। তখন এমন এক দিন ছিল কোথায় কোন স্কুলে কোন মাস্টারমহাশয় ভাল পড়ান তা মুখে মুখে প্রচারিত হত।

হ্যামিল্টন স্কুলে পড়বার সময়ে আমাকে অনেকের বাড়ীতে থাকতে হয়েছিল। একবার বাসা পেয়েছিলাম যতীন দাশের বাড়ীতে। তাঁর কাছে ক্ষুদিরাম বসুর কথা শুনেছি। ১৯০৮ সালে বোমার মামলায় বিখ্যাত শহীদ ক্ষুদিরাম ছিলেন এই স্কুলের ছাত্র। ক্ষুদিরাম ছিলেন যতীন দাশের সহপাঠী। ক্ষুদিরাম রামসাগর পুষ্করণীর উত্তর পাড়ে এক বাসাবাড়ীতে থাকতেন। ক্ষুদিরাম বরাবরই দুঃসাহসী ও দুরন্ত ছিলেন। নানারকম কৌতুক করতেন। একদিন ক্লাসের একটি ছেলেকে দোক্তা পান খাইয়ে ক্লাসে বমি করিয়ে মাস্টারমহাশয়ের কাছে ছুটি আদায় করেছিলেন। খড়ের সাপ তৈরী করে কতদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে পথযাত্রীদের ভয় দেখিয়েছেন।

আমার সহপাঠীগণ আজ কে কোথায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন তার ঠিকানা নেই। কাহারও কাহারও সহিত হয়তো সাক্ষাৎ হয়—কেহ চিনতে পারে, কেহ পারে না। এতদিন পরে বাল্যের সেই সুকুমার স্মৃতি জাগ্রত হলে বড় কষ্ট হয় আবার আনন্দও হয়। একবার সহপাঠী অম্বিকা চক্রবর্তী মজা করে শ্রেণীর সকলকে উপাধি বিতরণ করেছিলেন। তাহাতে আমাকে তিনি The wise বা জ্ঞানী এই উপাধি দিয়েছিলেন। আমি সাধারণত গম্ভীর ও চিন্তাশীল ছিলাম, এইজন্যেই ঐরূপ উপাধি হয়েছিল। পবিত্র ভালবাসার প্রতিমূর্তি সেই ছেলেরা এখনও মনের মধ্যে ভীড় করে উপস্থিত হয়—আমি সমস্ত ভুলে হয়তো নিজেকেও ভুলে যাই। কবি মুর'এর সেই The light of other days কবিতার মর্মার্থ আমার জীবনেই বাস্তবরূপে দেখা দেয়। উহার করুণরসটুকু সত্যই উপভোগ করতে পারি। মনে আছে এই সময় ১৯১৫ সাল 'প্রবাসী' মাসিক পত্রের গ্রাহক হই। তখন ইহার মূল্য ছিল বাৎসরিক তিন টাকা ছয় আনা মাত্র।

হ্যামিল্টন স্কুলের টেস্ট পরীক্ষায় প্রথম হয়ে ফাইন্যাল পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হলাম। কলকাতার সংস্কৃত কলেজে (পুরানো বাড়ী—সে বাড়ী ভেঙ্গে এখন

নতুন বাড়ী হয়েছে) আমাদের ম্যাট্রিক পরীক্ষার আসন পড়েছিল। মাস্টারমহাশয়গণ আশা করেছিলেন আমি খুব ভালো ফল করবো। কিন্তু তাঁদের সে আশা পূর্ণ হয়নি। অবশ্য আমি দুটি লেটারসহ প্রথম বিভাগে পাশ করেছিলাম। এখন সমস্যা হল এরপর কোন দিকে যাব।

মহাত্মাজীর আহ্বান

দাদা সব সময় উৎসাহ দিতেন যতদূর পার এগিয়ে যাও। আমার উপরে তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল এবং আমার সবকাজেই তিনি গৌরব বোধ করতেন। মেকানিকস্ নিয়ে পাশ করি, তাই স্বভাবতঃ কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে পড়ব এরূপ আগ্রহ ছিল। কলকাতায় থেকে পড়ার আশা করিনি, কেননা খরচ জোগানো সম্ভব ছিল না অথচ আমার খুবই আকাঙ্ক্ষা আই. এস. সি. পড়ি। মেদিনীপুরে একটিমাত্র আই. এস. সি. কলেজ ছিল কিন্তু ম্যালেরিয়ার বড় ভয় ছিল। সে সময় মুর্শিদাবাদে বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজের খুব নাম ডাক। আমি সে দিকে চললাম। শিয়ালদহ থেকে রেলে সোজা চলে গেলাম। তখনকার দিনে রেলভাড়া ছিল খুবই সস্তা। খাগড়াবাজারে একটা হোটেলে উঠলাম ও গঙ্গায় স্নান করলাম। গঙ্গায় জল খুব কম। মাঝে মাঝে পুকুরের মতো মনে হয়েছিল। কলেজে প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নিজের বাসনা জানালাম। তিনি বিলেতের ইংরেজ সাহেব ছিলেন—খুবই আগ্রহের সঙ্গে আমার প্রাথর্না শুনলেন, কিন্তু জানালেন আই. এস. সি. ক্লাসে আর ছাত্র নেওয়ার স্থান নাই, আই. এ পড়তে চাইলে ব্যবস্থা হতে পারে। আমি হতাশ হয়ে ফিরে এলাম।

বাড়ী ফিরে শুনলাম দেশের একজনের একটা মামলা দীর্ঘকাল মেদিনীপুর কোর্টে চলছে। বড়দাদা ও সেই ভদ্রলোকের চেষ্টায় সেখানে কলেজে আই. এসসি. পড়বার সুযোগ হতে পারে এবং একজন অফিসারের বাড়ীতে ফ্রি বাসা মিলতে পারে আশা পেলাম। তখন মন থেকে ম্যালেরিয়ার ভয় সরে গেল। আমার তমলুক হাইস্কুলের একজন মাস্টার মহাশয় মেদিনীপুর শহরের লোক ছিলেন। তাঁর সুপারিশে আমার হাফ ফ্রি বেতন হল তিন টাকা চার আনা। মেদিনীপুর কলেজের তখন একতলা বাড়ী, কেবল আই. এ. এবং আই. এস. সি. পড়ানো হত [১৯২০]।

যাঁর বাড়ীতে বাসা পেলাম তাঁর বাড়ী ছিল প্রসিদ্ধ মল্লিকবাড়ীর দ্বাদশ

শিবালয়ের নিকটে। তিনি ছিলেন জেলা আদালতের পেশকার। তাঁর বড় ছেলে আমার সঙ্গেই পড়তেন। মেজ ও সেজ ছেলে দুটিকে আমাকে পড়ায় সাহায্য করতে হত।

রীতিমতো উৎসাহ নিয়ে কলেজে পড়ছি। এমনসময়ে একদিন [১৯২০ শেষদিকে] কলেজ গেটে গিয়ে শুনি—ধর্মঘট। কেউ কলেজে যাচ্ছে না। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের ডাক এসেছে। বাংলাদেশে এগিয়ে এসেছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও আমাদের জেলার ব্যারিস্টার বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। সে এক আশ্চর্য সময় : যাত্রা কর, যাত্রা কর যাত্রীদল / এসেছে আদেশ, বন্দরের কাল হল শেষ।

ভারত স্বাধীন হবে এই স্বপ্নের ঘোর চোখে লাগল। সেই যে বেরিয়ে এলাম—সঙ্গীরা অনেকে কিছুদিন পরে আবার ফিরে গেলেন, কিন্তু আমাদের আর সেই ইংরেজের গোলামখানায় যাওয়া হয় নাই।

জাতীয় কলেজ : বাঁকুড়ার স্মৃতি

দাদা বললেন, বাঁকুড়াতে জাতীয় কলেজ হয়েছে, সেখানে যাও না কেন? যতদূর পার এগিয়ে যাও—যেখানে একান্ত ঠেকে যাবে সেখান থেকে ফিরবে। সেই কথামতো বাঁকুড়া গেলাম ও শ্রীঅনিলবরণ রায় মহাশয়ের আশ্রয়ে পৌঁছে গেলাম। সে ১৯২২ সালের কথা। বাঁকুড়া শহরের লালগঞ্জ অঞ্চলে জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কলেজের ছাত্র—দুই কাজে নিযুক্ত হলাম। কিছুদিন কলেজে অনিলবাবুর নিকটে গীতাপাঠ গ্রহণ করলাম।

জাতীয় কলেজ বেশীদিন চলল না। অসহযোগ আন্দোলনের দুর্বার ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল। জাতীয় স্কুলটি চলতে লাগল। বোর্ডিং-এ আমাকে ম্যানেজারের কাজও করতে হয়। নূতনগঞ্জ অঞ্চলে রেল স্টেশনের নিকটে একটা দোতলা পাকা ঘরে হোস্টেলের চার পাঁচ জন মাস্টার ও কুড়ি পঁচিশ জন ছাত্র থাকত। তখন লালগঞ্জ থেকে জোড়া উটের গাড়ী দু তিনটা মেজিয়া পর্যন্ত চলত। ভাড়া ছিল চৌদ্দ আনা—লোকে ঐ পথে রানীগঞ্জ পর্যন্ত গিয়ে ট্রেন ধরত। ঐ পথের মধ্যস্থলে চমৎকার স্বাস্থ্যকর স্থান গঙ্গাজলঘাট—যা এখন অমরকানন নামে কাজী নজরুলের কবিতায় প্রসিদ্ধ হয়েছে।

বাঁকুড়ায় থাকার সময় একবার গ্রীষ্মের ছুটিতে আমাকে এখনকার দুর্গাপুর ব্যারেজের তিন চার মাইল দূরে বড়জোড়া থানার হাটআসুরিয়া গ্রামে চরকা

তৈয়ার করানোর জন্য প্রায় একমাস থাকতে হয়। স্থানীয় লোকজন খুবই সহায়তা করেছিলেন। ৩৫ বছর পরে একবার বাঁকুড়া জেলায় বেলিয়াতোড়ের নিকট এক ছাত্রের বাড়ী যাই। আমার একটি ছাত্রের বাড়ী ঐ গ্রামের মধ্যে ছিল। তার খোঁজে তার বাড়ীতে গিয়ে বসেছি। একটি লোক এসে জিজ্ঞাসা করলে—আপনি গোকুলকে খোঁজেন কেন? আমি বললাম সে আমার ছাত্র ছিল। লোকটি বললে আপনি মেদিনীপুর জেলার লোক, কংগ্রেসের কাজে ছিলেন। আচ্ছা—, ... নামে একটি লোককে জানেন? আমি বুঝলাম সে আমার নামই বলছে। বললাম—হ্যাঁ তাঁকে জানি। কিন্তু তুমি কি করে তাঁকে জানলে? তোমার নাম কি? লোকটি বললে আমি দাশরথি মিত্র। হাটআসুরিয়া গ্রামে তাঁর সঙ্গে কিছুদিন ছিলাম। আমাকে সকলে দাশু বলে ডাকত। আমি বললাম—দাশু আমাকে কি চিনতে পারছো না? দাশু বললে—এত বছর পরে খুব ভালো চিনতে পারছি না। দাশু তখন ছিল ১২-১৩ বছরের ছেলে। মানুষ ভোলে—আবার ভোলে না। আশ্চর্য মানুষের মন।

কিছুদিন পরে বাঁকুড়া থেকে সোনামুখী জাতীয় বিদ্যালয়ে আমার বদলি হল। তিন চার জন শিক্ষক একটি বাসায় থাকতাম। অসহযোগ প্রচার ও অধ্যাপনা দুইই চলতে লাগল। আমরা প্রত্যেকে মাসে ১৫ টাকা মাত্র খরচ পেতাম। ছেলেরা মাহিনা দিত নামমাত্র। কমলকৃষ্ণ রায়—যিনি স্বাধীন ভারতের প্রথম পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রীমণ্ডলের অন্তর্গত ছিলেন—তিনি এখানে কিছুদিন প্রধান শিক্ষক ছিলেন। বিখ্যাত বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী—যাঁর নামে কলকাতার বৌবাজার স্ট্রীটের নামকরণ হয়েছে—তিনি মাঝে মাঝে তাঁর আখমাড়াই মেশিন ব্যবসার জন্য যেতেন। তাঁর ব্যবসাটা প্রকৃত পক্ষে কিসের সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ ছিল, বিপিনদার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় হয়েছিল।

এই সময়েই জনসভায় বক্তৃতার হাতেখড়ি হয় আমার। সোনামুখীর হাটতলায় প্রথম যেদিন সভায় বক্তৃতা করি সেদিন মিনিট পাঁচেকের বেশি বলা সম্ভব হয়নি—কথা যেন ফুরিয়ে গেল। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই অবস্থাটা পাল্টে গেল। দু চার জন ছাত্র নিয়ে এক এক গ্রামে গিয়ে জালিয়ানওয়ালাবাগে হত্যাকাণ্ড ও অসহযোগ নীতি ব্যাখ্যা করে স্বরাজ বিষয়ে প্রচার করতে করতে এমন অভ্যাস হয়ে গেল যে পুরো সন্ধ্যা অর্থাৎ একনাগাড়ে তিন চারঘণ্টা বক্তৃতা করাও আমার কাছে খুবই সহজ ব্যাপার হয়ে গেল।

বাঁকুড়া জেলায় সেই সময়ে স্বনামখ্যাত গুরুসদয় দত্ত ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। চারিদিকে অসহযোগের বাতাস বইলেও বাঁকুড়া জেলায় ধরপাকড় কম ছিল। গ্রামে গ্রামে প্রচার অভিযানে আমাদের তেমন কোনো অসুবিধা হয় নি। এই

সময় থানায় একবার ডাক পড়েছিল—যেখানে বিখ্যাত সাধু পাগল হরনাথকে দেখেছিলাম।

কাঁকুড়দহ জাতীয় বিদ্যালয়ে

সে যুগের যাবতীয় ঘটনার পুরোভাগে মেদিনীপুরের নাম। আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের সুকঠিন সংগ্রামে মেদিনীপুর অগ্রগণ্য সৈনিক। সংগ্রামের সূচনা থেকেই বিপ্লবী, শহীদ মেদিনীপুর। বাংলার বীর সন্তানেরা সেদিন :

মানবের মহালোভ, বাঁচিবার লোভ/তারা ত্যজিলা হেলায়,
নিশ্চিন্তে জীবনযাত্রা, অমারাত্রি সার করি/কৈল বিসজর্ন।
স্বাধীনতা সঁপি দিতে বহুলক্ষ পরাধীন/আশাহীন জনে
পথকুক্কুরের মতো পথে পথে/তাড়া খেয়ে ফিরি দীর্ঘদিন
কেহবা বরিল কারা কেহ মৃত্যু মহোল্লাসে/প্রেম আলিঙ্গনে—
স্বেচ্ছাকৃত অপঘাতে জীবনের সর্বআশা/করিল বিলীন।

গ্রামে গ্রামে শহরে নগরে বিরাট আন্দোলন। সভায় সভায় গরম বক্তৃতার ঝড়। তমলুক-মহিষাদল জাগ্রত। ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে মহিষাদলের সুসন্তান গুণধর হাজরা ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অপরাধে ধৃত হলেন। আড়াই বৎসরের কারাদণ্ড হলো তাঁর।

কিন্তু মেদিনীপুরের বিশাল কারাগার তাঁকে ধরে রাখতে পারলো না। ২৮শে এপ্রিল ১৯২২ জেলের মধ্যেই তিনি দেহত্যাগ করলেন প্রায় বিনা চিকিৎসায়। তাঁর প্রধান সঙ্গীরাও গ্রেপ্তার হয়ে জেলে গেলেন।

এই সময় একটা আলাদা আইন চালু করা হয়—বেআইনী ঘোষিত কোন সঙ্ঘের সভ্য হলেই হাকিম তাকে ছয়মাস পর্যন্ত জেলদণ্ড করতেন। কংগ্রেসের সভ্য কিনা জিজ্ঞাসা করলেও অভিযুক্ত কোন উত্তর দিতেন না। তাঁরা নিজপক্ষ সমর্থন করবেন না এরূপ নির্দেশ ছিল। এটাই অসহযোগ নীতি।

গুণধরবাবু মহিষাদল থানার কাঁকুড়দহ গ্রামে একটি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। তাঁর গ্রেপ্তারের পর সেখানে কর্মীর অভাবের জন্য আমি সোনামুখী ছেড়ে চলে এলাম।

'পথিক' প্রকাশ

এখানে প্রায় বিশটি গাঁয়ের ছেলে পড়তে আসতো। কাঁকুড়দহ গ্রামের মাইতি বাবুরা খুবই আনুকূল্য করেন। প্রায় ৩৫ বিঘা জমির আয় তাঁরা স্কুলের জন্য দিতেন। গুণধরবাবুই প্রথম প্রধান শিক্ষক। তারপরে ঐ পদ গ্রহণ করেন গোরাচাঁদ গিরি। শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জী, প্রাক্তন লোকসভা সদস্য সতীশচন্দ্র সামন্ত, ভগবানপুরের খ্যাত নেতা ধীরেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীপতিচরণ বয়াল, নগেন্দ্রনাথ মাইতি, বিজয়কৃষ্ণ মাইতি প্রভৃতি। স্কুল থেকে হাতেলেখা 'ছাত্রবন্ধু' নামে একটা কাগজ বের করা হত। আমি ছিলাম সম্পাদক। লিখতো হরিপদ মান্না—ছাত্র [পরে ইনি খঞ্চি হাইস্কুলের শিক্ষক ছিলেন, এখন স্বর্গত]। গুণধরবাবুর মৃত্যুর পরও আমরা জাতীয় বিদ্যালয়টি কিছুদিন চালিয়েছিলাম। কিন্তু আন্দোলনের উত্তেজনা ক্রমে কমে এলো, আমরাও নানা কাজে ছড়িয়ে পড়লাম। জাতীয় বিদ্যালয়টি পরে অবৈতনিক মধ্য-ইংরাজি বিদ্যালয় হলে শ্রীপতিবাবু হেডমাস্টার হয়েছিলেন। আরো পরে ছাত্ররাও চলে যাওয়ায় স্কুলটি আর বেশি দিন চলে নি। ইতিমধ্যে আমার জীবনে আর একটি ঘটনা ঘটেছিল। তা একটি ছোটো সংবাদপত্র 'পথিক' এর [১৯২৪] প্রকাশ। আমার পছন্দ ছিল কাগজের নাম হবে 'স্বদেশবাণী'। কিন্তু গোরাচাঁদবাবু 'পথিক' নামটি দেন ও ঐ নামে মহিষাদল অভয়া প্রেস থেকে পাক্ষিক 'পথিক' একবৎসর প্রকাশ করা হয়। কল্যাণচকের হংসধ্বজ মাইতি সম্পাদক, আমি প্রকাশক ও গোরাচাঁদ বাবু ম্যানেজার। পরবৎসর গোরাচাঁদবাবু ও তাঁর বন্ধুগণের চেষ্টায় নন্দীগ্রাম থানায় হলদী নদীতীরে তেরপেখিয়া বাজারে শক্তিপ্রেস নামে ছাপাখানা হয় এবং ওখান থেকে 'পথিক' সাপ্তাহিক রূপে প্রকাশ করা হতে থাকে। আমি ছিলাম 'পথিক'-এর সবসময়ের কর্মী, রিপোর্টার ও প্রকাশক। ১৯২৫ সালে মহাত্মাজী যখন কাঁথিতে দুটি জনসভায় ভাষণ দিয়েছিলেন তখন 'পথিক'-এর জন্য আমি তাঁর বক্তৃতার রিপোর্ট রচনা করতে যাই। তখন তমলুক মহকুমায় আর কোনো খবরের কাগজ ছিল না। মহকুমার বহু ভদ্রলোক 'পথিক'কে পছন্দ করতেন ও সাহায্য করতেন।

নূতন সংবাদপত্র আরম্ভ করতে হলে আজকাল স্বাধীন ভারতে যে কত কাঠখড় পোড়াতে হয় তা সাধারণে অবগত নহেন। অসীম ধৈর্য্যশীল না হলে অনুমতি পাওয়া কঠিন।[২] অথচ 'পথিক' প্রকাশের জন্য সরকারী অনুমোদন প্রাপ্তির ঘটনাটি আমার এখনও মনে আছে। ১৯২৪ সালে একদিন তমলুকে

মহকুমা অফিসার বাবু আশুতোষ দত্তে'র নিকট উপস্থিত হই। আমার হাতে সাদা কাগজে একটি দরখাস্ত বা ঘোষণাপত্র ছিল—"আমি 'পথিক' পত্রিকা নামে একটি সংবাদপত্রের প্রকাশক, উহা মহিষাদলের অভয়া প্রেসে মুদ্রিত হয়। আমি সরকারের বিরুদ্ধে কিছু ছাপাইব না।" অফিসার আমার কাগজটি হাতে নিলেন ও বললেন—কি হে ছোকরা! তুমি খবরের কাগজ করবে? আমি বললাম—হাঁ হুজুর। হাকিম বললেন—তুমি গ্রীষ্মকালে গেঁওখালি বাজার দেখেছ? বর্ষাকালে তেরপেখিয়া বাজার দেখেছ? আমি বললাম হাঁ। হাকিম তখন বললেন—সাহস করে লিখতে পারবে? উত্তর—পারব হুজুর। একজন মোক্তার কাগজটিতে সাক্ষ্য সই করলেন। বিনা খরচে পনের মিনিটের মধ্যে খবরের কাগজ প্রকাশের অনুমতি মিলে গেল। 'পথিক' পত্রিকার উপরে ছবি ছিল—হিন্দু ও মুসলমান দুই পথিক হাত ধরাধরি করে যাচ্ছেন।

পথে চলে যেতে

আমার চেষ্টা ছিল কি করে মফঃস্বল থেকেও ভালো কাগজ চালানো যায়—পাওয়া যায় প্রচুর বিজ্ঞাপন, যার ওপরে নির্ভর করে আর্থিক দিক দিয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়। তৎকালে আসামের শ্রীহট্ট থেকে 'জনশক্তি' নামে এক সাপ্তাহিক বেশ চলত [শ্রীহট্ট তখনও বাংলায় আসে নাই—শ্রীহট্টবাসী বঙ্গভূক্তির জন্য চেষ্টা করছিলেন]। ১৯২৬ সালের জানুয়ারী মাসে ওখানকার কাজকর্ম দেখবার জন্য আমি খুলনা বাগেরহাট হয়ে বরিশাল যাই। সেখানে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী মহারাজের শঙ্কর মঠে অবস্থান করি। পুণ্যশ্লোক অশ্বিনীকুমারের স্কুলে ঋষি জগদীশচন্দ্রকে [ভক্তিযোগ সঙ্কলক] দর্শন করি।

শঙ্কর মঠাধ্যক্ষ আত্মানন্দজী আমাকে কিছু অর্থ সাহায্য করেন ও লোক দিয়ে চাঁদপুরের স্টীমারে তুলে দেন। চাঁদপুর থেকে আসাম-বেঙ্গল রেলের গাড়ীতে কুলাউড়া স্টেশনে শেষ রাত্রিতে পৌঁছাই। আমার প্রতি ঈশ্বরীয় করুণার এক ঘটনা এখানে ঘটেছিল। হিসাব করে দেখি আমার হাতে আছে মাত্র আটআনা পয়সা। অথচ তিরিশ মাইল দূরে শ্রীহট্টে যেতে হবে রেলে। মনে করলাম খানিক হেঁটেও খানিক ট্রেনে চড়ে বিকালে শ্রীহট্ট যেতে পারব। পথের সন্ধান করি এক যুবকের কাছে—তিনিও শ্রীহট্ট যাবেন বললেন। জিজ্ঞাসা করলেন—হেঁটে যাবেন কেন। আমি আমার অবস্থা বলায় তিনি আমাকে আটআনা পয়সা দিয়ে সত্বর টিকিট আনতে বললেন। তখন গাড়ী ছাড়তে দেরী

ছিল না। ফিরে এসে আর তাঁর সন্ধান পেলাম না। তিনি আমাকে এক অপরিশোধ্য ঋণে চিরদিনের মতো আবদ্ধ করে রেখে গেলেন।

জনশক্তির অফিসে খুব সমাদরে মাসাধিককাল ছিলাম ও তাঁদের কার্যপদ্ধতি শিখেছিলাম। পীঠস্থান মহালক্ষ্মী মন্দির ও শাহ জালাল পীরের দরগা দর্শন করি। হঠাৎ জ্বরে পীড়িত হলে ম্যানেজার সুবোধ দত্তবাবু ও সহসম্পাদক অনাথ দাস আমাকে খুব যত্ন করেন ও ভালো হলে কিছু আর্থিক সাহায্য দিয়ে দেশে পাঠিয়ে দেন। সেই সুদূর আসামের মধ্যেই তৎকালে যে অতিথিপরায়ণতা দেখেছিলাম তাহা আজও বঙ্গদেশে দুর্লভ।

দেশে ফিরে পূর্ণ উদ্যমে কাগজ চালাবো, 'পথিক'কে এক জাতীয়তাবাদী স্বাধীন সংবাদপত্ররূপে প্রতিষ্ঠা করবো এমন বাসনা ছিল। কিন্তু কাগজ পরিচালন ব্যাপারে মতভেদ হল—পরোক্ষেও সরকারের কিছু কিছু সমর্থন করতে মন চাইল না। কাজ ছেড়ে দিলাম। যদিও আমি ছিলাম প্রকাশক কিন্তু 'পথিক' এর বেশিরভাগ আমিই লিখতাম, মহকুমার চতুর্দিকে ঘুরতাম। ফলত অনেকে আমাকেই 'পথিক' বলতেন। নূতন কেউ আর প্রকাশক হলেন না। পথিকের কাজ বন্ধ [১৯২৬] হয়ে গেল।

দীপ জ্বালিয়ে রাখা

প্রসঙ্গক্রমে অন্য একটি কথা এখানে বলি। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে দেশ যখন উত্তাল, পুলিশি নির্যাতন যখন চরমে—তখনো আমি পুলিশের নজর এড়িয়ে থাকতে পেরেছিলাম। কারণ সম্ভবত এই যে মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ আদর্শে নির্বৈর ভাবেই আমি কাজ করতাম—রঙ্গমঞ্চের সামনের দিকে আসিনি। যখন বড়কর্মীদের প্রায় সকলে ধরা পড়ে জেলে গেলেন তখন মহিষাদল ও সুতাহাটা দুই থানার কংগ্রেস কমিটি এক করে একটি কমিটি করা হল। সম্পাদক দুজন ঠিক হল। একজন আমি এবং অপরজন দোরো আকুবপুর নিবাসী প্রমথনাথ মাইতি। সভাপতি রইলেন সতীশচন্দ্র সামন্ত। আমরা কোনোরকমে দীপ জ্বালিয়ে রেখে দিলাম—গ্রামে গ্রামে ঘুরে খদ্দর ও অসহযোগের বাণী প্রচার করে।

অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে সামান্য হলেও যোগসূত্র, একাধিক জেলার জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা, সংবাদপত্র প্রকাশ ও সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা থেকে এটা বুঝেছিলাম—দেশের স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতির উন্নতি না

হলে স্বাধীনতা লাভেও কোনো ফল হবে না। বিরাটভাবে শিক্ষাপ্রচার ও জাতীয়ভাবের জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ না হলে জাতি কখনও মানুষ হতে পারবে না। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কেবল স্ব স্ব মতপ্রাধান্য ও সাম্প্রদায়িক সুবিদাবাদের দ্বারাই পরিচালিত। পল্লীগ্রামে লক্ষ্য করেছি কেবল দলাদলি ও জড়তা। সকলে নানা অসুবিধায় পতিত হলেও পাঁচজনে একত্রিত হয়ে কখনো বলে না—কেন আমরা পড়ে মরব।

এক বড়দিনে— বেলুড়ে

১৯২৬ সালে বড়দিনের সময়ে আমার জীবনে এক বড়দিন উপস্থিত হল। দয়াল প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর দীনতম এই দাসকে তাঁর কর্মক্ষেত্রে আকর্ষণ করলেন। সূচনা হল আমার জীবনে আর এক নূতন অধ্যায়।

ভাগিরথী গঙ্গার পশ্চিমতীরে কলিকাতার অদূরে বেলুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের মূল কেন্দ্র—এখানে স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্থাপন করে গেছেন—বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়। এখনকার দিনে ঠাকুরের বিরাট মন্দির ভারতের মধ্যে একটি প্রধান দর্শনীয় স্থান। অনেকেই ওখানে গঙ্গাতীরে স্বামীজী, শ্রীশ্রীমা সারদামণি ও শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের সমাধি মন্দির দর্শন করে থাকেন। তখন কিন্তু মঠের এলাকা অনেক ছোট ছিল—কলেজের দিকটা তখন মিশনের ছিল না। দক্ষিণাংশে শিল্পবিদ্যালয়ের কয়েকটি বাড়ী, তাঁতের কাজ প্রভৃতি হয়। ওখানেই একটি গোল পাতার কুটীরে আমি প্রায় পাঁচ বৎসর কাটিয়েছি।

১৯২৬ সালের বর্ষশেষে বড়দিনের সময়ে কলকাতায় বেড়াতে গিয়ে বাগবাজার ঘাটে খড়ের নৌকায় কয়েকদিন ছিলাম। নৌকাগুলি কাঁকুড়দহ গ্রামের জমিদারবাবুদের। মাঝিমাল্লারাও জানাশোনা। তারা আমাকে যত্ন করে রেখেছিল। পাশেই ফেরি স্টীমার ঘাট—ছোট ছোট স্টীমার ঘন ঘন বড়বাজার থেকে উত্তরদিকে শিবতলা পর্যন্ত যাওয়া আসা করছে। আমার আগ্রহ হল বেলুড় দর্শন করি। মাত্র পাঁচ পয়সা ভাড়া দিয়ে বেলুড় ঘাটে পৌঁছালাম। ওখানে আলাপ হল দুজন কাঠের কাজের মিস্ত্রীর সঙ্গে—তারা আমার দেশের লোক। তারা ওখানে শিল্পবিদ্যালয়ে ছেলেদের কাঠের কাজ শেখাতেন। মঠের মন্দিরাদি দর্শন করার পর শিল্পবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ স্বামীজী মহারাজের সঙ্গে দেখা হল।

তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এখন কি করছ। তখন দেশের মধ্যে অস্থিরতা—আমার মধ্যেও তাই। জানালাম, এখনও কিছু ঠিক করি নাই। যে জন্য সংসার ছাড়লাম, লেখাপড়াও ছাড়লাম সেই আন্দোলন এখন স্তিমিত। অধ্যক্ষ মহারাজ পরামর্শ দিলেন যদি সংসারী হতে চাও তাহলে কিছু অর্থ উপার্জনের চেষ্টা কর—আর সে পথে না যেতে চাও তো কোনো জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে কাজ কর। আমি বললাম—এখানে আশ্রয় পেতে পারি কি? মহারাজ জানালেন, স্বেচ্ছাকর্মী হিসাবে থাকতে চাইলে থাকতে পারি। দেশ কালের পটভূমিকায় আমার তখন বৈরাগ্য অবস্থা, মন ও উদাসীন। একটা অন্য কিছু করতেই হবে। এমন সময় ঠাকুরের এই ডাক এল। তাঁর কৃপার ভরসাতেই বেলুড়ে শিল্পবিদ্যালয়ে যোগ দিলাম।

আমার কাজ ছিল দিবসে কলকাতার নানা স্থানে চাঁদা আদায় করে আনা ও সন্ধ্যায় ছেলেদের লেখাপড়া কিছু শিক্ষা দেওয়া। সারাদিনে তাদের লেখাপড়ার অবসর ছিল না এবং তারা প্রায় সকলেই স্বল্পশিক্ষিত ছিল, বাংলাদেশের ছাব্বিশটি জেলা থেকে তারা এসেছিল—এই সূত্রে বলা যায় ওখানে আমার পাঁচ বৎসর অবস্থানের মধ্যে সমগ্র বাংলার ২৮টি জেলার মধ্যে দার্জিলিং ও চট্টগ্রাম বাদে বাকী ২৬টি জেলাতেই আমার ছাত্র ছিল। তারা কত রকম কথাই বলত—কত বিচিত্র চরিত্রের ছিল। হোস্টেলে পনের-ষোলো জন ছেলে ও চার পাঁচ জন শিক্ষক—বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান পেতেন।

প্রতি রবিবার কলিকাতা ও হাওড়ার নির্দিষ্ট গৃহস্থের বাড়ী থেকে মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহের জন্য দুজন করে ছাত্রের একটি দল যেত। আমাদের কখনও চাউল কিনে খেতে হয়নি।

সেকালের বেলুড় মঠ

পঞ্চাশ বছর আগের ও এখনকার বেলুড় মঠ দেখতে এক হলেও একরূপ ছিল না। যেখানে ঠাকুরের বড় মন্দির হয়েছে ওখানটা মাঠ ও উত্তরাংশে ফুলের বাগান ছিল। পশ্চিমে কলেজ এলাকার পূর্ব দিকে যে পথটি আছে ওখান পর্যন্ত মঠের পশ্চিম সীমা ছিল। কলেজ বা শিল্প বিদ্যালয়ের বর্তমান বাড়ীগুলি তখনও হয়নি। শিল্পবিদ্যালয় প্রথম স্থাপিত হয় মঠের বাগানের মধ্যে একটা চালাঘরে—পরে বর্তমান স্থান খরিদ করা হয়। এজন্য অনেকদিন ধরে এক পার্টিশন মামলা লড়তে হয়। জমির একজন মালিক এক মুসলমান মহিলা—তাঁর একভাই

মৌলবী মাঝে মাঝে আসতেন। একদিন আমাদের অধ্যক্ষ স্বামী যজ্ঞেশানন্দ আমাকে এক চিঠি নিয়ে ঐ মৌলবীর বাড়ী পাঠালেন। বৈদ্যবাটী স্টেশনের পশ্চিমে কিছু দূরে তাঁর বাড়ী ছিল। মৌলবী বললেন—আমি যে রকম অসুস্থ হয়ে পড়েছি তাতে এযাত্রা আর উঠতে পারব বলে মনে হয় না। কালই আমার ভগ্নীকে ছোট ভাই এর সঙ্গে হাওড়া পাঠাচ্ছি। মহারাজকে বলবেন—বাকী টাকা দিয়ে জায়গাটা রেজিস্ট্রী করে নিবেন। সেই কথামত পরদিন মহারাজ মঠের অফিস থেকে প্রায় দেড় হাজার টাকা নিয়ে আমাকে সঙ্গে করে হাওড়া গেলেন। মৌলবীর ভাই ও ভগ্নী রেজিষ্ট্রী অফিসে হাজির ছিলেন।

কোবালা দলিল লেখা হল। আমিও একজন সাক্ষী হলাম। মামলা খরচ ও মূল্য দিতে মোট প্রায় তিন হাজার টাকা খরচ হয়। জমির পরিমাণ পঞ্চাশ ডেসিমল। আমরা ওর মধ্যস্থ ইদগা বাদ দিয়ে কাঁটাতারের বেড়া দিলাম। ঐ জায়গার মধ্যেই রহিম মিস্ত্রির একটা গোলপাতার কুঁড়েঘর ছিল। তাকে অন্যত্র ঘর করে দিয়ে তার জায়গা ঘর সমেত লওয়া হয়। ঐ ঘরেই আমি বরাবর বাস করেছি। কখনও বা একজন তাঁতের মাস্টার সঙ্গে থাকতেন। রবিবার বাদে অন্যান্যদিন আমাকে প্রায়ই কলকাতা গিয়ে নানা স্থানে চাঁদা আদায় করতে হত। শ্যামবাজার, বড়বাজার, হাইকোর্ট, গড়পার কত জায়গাই না আমাকে যেতে হত। স্বামী যজ্ঞেশানন্দ [সুহৃৎ মহারাজ] গড়পারের ঘোষেদের বাড়ীর [ব্যায়ামাচার্য বিষ্ণুচরণ ঘোষও ঐ ঘরের] ছেলে ছিলেন। কলকাতা ও হাওড়ার বহু ভদ্রলোককে ধরে তিনি মুষ্টি ভিক্ষারও ব্যবস্থা করেছিলেন। ছেলেদের পালা করে রান্নার কাজ করতে হত। আর একজন মহারাজ [দেবেন মহারাজ : স্বামী ব্রজেশ্বরানন্দ] দেখাশুনো করতেন। তিনি সারাদিন কিছু খেতেন না। রাত্রে গিয়ে মঠে প্রসাদ পেতেন। এমন সাধু আমি জীবনে দেখি নাই—একাধারে কঠোর ও কোমল। গেরুয়া রঙের শাড়ি পরতেন মেয়েদের মতো [মায়ের মন্দিরে অনেকে শাড়ি নিবেদন করতেন]। মাথায় মেয়েদের মতো চুল ছিল। তিনি চট্টগ্রামের এক প্রসিদ্ধ বৈদ্যবংশ সম্ভূত ছিলেন। শত শত সাধুর মধ্যে এই এক অপূর্ব মূর্তি। আমাকে কখনও বলতেন—এই ছেলেকে নিয়ে যাও জুতা কিনে দিবে, আর এই ছেলের মোজা চাই। আমি হয়ত আপত্তি করতাম—মহারাজ, এখন আদায়পত্র তেমন ভাল নাই...। তিনি বলতেন, যেখান থেকে পার নিয়ে এস—কেন রাখ ঠাকুরের নামে এই গরীব ছেলেদের। দিনের মধ্যে তাঁর একটি কাজ ছিল শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরে পূজা করা। বাকী সময় শিল্পবিদ্যালয়ের ছেলেদের সেবা করা। সে সেবার রকমই বা কত! কখনও ছেলেদের নিয়ে কয়লার গুঁড়ো গোবর মিশিয়ে গুল তৈরী করেছেন। [তখন

মঠে গোরু ছিল], কখনও রান্না দেখিয়ে দিচ্ছেন, কখনও সূচীকার্য করছেন। আবার কখনও হুকুম—দ্বারিক ময়রার দোকানে বলে দিও কাল সকালে আধ মন দুধ যেন দেয়, ছেলেদের পায়স করে দেব। ময়দা থেকে চাউল তৈরি করতেন, হরেকরকম পিঠেপুলি করতে পারতেন। কখনও দ্বারিকের দোকান থেকে আধমন বা আরও বেশি রসগোল্লা আসত—ছেলেদের বলতেন কে কতগুলা পার খেয়ে নাও। বলতেন ভোগ জোর হয়ে গেলেই বৈরাগ্য আসবেই। নইলে ভিখারী'র বা বঞ্চিতের ত্যাগের মূল্য কি! ইনি [স্বামী ব্রজেশ্বরানন্দ] ও স্বামী যজ্ঞেশানন্দ উভয়েই শান্তিলোক প্রাপ্ত হয়েছেন। কিন্তু আমার মনে তাঁরা চিরজাগ্রত। তাঁরা স্বামী প্রেমানন্দের [বাবুরাম মহারাজ] হাতে গড়া সাধু, ঠাকুর যাঁকে শ্রীরাধার অংশ বলতেন।

প্রেমানন্দজীর কথা

ব্রজেশ্বরানন্দ মহারাজের কাছে একটি কাহিনী শুনেছিলাম, তা উল্লেখ করছি। ঠাকুরের সন্তানেরা কেমন মেজাজের লোক ছিলেন তা এর মধ্যেই প্রকট হবে। একবার মঠের কয়েকজন সাধু ও ব্রহ্মচারী কোনো বন্যাত্রাণের কাজে গিয়েছিলেন। খুব কষ্টের মধ্যে তাঁদের কাজ করতে হয়। ব্যবহারের জন্য কয়েকটি ছাতা কিনেছিলেন। ফিরে আসার পর মিশনের সেক্রেটারি শরৎ মহারাজ [স্বামী সারদানন্দ] হিসেব দেখবার সময় ছাতা ও অন্যান্য জিনিস বাবদ খরচ দেখে সেবকদের তিরস্কার করলেন—ওসব বিলাসিতা করবে তো এ লাইনে এলে কেন? কথাটা বাবুরাম মহারাজের কানে গেল।

তিনি সব শুনে বললেন—ওরা যে সব জিনিস কিনেছে উঠানে এনে আগুন দাও। ছোট্টু মহারাজ শোনামাত্র যার যা ছিল সব টেনে নিয়ে এলেন। ইনি ছিলেন মহিষাদলের এক হিন্দুস্তানী বংশের ছেলে। ১৯২০ সালে স্বামী প্রেমানন্দ এ অঞ্চলে এলে ইনি তাঁর কৃপালাভ করেন ও মঠে যোগ দেন। মঠে একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। শরৎ মহারাজ দোতলায় ছিলেন। তিনি শুনলেন বাবুরাম মহারাজ জিনিসপত্রে আগুন দিতে বলছেন। তিনি তাড়াতাড়ি নেমে এসে বললেন—বাবুরামদা, কি হয়েছে!

বাবুরাম মহারাজ বললেন—ঠিকই তো। সাধু হতে এসেছে যখন তখন তাদের জীবন তো আর জীবন নয়। শরৎ মহারাজ ব্যস্ত হয়ে অনেক কথা বলে তাঁকে শান্ত করলেন।

শিবানন্দজীর স্মৃতি

১৯২৭ সালের আগস্ট মাসে শরৎ মহারাজ কলিকাতার বাগবাজারে উদ্বোধনের বাড়ীতে দেহত্যাগ করেন। তাঁর অন্ত্যেষ্টি বেলুড় মঠের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে গঙ্গাতীরে সম্পন্ন হয়। আমি তখন ওখানে দাঁড়িয়ে দেখেছি সেই দৃশ্য। স্বামীজীর শিষ্য স্বামী শুদ্ধানন্দ অতঃপর মঠ ও মিশনের সম্পাদক হলেন। স্বামী শিবানন্দ [মহাপুরুষ মহারাজ] তখন সভাপতি। একদিন প্রণাম করতে গেছি, এক ভক্ত এসে বলছেন—মহারাজ, কেমন আছেন? মহাপুরুষ মহারাজ বললেন—হাত বাড়িয়ে আছি, ঠাকুর ডাকলেই চলে যাব। যেদিন° তিনি বর্তমান শ্রীরামকৃষ্ণমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন আমি সেই সময়ে উপস্থিত ছিলাম। ওখানে গোলাপবাগান ছিল। ভিত্তির নীচে একটি তাম্রফলক রাখা হয়। তাতে দুইপীঠে আটটি ভাষায় এইরূপ লেখা আছে—শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেবের প্রীত্যর্থে তাঁর শিষ্য ও সন্তান স্বামী শিবানন্দ কর্তৃক অদ্য এই ভিত্তি স্থাপিত হল। মন্দিরের ঈশান কোণের নীচেই ঐ ফলকটি আছে।

মদীয় গুরুদেব

লোকে তীর্থদর্শন করে বা তীর্থে বাস করে পুণ্যফল লাভের আশায়—কেউ কিছু পায়, কেউ বা প্রত্যক্ষ কিছু অনুভব করে না, আমি পাঁচ বৎসর এই মহাতীর্থে বাস করার মধ্যেই ঠাকুরের প্রত্যক্ষ করুণা লাভ করেছি। সেই ঘটনা এখন বিবৃত করছি : স্বামী সারদানন্দের কঠিন পীড়ার সংবাদ পেয়ে দক্ষিণ ভারত থেকে তাঁর প্রিয় গুরুভ্রাতা স্বামী নির্মলানন্দ এসেছিলেন। ইনি তুলসী মহারাজ নামে পরিচিত। তিনি শেষ মুহূর্তের পূর্বে শরৎ মহারাজের দর্শনলাভে সমর্থ হন। তাঁর শেষকৃত্যর সময়েও তিনি বেলুড়ে উপস্থিত ছিলেন, কয়েকদিন মঠে অবস্থান করেন। শুনলাম তিনি স্বামী বিবেকানন্দের মতো সুবক্তা এবং আমেরিকাতে ঠাকুরের বাণী প্রচারের জন্য কয়েক বৎসর ছিলেন। এখন মহীশূরে থাকেন। তুলসী মহারাজ তমলুক আশ্রমে আসবেন শুনে আমারও দেশে আসবার ইচ্ছা হল এবং তাঁদের সঙ্গে হোরমিলার কোম্পানির স্টিমারে তমলুক এলাম। তখন কলকাতা থেকে গেঁওখালি, তমলুক, কোলাঘাট হয়ে ঘাটালের রানীচক পর্যন্ত স্টিমার যাতায়াত করত। মহারাজ তমলুক সেবাশ্রমে কয়েকদিন ছিলেন এবং একদিন হ্যামিল্টন স্কুলের দোতলার হলে এক সভায়

বক্তৃতা দেন। প্রায় পঁচিশ বছর বাংলার বাইরে ছিলেন বলে বাংলায় ভাষণ কিছুটা বাধো বাধো লাগছিল কিন্তু ইংরেজি বলছিলেন মাঝে মাঝে অতি চমৎকার।

স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকাবাসীকে কি সার কথা বুঝিয়েছিলেন, তিনি তাই ব্যাখ্যা করেন। তাঁর কথা এই ধরনের ছিল : স্বামীজী বলেছিলেন, তোমরা আমেরিকানরা সোনার বাক্সে মাটির ঢেলা রাখ—আমরা ভারতবাসীরা মাটির পাত্রে সোনার ঢেলা রাখি।

আমি অন্তরের টানে তাঁর কৃপাপ্রার্থী হলাম। তিনি তখনকার মতো আমাকে নিরস্ত করলেন। কিন্তু আমি ছিলাম অনন্যশরণ। দেড় বছর পর তিনি আবার বাংলায় আসেন ও উদ্বোধন অফিসে অবস্থান করেন। তখন এক দিন [১১ই এপ্রিল, ১৯২৯] ওখানে আমাকে ডেকে কৃপা করেন। দক্ষিণ ভারতে আঠারটি আশ্রম তাঁর চেষ্টায় স্থাপিত হয়। তার বেশির ভাগই কেরল দেশে। কেরল-এর ওট্টাপালম শহরের অদূরে শ্রীরামকৃষ্ণনগর পল্লীতে অবস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ নিরঞ্জন আশ্রমে ১৯৩৮ সালে তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁর সন্ন্যাসী শিষ্যবৃন্দ ও অগণিত ভক্তবৃন্দ সেখানে তাঁর স্মৃতিমন্দির স্থাপন করে দৈনিক পূজার ব্যবস্থা করেছেন। ১৯৬৮ সালে আমি ঐ আশ্রম দর্শনের ইচ্ছা করে পত্র লিখি। অধ্যক্ষ স্বামী বিশদানন্দ লেখেন—যদি আপনি আসেন আপনি অনুভব করবেন—গুরুদেব এখনও এখানে আছেন। আমি ঐ আশ্রম ও স্মৃতিমন্দির দর্শন করেছি। যেখানে ভারত নদীতীরে মহারাজের অন্ত্যেষ্টি হয় সেখানে ঐ বৎসরই একটি সুদৃশ্য অষ্টকোণ বেদীমধ্যে একটি প্রস্তরফলক স্থাপন করা হয়। আমি সেটিও দর্শন করেছি।

আমার সাধুদর্শন সৌভাগ্য

আমার সাধুদর্শন সৌভাগ্যের তুলনা হয় না। শ্রীশ্রীঠাকুরের অপার কৃপায় তাঁর সন্তানগণের মধ্যে স্বামী শিবানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ [গঙ্গাধর মহারাজ], স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, স্বামী সুবোধানন্দ [খোকা মহারাজ : ইনি বালকবৎ ছিলেন], স্বামী শুদ্ধানন্দ, স্বামী নির্মলানন্দকে [আমার পূজনীয় গুরুদেব] দেখেছি। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ আমার গুরুদেবের বাল্যের সহপাঠী ছিলেন। তখন তাঁরা বারানসীতে ছিলেন। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ গৃহস্থ আশ্রমে ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। বেলুড়ের বড় মন্দির তাঁরই পরিকল্পনা। কেরল দেশে গুরুদেব যখন

মৃত্যুশয্যায়, খবর গেল স্বামী বিজ্ঞানানন্দ দেহ রক্ষা করেছেন। পরদিন গুরুদেবও চলে গেলেন। স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য ব্রহ্মচারী জ্ঞান মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রচার নামে ছোট ছোট পুস্তিকা প্রকাশ করতেন। আমাকে তাঁর ঐ কাজে কিছু কিছু সাহায্য করতে হত। ছাপাখানায় যাওয়া আসা করতে হত। স্বামী ব্রজেশ্বরানন্দ, স্বামী যজ্ঞেশানন্দ [শিল্প বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ], স্বামী ভবেশ্বরানন্দ [শ্রীধর মহারাজ : উৎকলদেশীয় সাধু, শিল্প বিদ্যালয় এর স্রষ্টা] আমাকে পাঁচ বছর তাঁদের বিশেষ অনুগ্রহের ছায়ায় রেখে প্রতিপালন করেছিলেন। শতমুখেও তাঁদের গুণকীর্তন করে উঠতে পারব না। তাঁরা ছিলেন সাধুর মত সাধু—শ্রীরামকৃষ্ণলীলার মূর্ত প্রকাশ।

যার কাজ তিনি করাবেন

১৯৩১ সালে রামকৃষ্ণ মিশনের মধ্যে কিছু গোলযোগ হয়। আমাদের পরিচালক স্বামী যজ্ঞেশানন্দ কাজ ছেড়ে দিলেন। আমরাও কিছুটা অস্থির হয়ে পড়লাম। এইরকম যখন অবস্থা ১৯৩১ সালের শেষের দিকে আমার শারীরিক অবস্থা বেশ মন্দ হয়ে পড়ে। তখন বঙ্গদেশে ঘোরতর ম্যালেরিয়া ছিল এবং তারমধ্যে লিলুয়া, বেলুড় প্রভৃতি খুবই ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত ছিল। ১৯৩০ সালে একবার আমাকে ভুবনেশ্বর মঠে দুমাস থেকে স্বাস্থ্য উদ্ধার করতে হয়। এবারে ডাক্তার হরিপদ মহারাজ বললেন তুমি আজই বেলুড় ত্যাগ কর। এই কথায় আমি কিছু বিব্রত বোধকরি। আমাদের চালক চলে গিয়েছেন, আমরা কয়জন পুরাতন লোক আছি : ছেড়ে যাই কি রূপে? ডাক্তার মহারাজ বললেন—তুমি তো বড় মজার লোক হে! যে দেশে কাক নাই সে দেশে কি সূর্য উঠবে না? যাঁর কাজ তিনি করাবেন। এখন তুমি আত্মরক্ষা কর। আত্মরক্ষা করাও ধর্ম।

আমাকে দেশে ফিরতে হল। কিছুদিনে সুস্থ হলাম। সেই সময় প্রতিবেশী গ্রামের এক ভদ্রলোক[৪] তাঁর প্রাথমিক বিদ্যালয়কে মাইনর স্কুল করতে আমার সাহায্য চাইলেন। স্বামী যজ্ঞেশানন্দ তখন এলাহাবাদে ছিলেন। তাঁকে পথ নির্দেশ চাইলাম। তিনি লিখলেন—যেখানে নিঃস্বার্থ হয়ে কাজ করবে, সেটাই ঠাকুরের ক্ষেত্র। নতুবা দুটি প্রসাদের লোভে মঠে থাকলে বেশী ধর্ম হয় না। বুঝলাম ঠাকুরই আমাকে নূতন ক্ষেত্রে প্রেরণ করেছেন। কলকাতা থেকে স্বামী বিবেকানন্দের এক বড় ছবি এনে স্থাপন করে আমরা স্কুলের কাজ আরম্ভ

করলাম। সাধুবাক্য স্মরণ করে নিষ্কাম কর্মের প্রেরণায় ১৯৩২ সাল থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত একটি বিদ্যালয়ের সঙ্গে আমার জীবন কেমন করে মিশে গিয়েছিল সে এক পৃথক অধ্যায়।

লবণ আইন অমান্য

এখন স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা কিছুটা বলা দরকার। কেননা যখন ঝড় আসে—বড় বড় গাছই কেবল দুলে না, তৃণরাজিও মাথা নাড়ে। ১৯৩০ সালে মহাত্মা গান্ধী লবণ আইন অমান্য করতে ডান্ডি যাত্রা করলেন। সমগ্র ভারত চঞ্চল হয়ে উঠল। মহিষাদলেও ঢেউ এসে লাগল। অসহযোগ, লবণ সত্যাগ্রহ, পরবর্তীকালে ভারত ছাড়ো আন্দোলন সবসময়েই মহিষাদলের জনগণ সামনের সারিতে। ফরিদপুর, কলকাতা প্রভৃতি স্থান থেকে বহু সত্যাগ্রহী নরঘাটে এসে আইন অমান্য করেন। দেশের লোকও তাতে যোগ দেন। ওখানে লবণ আইন ভঙ্গের দ্বিতীয় দিনে ম্যাজিস্ট্রেট প্যাডিসাহেব যখন প্রধান সত্যাগ্রহী সতীশবাবুকে [সতীশচন্দ্র সামন্ত : পরে লোকসভা সদস্য] গ্রেপ্তার করেন, আমি দর্শক ছিলাম। সাহেব বললেন—সতীশবাবু, আপনি কি শুধু লবণ আইন ভঙ্গ করবেন, না আরও আইন অমান্য করবেন? সতীশবাবু উত্তর দেন—ইংরেজদের তৈরী আইন যতগুলি পারি ভঙ্গ করব। তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে সাহেব চলে গেলেন। সিপাহীরা লোকের হাঁড়িকুড়ি ভেঙ্গে ছিল। পাশের এক ঘরে জানালার ফাঁক দিয়ে ফটো নেওয়া হয়েছিল। পুলিশ টের পায়নি। অনেকে মার খেয়েছিল—ডাক্তার অদ্বৈতনাথ দিণ্ডাও তার মধ্যে একজন ছিলেন। তখন থেকে স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত মহিষাদলে যে বিশাল জনজাগরণের জোয়ার এসেছিল তাতে সুশীলবাবু [ধাড়া], নীলমণিবাবু [হাজরা] প্রভৃতির বিশেষ ভূমিকা ছিল।

আমার স্বপ্ন : সমস্ত ঘর ছাত্রে ভরে গেছে

এবারে আবার সেই মাইনর স্কুলের কথায় আসি। ১৯৩১ সালের ৩১-এ ডিসেম্বর চৌদ্দ-পনেরখানি গ্রামের লোকে দক্ষিণ কাশিমনগর গ্রামে সমবেত হয়ে একটি মধ্য-ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করা স্থির করলেন[৫]। চল্লিশ

বর্গমাইলের মধ্যে একটিও মধ্য-ইংরেজি বিদ্যালয় ছিল না। এই অঞ্চলে শিক্ষার অবস্থা কেমন ছিল তা ঢাকা-বিক্রমপুরের সঙ্গে তুলনা করলে বোঝা যাবে। একমাত্র বিক্রমপুর পরগণায় চল্লিশটি হাইস্কুল ও চার-পাঁচটি মাইনর স্কুল ছিল। যে প্রাইমারী স্কুলটিকে বাড়িয়ে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণী করা হবে, তার চতুর্থ শ্রেণীতে মাত্র ছয়জন ছাত্র ছিল। ১৯৩০ সালে ছিল মাত্র একজন। তাই অনেকে এই স্কুলকে উচ্চতর করার বিরোধী ছিলেন। তাঁদের আশঙ্কা ছাত্রাভাবে স্কুলটি চলবে না, কিন্তু আমি স্বপ্ন দেখতাম, এই সমস্ত ঘর ছাত্রে ভরে গেছে।

নানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আমি দেখেছি, বহু জ্ঞানীগুণী মানুষের সংস্পর্শে এসেছি। শান্তিনিকেতনে পিয়ারসন সাহেব আমাকে রাঁচী ও চন্দননগর দেখতে বলেন। চন্দননগর প্রবর্তক সঙেঘর বিদ্যাপীঠে আমি যাই—দেখি ছেলেরা জ্ঞানার্জন করছে, আবার কাজও করছে—জীবিকার ভাবনা ছিল না। বরিশালে মহাত্মা অশ্বিনীবাবুর ব্রজমোহন স্কুলে দেখেছিলাম সেখানকার প্রধান শিক্ষক জগদীশ মুখোপাধ্যায়কে। জগদীশচন্দ্র ঋষিতুল্য মানুষ, অশ্বিনীবাবুর ছাত্র ও শিষ্য। ভক্তিযোগ তিনিই সঙ্কলন করেছিলেন। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতীও ঐ স্কুলেরই শিক্ষক ছিলেন। তাঁর বহু ছাত্র অগ্নিযুগের বীর বিপ্লবী। এসব অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল। তাই আমি বলেছিলাম—শুভ কর্মপথে ধর নির্ভয় গান।

দু বছরে স্কুলটি সম্পূর্ণ হল। তখন চতুর্থ শ্রেণীতে এগারো জন ও তৃতীয় শ্রেণীতে চব্বিশজন ছাত্র পাওয়া গেল। আশপাশের গ্রামে ছোট ছোট পাঠশালা ছিল। সেখান থেকে ছেলেরা প্রাইমারী স্কুলে না গিয়ে আমাদের স্কুলেই আসতে লাগল। সমস্যা হল স্কুল মঞ্জুর পাওয়া নিয়ে। তা না হলে স্কুল টিকবে না। মেদিনীপুরে পরপর দুইজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বিপ্লবীদের হাতে নিহত হয়েছেন।

সরকার কঠোর দমননীতি চালাচ্ছেন। এরকম সময়ে মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপনে সাহেবদের উৎসাহ ছিল না। জেলা স্কুল ইন্সপেক্টর একজন বিলেত ফেরত বাঙালী। আমাকে বলেন—স্কুলটি মধ্য বাংলা করুন। সাহায্য ব্যবস্থা করে দেব। দায়ে পড়ে হয়তো তাই করতে হতো কিন্তু দৈব অনুকূল, সহসা একদিন বর্ধমান বিভাগের দ্বিতীয় ইন্সপেক্টর এই অঞ্চলে এসে পড়লেন। আমাদের স্কুল কমিটির সভাপতি ছিলেন সেচ বিভাগের ইঞ্জিনীয়ার খোন্দকার সাহেব। তিনি উক্ত ইন্সপেক্টরের নিকট-কুটুম্ব ছিলেন। আমাদের প্রার্থনায় ইন্সপেক্টর সাহেব স্কুল পরিদর্শন করলেন। তিনি বললেন—স্কুলের তো সবই আছে। প্রায় পঁচিশ বিঘা ভূ-সম্পত্তি, উপযুক্ত শিক্ষকমণ্ডলী [তার মধ্যে আমি

সেকেন্ড মাস্টার] এবং যথেষ্ট ছাত্র। ঘরবাড়ী ও আসবাবপত্রের তেমন কোন অভাব নাই। তবু স্কুল মঞ্জুর হয় না কেন? জেলা কর্তৃপক্ষের অভিপ্রায় জানালাম। তিনি বললেন—স্কুল হবে ভারত সরকারের আইনে, কোনো চিন্তা নাই। প্রথমে এক বৎসরের ও পরে তিন বৎসরের জন্য মঞ্জুরীর আদেশ দেন। ১৯৩৬ সালে মাসিক কুড়ি টাকা জেলা বোর্ড সাহায্য পাওয়া গেল। ছেলেদের প্রত্যেকের নীলরঙের প্যান্ট ও সাদা হাফসার্ট ছিল। মাঠে দাঁড়িয়ে গেলে এক অপূর্ব দৃশ্য হত। খেলার এত উৎসাহ ছিল যে চারদিকে রটে গেল স্কুলে কেবল খেলাই হয়। কথাটা আংশিক সত্য। এই স্কুলের ছেলেরা অনেকে হাইস্কুলে গিয়ে সুনাম অর্জন করেছিল। এখন দেখতে পাই তাদের মধ্যে বড় ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর, কুস্তিগীর, স্বাধীনতা সংগ্রামী হয়েছে।

মনে পড়ে

এই বিদ্যালয় ১৯৪৬ সালে আরও বড় হয়। নাম হয় দক্ষিণ কাশিমনগর হাই স্কুল। ক্রমশ এই বিদ্যালয় স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। তার অগ্রগতি অব্যাহত। বিদ্যালয় সংগঠনের কাজে যাঁরা গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে লেগেছিলেন তাঁরা আমাকেও সঙ্গে নিয়েছিলেন। মনে পড়ে আমার আদর্শ সহকর্মীদের—বুদ্ধিদীপ্ত ছাত্রদের মুখ। মনে পড়ে—হাই স্কুলের প্রথম প্রধান শিক্ষক জ্ঞানতপস্বী কর্মযোগী শ্রীমৃত্যুঞ্জয় মাইতি মহাশয়ের কথা। তিনি ১৯৫০ সালে প্রথম ছাত্রদলকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রেরণ করেন। আটজনের মধ্যে ছয়জন পাশ করে। হেডপণ্ডিত হরিপদ দাসবক্সী সবরকম খেলা ও ব্যায়ামে পারদর্শী ছিলেন। কেবল স্কুলের নয়, গ্রামের যুবকবৃন্দকে উৎসাহিত করে ফুটবল, কবাডি প্রভৃতি খেলায় জয়মাল্য এনেছেন। আমার ১৯৬২ সালে অবসরগ্রহণের পূর্বে আরও দুজন প্রসিদ্ধ প্রধান শিক্ষককে স্মরণ করি। শ্রীমুরারিমোহন বসু ও শ্রীকেদারনাথ প্রধান। তাঁরাও এখান থেকেই কর্মসমাপ্তি করেন। সাংসারিক বিপর্যয়ের মধ্যেও অবিচল, সদাহাস্যমুখ প্রমথনাথ মাইতি পরলোকগত হয়েছেন। স্মৃতি রেখে গেছেন।

স্কুল ছেড়েছি বহুবৎসর। তবু মনে হয় এই সেদিন—স্কুলে ক্লাসের সময়ে কেউ দেখা করতে এলে বলতাম, আপনার যত জরুরী কাজ হোক এখন কিছু বলবেন না—ক্লাসে গেলে সব ভুলে যাই। আমার সামনে থাকে তখন ছোট ছোট মুখগুলি আর তাদের কৌতূহল। তাদের দেখেই সব ভুলে যাই।

বিয়াল্লিশের লড়াই

স্মৃতিচারণে ঠিক থাকে না কোনটা আগে, কোনটা পরে। ইতিমধ্যে ব্যক্তিজীবনে কত ঘটনা, দুর্ঘটনা ঘটেছে। আমি এখন একজন সংসারী মানুষ। তমলুক মহিষাদলবাসীর রাষ্ট্রজীবনে কত ঝড় বয়ে গেল, বিদ্যুৎবাহিনীর থানা আক্রমণ, জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা, পুলিশের গুলিতে শহীদগণের আত্মদান সবই একে একে ঘটে গেছে। শত অত্যাচার ও দমননীতি এখানকার মানুষের কঠিন সঙ্কল্পকে টলাতে পারে নাই। কিন্তু প্রকৃতির রুদ্র তাণ্ডব ১৯৪২ সালে মানুষের জীবনে নিয়ে এল দারুণ দুঃখ দৈন্য। সাইক্লোন [১৬ই অক্টোবর] ঝড় ও বন্যার ফলে পরবৎসর দুর্ভিক্ষ হয়। বহুলোক খেতে না পেয়ে রাস্তায় মারা যায়। অনেকে দীর্ঘকাল অল্পাহারের ফলে পরে ক্ষীণপ্রাণ হয়ে দেহত্যাগ করেন। অদ্ভুত ব্যাপার অনেক ঘটেছিল। যেমন, লোকে রসগোল্লা পেতে পারত কিন্তু মুড়ি বা ভাত একমুঠা পেত না। টাকায় তিন চারটা ইলিশ মাছ মিলত। বন্যাবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠনে গভর্নমেন্ট খুবই তৎপর হয়েছিলেন। একটি ইউনিয়নে তাঁরা রিলিফ লোন্ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন। ছোট, বড় রাস্তা সংস্কার হয়। হলদী নদী তীরে রক্ষাবাঁধ বহু ব্যয়ে মেরামত হয়। দুর্ভিক্ষের বৎসরে স্কুল থেকে ছুটি নিয়ে আমি রিলিফ কার্যে নিযুক্ত ছিলাম।

দেশে [তমলুক মহকুমায়] তখন দুইটি গভর্নমেন্ট। এক কংগ্রেসের জাতীয় সরকার। তাঁদের নিজেদের সৈন্য [স্বেচ্ছাসেবক], পুলিশ, গুপ্তচর, ডাকবিভাগ, বিচারবিভাগ ছিল। অন্যদিকে ব্রিটিশের গভর্নমেন্ট ছিল। জাতীয় সরকার ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বহু জটিল মামলা নিষ্পত্তি করেছিল। আমার ছাত্রজীবনে প্রথম ছাত্র যার বাড়ীতে থেকে আমি মধ্যছাত্রবৃত্তি লাভ করি সে একজন প্রধান বিচারক হয়েছিল।

অবশেষে এল ১৯৪৬ সাল। হিন্দু মুসলমান দাঙ্গায় ভারতের মুখ কালো হয়ে গেল। উদ্দেশ্য পাকিস্তান হাসিল করা। অবশ্য আমাদের অঞ্চল শান্ত ছিল। ইতিহাস বদলে গেল। যারা ১৯১৯ সালে হাত ধরাধরি করে ভারত স্বাধীন করতে এগিয়ে এসেছিল, শত দুঃখ নির্যাতন ভোগ করেছিল আজ তারা জন্মভূমিকে ভাগ করে দুটি পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত করল—ভারত ও পাকিস্তান। আবার পাকিস্তানও দুইভাগ হয়ে গেছে—পাকিস্তান ও বাংলাদেশ। ইংরেজকে দোষ দিয়ে কি হবে। এককাঠা জমির জন্য আমরা হাইকোর্ট পর্যন্ত লড়ি আর তারা কি সহজে বিশাল ভারতকে ছেড়ে দিতে চায়! হয়তো সশস্ত্র সংগ্রাম হলে তারা আরও বেশিদিন লড়তে পারত কিন্তু সমগ্র ভারতের অসহযোগের ফলে

তাদের রাজ্য রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। কোটিকণ্ঠে রব উঠল, ভারত ছাড়ো ইংরেজ—মুষ্টিমেয় রাজশক্তি ভারত ছেড়ে যাবে আশ্চর্য কি। এই মহাযুদ্ধে নেতা ছিলেন মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। আমাদের বহু যুগের পুণ্যফলে আমরা তাঁকে পেয়েছিলাম।

মহাত্মাজীর স্মৃতি

জগতের কাছে আমাদের মুখ উজ্জ্বল হয়েছে। মহাত্মাজীর সহজ সরল জীবনযাপনের আদর্শ আমাদের প্রেরণা দিয়েছে, পথ দেখিয়েছে। আমি কয়েকবার তাঁকে দর্শন করেছি। তাঁর বহু মহাপ্রাণ অনুগামীরও সান্নিধ্য লাভ করেছি। আমি যে তাঁদের দেখেছি এই আমার পরম সৌভাগ্য ও সন্তোষ। পঙ্কিল রাজনীতির সরোবরে মহাত্মাজী ছিলেন প্রস্ফুটিত শতদল। মহাত্মা গান্ধীর যাদুমন্ত্র এই ছিল যে তাঁর কোনো কপটতা ছিল না। সোজা বলতেন—যা করবেন বা যা করতে চান। গরীব মানুষদের জন্য বা অবহেলিতদের জন্য সত্যিই তিনি ভাবতেন। ১৯৪৫ সালে তিনি মহিষাদলে এসেছিলেন গেঁওখালি দিয়ে লঞ্চ করে। তাঁর জন্য একটি কুটীর তৈরী হয়। সেখানে পাঁচ দিন ছিলেন। একদিন সুতাহাটায় কুমারচন্দ্র জানার আশ্রমে গিয়েছিলেন। প্রার্থনা সভায় প্রতিদিন হাজার হাজার লোক আসতেন—রামধুন গাওয়া হত—হরিজন ফান্ডের জন্য পয়সা সংগ্রহ করা হত।

আমি যে তাঁদের দেখেছি

আমি কুমরআড়া গ্রামের [মহিষাদলের নিকটে] হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কাছে শুনেছি বাঘা যতীন ও তাঁর সঙ্গীরা তাঁর আশ্রয়ে অনেকদিন গোপনে ছিলেন—এখান থেকেই তাঁরা বালেশ্বর যান ও পুলিশের সঙ্গে যুদ্ধ করে আত্মবিসর্জন করেন।

মেদিনীপুর কলেজের মাঠে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ভাষণ শুনি—তখনকার দিনে মাইক ছিল না। কিন্তু তাঁর গলা দশ হাজার লোক শুনতে পেত। তাঁর আবেগপূর্ণ বক্তৃতায় জনতা বিচলিত হতেন।

আমাদের বীরেন্দ্রনাথ শাসমল বক্তৃতা দিতে উঠলে সভা একদম নিস্তব্ধ,

মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যেত। নন্দীগ্রামে তাঁর ভাষণ শুনেছি। যাত্রাপথে কিছু আলাপও হয়েছিল। সভাস্থলে তাঁর উপস্থিতি একটা গভীর প্রেরণার বিষয় ছিল। বহু বাধা অতিক্রম করে তরুণ বয়সে তিনি বিলাতে ব্যারিষ্টারি পড়তে গিয়েছিলেন। বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে এরকম দুঃসাহস কল্পনাতীত ছিল। মেদিনীপুর-এর কাঁথি শহরের নিকটে চণ্ডীভেটী শাসমল বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। দীর্ঘদিনের পরাধীনতার মধ্যে, হতমান হতাশাপীড়িত বঞ্চিত জাতির মধ্যে এমন প্রাণের, এমন দেশপ্রাণের আবির্ভাব পৃথিবীর এক বিস্ময় বলা যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন—আমার যে মাথা আমি ঈশ্বর ও প্রণম্য গুরুজনদের কাছে ভিন্ন অন্য কোথাও নত করিনি তাকে তোমরা নত কোরো না। আমাকে যেন ঊর্ধ্বশিরে দাহ করা হয়।

কারাবাসের শেষে তিনি এই প্রার্থনার কথা লিখে গেছেন—এই কয়েদ-খালাসীকে আজ আশীর্বাদ কর পরমেশ, দেশের ও দশের সমূহ অমঙ্গল ও অকল্যাণ যেন আমার হয়, জগতের যাবতীয় পরাধীনতা যেন আমার একার পরাধীনতায় পর্যবসিত হয়। এমন বীরের জন্মস্থান বলে মেদিনীপুর জেলা ধন্য।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে প্রথম দেখি ১৯২৩ সালে কংগ্রেসের যশোর সম্মেলনে। সভায় সুদর্শন একটি যুবক—সাহেবদের মতো দেখতে—প্রস্তাব উত্থাপন করলেন—ভারতের বাইরে অন্যান্য দেশেও কংগ্রেসের শাখা স্থাপন করা হোক। একজনকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম ইনিই সুভাষচন্দ্র বসু। পরে ১৯২৮ সালে তিনি যখন কংগ্রেস সভাপতি মতিলাল নেহরুকে চৌত্রিশ ঘোড়ার গাড়িতে শোভাযাত্রা করে নিয়ে যান তখন আমি কলকাতা বড়বাজারের রাস্তায় দাঁড়িয়ে সে অপূর্ব দৃশ্য দেখেছি। প্রেসিডেন্টের পাশে ছিলেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। সুভাষবাবু স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। শহীদ যতীন দাস প্রভৃতি তাঁর সহকারী। এ সবই আজ ইতিহাস।

আচার্য বিনোবা ভাবে'র সঙ্গে সাগর তীর্থে আমি পদযাত্রা করেছি। গঙ্গাসাগর মহাতীর্থে গীতার অদ্বিতীয় ভাষ্যকার বিনোবাজীর মুখে গীতা আবৃত্তি শুনে মন্ত্রমুগ্ধের মত "হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহু"। বিনোবাজী লিখেছেন—আমার মাতৃবিয়োগে আমি কাতর হই : তখনই আমি মনে করি গীতা মায়ের আশ্রয়ে সারা জীবন থাকব। বামনখালি স্কুলে বিনোবাজী যে ভাষণ দেন তার মর্ম ছিল—আমরা সকলেই এমনকি পশুপক্ষীরাও আনন্দ চায়, কিন্তু আনন্দের বিশুদ্ধীকরণ চাই। উদাহরণ দিয়ে বললেন, একটি ক্ষুধার্ত মা ও তার শিশুর কাছে একটি রুটি এল। মা নিজে না খেয়ে ছেলেকে খাইয়ে বেশী আনন্দ পায়। সুতরাং আপনারা শুদ্ধ আনন্দ লাভ হয় এমন কাজ করুন। আপনারা দান

করুন। আর একদিনের কথা মনে পড়ছে। সাগরদ্বীপে রুদ্রনগর হাইস্কুলে গিয়ে পৌঁছলাম। সেখানে বিনোবাজী বললেন—অনেকে জিজ্ঞাসা করেন, বাবা এই যাত্রার শেষ কোথায়? আমি বলি—বাবার সেজন্য কোন ভাবনা নেই—যেখানে এই দেহ পড়বে ভগবানের কোলেই পড়বে কারণ তিনি সর্বত্র আছেন। আমার পরম সৌভাগ্য সাগর থেকে ফিরে কলকাতা হয়ে বিনোবাজী যখন পাঁশকুড়ার পথে মহিষাদল থানায় এলেন, তখন মহিষাদল থানায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে আমি তাঁকে স্বাগত জানাবার সুযোগ পেয়েছিলাম।

নবভারত গঠনের মহাযজ্ঞে

'পথিকে'র পথ চলা থামে নাই। নবভারত গঠনের মহাযজ্ঞে আমার সাধ্যমত কাজ করে আসছি—কাঠবেড়ালীর সেতুবন্ধনের মতো। ইউনিয়ন বোর্ড অঞ্চল পঞ্চায়েতে চল্লিশ বৎসর যুক্ত আছি। তন্মধ্যে অঞ্চল প্রধান প্রায় ছাব্বিশ বৎসর। এজন্য নিজ পরিবারের যথেষ্ট কার্য করিতে পারি নাই। জেলা জজ আদালতে কুড়ি বৎসর জুরীর কার্যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে। দেখেছি অপরাধীদের শতরকম ধূর্ততা সত্ত্বেও তাদের শাস্তিলাভ করতে হয়—সমাজ রক্ষা পায়। অতি দুঃখের বিষয়, জনগণের এই বিশেষ অধিকার যাহা বহু সংগ্রাম ও প্রতীক্ষার পর লাভ করা গিয়েছিল তা লোপ করেছেন তাঁরাই, যাঁরা স্বাধীন ভারতে জনগণের প্রতিনিধিরূপে নির্বাচিত হয়ে তাঁদের অধিকার রক্ষার জন্য শপথ নিয়েছেন। ইউনিয়ন বেঞ্চ কোর্টের পরিচালকরূপে দশ বৎসর বহু পরিশ্রম করেছি। তাহাতে গ্রাম্য সমাজের যথেষ্ট উপকার হয়েছে। কিন্তু ১৯৬৪ সাল হতে বিপথগামী রাজনৈতিকগণ কর্তৃক তাহাও প্রবর্তিত নাই। সকলের মুখেই গণতন্ত্রের বুলি কিন্তু কার্যকালে গণদেবতার মাথায় পদাঘাত—ইহাই বর্তমান রাজনীতি।

অবশেষে শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক হতে নিজের দুর্বলতা অনুভব করে প্রিয় জন্মভূমির হিতার্থে ১৯৭৬ সালে পঞ্চায়েত পরিচালনার দায়িত্ব পরিত্যাগ করি। কিন্তু আবার ১৯৭৮ সালে নবপর্যায়ের পঞ্চায়েত নির্বাচন সময়ে আমার অগণিত ছাত্র ও বন্ধুজন আমাকে নির্দল প্রার্থীরূপে মহিষাদল থেকে পরপর দু বার মেদিনীপুর জেলা পরিষদে প্রেরণ করেন। একটি সংস্কৃত বিদ্যালয়ের সভাপতিরূপে দীর্ঘকাল আছি। প্রজ্ঞানানন্দ স্মৃতিরক্ষা সমিতির সঙ্গে বিশ বৎসরের বেশী যুক্ত আছি। ভারত সেবক সমাজ একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান।

সমগ্র ভারতে ইহার প্রায় পাঁচশ শাখা ছিল। ইহাতেও আমি কয়েক বৎসর মহিষাদল লোককার্যক্ষেত্রে মুখ্য সহযোগী হিসাবে কাজ করি।

বর্তমানে আমাদের হলদিয়া বন্দর পর্যন্ত শাখা রেলপথ ও জাতীয় সড়ক নির্মাণের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হয়েছে। ৪১ নং জাতীয় সড়ক আমাদের অঞ্চলের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। আমাদের অঞ্চলের দক্ষিণে হরিখালি বাজার হলদী নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত। এখান থেকে সাত মাইল দূরে মহিষাদল থানা ও বাজার।

আমার উপর ভার পড়ে [১৯৫৩ সাল] উক্ত হরিখালি-মহিষাদল কাঁচারাস্তাটিকে উন্নয়ন করে গাড়ী চলার মতো করতে। আমি জেলা বোর্ডের নির্দেশে কাজ করি। বিল পাওয়ার সময় সরকার কুটিল নিয়ম দেখিয়ে আমাকে প্রায় সতের শত টাকা ক্ষতিতে ফেলেন। জেলা বোর্ড সভাপতি মহেন্দ্রনাথ মাহাতো আমার জন্য অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু ফল হয় নি। আমি ও আমার মধ্যম ভ্রাতা সুন্দরবনের ছয়বিঘা ভূ-সম্পত্তি বিক্রয় করে ক্ষতিপূরণ করি। দেশের কাজ করতে গিয়ে অনেকে বহু ত্যাগ স্বীকার করেন। আমরা সে তুলনায় এমন কিছু করতে পারি নাই। রাস্তাটি এখনও পাকা হয় নাই। দেশসেবকগণ যে দেশের সুবিধার কথা চিন্তা করে না—আমাদের জাতীয় জীবনে এই এক বিড়ম্বনা।

সমগ্র জীবনই আমার পাঠক জীবন

সমগ্র জীবনই আমার পাঠক জীবন। প্রত্যহ অন্ন না হলেও চলে—পুস্তক না হলে চলে না। সাত বছর বয়স থেকেই রামায়ণ— মহাভারতের সঙ্গে পরিচয়। পরবর্তীকালে আনন্দমঠ, কমলাকান্ত পাঠ করে প্রভাবিত হয়েছি। ফাঁক পেলেই—পড়ি গীতা—একাধারে কাব্য ও ধর্মগ্রন্থ।

আঙ্কল টমস কেবিন, আন টু দিস লাস্ট, টলস্টয় এর লেখা, রামচরিতমানস, বাইবেল এসব বই বহুবার পড়েছি। পরশুরাম, পঞ্চানন্দও আমার প্রিয়। বেলুড়ে থাকার সময়ে মঠের দক্ষিণ অংশে এক বড় পাকা বাড়ীতে লাইব্রেরী ছিল। ওখানে অনেক দুর্লভ গ্রন্থ ছিল। ওখানে আমি কোরাণের অনুবাদ পাঠ করি। এক আলমারি বই ছিল রামকৃষ্ণ-সাহিত্য [তখন পর্যন্ত যত বই প্রকাশিত হয়েছিল]। মনে হয় তার সাধ্যমত ব্যবহার করেছি। এক আলমারি ভর্তি এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা ছিল। তাতে একদিন 'খ্রিষ্টোফার'

শব্দ বার করে দেখি—সেই দিনই ছিল তাঁর উৎসবের দিন। সেই বিখ্যাত দস্যু সাধু—অপূর্ব তাঁর কাহিনী।

এক অর্থে আমার জীবন কতকগুলি ভ্রমণের সমষ্টি। প্রথম জীবনে তেমন বুঝতে পারিনি কেন বাইরে যেতে এত মন টানে। পরে একটা জীবনের চিন্তা যখন এসেছে, তখন দেখলাম-আমার তেমন কিছু নাই, অথচ জীবন কি করে সার্থক করি? বিদ্যা, বুদ্ধি, অর্থ, ক্ষমতা আমার এমন কিছু নাই যার দ্বারা সার্থক জীবন যাপন করার চেষ্টা করা যায়। কিন্তু ভগবান আমাকে চোখ দুটি দিয়েছেন। যতটা পারি তাঁর খেলা দেখে নেব—এই আকাঙ্ক্ষাই আমার ভ্রমণের নেশা। ভারতের বিভিন্ন দিকে যাওয়ার চেষ্টা সর্বদা আছে। সময়ও সুযোগ পেলেই বের হয়ে পড়ি। বেলুড়ে অবস্থানের সময় গয়া, কাশী, পুরী, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করি। দেখেছি খণ্ডগিরি ও উদয়গিরির গুহামন্দির। একবার পুরী ভ্রমণের মধ্যে একদিন সাক্ষিগোপাল এসে ঠাকুরের দর্শন করে যাই। গ্রামের নাম সত্যবাদী। গোপাল এখানে বৃন্দাবন থেকে সাক্ষ্য দিতে এসে রয়ে গেলেন। ভক্তজন তাঁর মনোহর বালকমূর্তি দেখে আনন্দলাভ করে থাকেন। নীতিহীন মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই তাঁর এই সত্যবাদী লীলা। বালক কৃষ্ণের এমন মূর্তি আমি কোথাও দেখি নাই। মূর্তির নাকে নোলক আছে। কথিত আছে পুরীর রানী দর্শন করতে এসে মনে করেন—গোপালের নাকে একটি নোলক থাকলে বেশ হত। কিন্তু নাকে ছিদ্র থাকা সম্ভব নয় ভেবে তিনি কথাটা প্রকাশ করলেন না। সেইদিন রাত্রে ঠাকুর তাঁকে স্বপ্নে জানালেন—আমার নাকে ছিদ্র আছে, তুমি নোলক দাও। তখন রানী সুন্দর নোলক পরিয়ে দিলেন। ভক্ত ভক্তবানের লীলার মহিমা বুঝতে বিরিঞ্চি-ব্রহ্মাও পারেন না, অন্যে কি পারবে!

আর একবার বেলুড় থেকে দোলের দিন নবদ্বীপ দেখার ইচ্ছা হয়। কিন্তু কার্যগতিকে দোলের পরদিন যেতে পারি, মায়াপুরও যাই। মহাপ্রভুর জন্মস্থান, কাজীর বাড়ি প্রভৃতি দেখি। গৌড়ীয় মঠের মন্দিরে শ্রীমৎ ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রভুপাদের দর্শন পাই।

তীর্থস্থান বা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান দেখবার ইচ্ছা স্বাভাবিক, আবার যদি কোন মহাপুরুষের কীর্তিস্থান হয় তবে আরও আগ্রহ হয় সেই স্থান দেখবার। বেলুড় থাকার সময়েই স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজকে দর্শন করি। তিনি গঙ্গাধর মহারাজ নামে সুপরিচিত ছিলেন। 'তিব্বতী বাবা' নামেও তিনি পরিচিত ছিলেন। তাঁর

মতো দুঃসাহসী কঠোর ভ্রমণ বোধহয় আর কেউ করেন নি। তাঁর প্রধান কীর্তি সারগাছি আশ্রম—মুর্শিদাবাদের সন্নিকটে। স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণায় এখানে মিশনের প্রথম সেবাশ্রম অখণ্ডানন্দ মহারাজ স্থাপন করেন। ১৯৬৭ সালে সারগাছি আশ্রম দর্শনের সুযোগ আসে। স্বামী অখণ্ডানন্দ, স্বামী শিবানন্দ-এর পর মঠও মিশনের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। তখন আমি বেলুড় থেকে দেশে চলে এসেছি। ১৯৬৭ সালেই অম্বিকা কালনায় নিমাই পণ্ডিতের বাল্যসখা—এক পাঠশালার পড়ুয়া গৌরীদাস পণ্ডিতের আশ্রম দর্শন করি। গৌরীদাস নিমাইয়ের খেলার সঙ্গী ছিলেন। তিনি কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বন করে এখানে যে তেঁতুলতলায় কুটীর বেঁধে নাম সাধনা করতেন সেই পুরাতন তেঁতুলগাছটি যার তলায় মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ বসেছিলেন, সেটি দশর্ন করি। এখানের প্রথা অনেকক্ষণ ধরে ঠাকুর দর্শন করা যায় না—মন্দির বন্ধ করে দেওয়া হয়। মহাপ্রভুর হাতের বৈঠা ও পুঁথি এখানে আছে। এখানে আমার আর একটি বাসনাও পূর্ণ হয়েছিল। আবার বাসনা ছিল গঙ্গার পশ্চিম উপকূলে যেখানে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে রাখাল বালকদের দ্বারা ভুলিয়ে বৃন্দাবনের যমুনা বলে স্নান করিয়েছিলেন, সেই ঘাটে আমি স্নান করব।

জয়রামবাটী-কামারপুকুর—দুই তীর্থে কতবার

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা সারদামণির জন্মস্থান মহাতীর্থ কামারপুকুর ও জয়রামবাটীতে কতবার যে কত পথে গিয়েছি—কখনও একক কখনও দেশের কোন যাত্রীদল বা কোন ভদ্রলোক ভক্তকে নিয়ে গিয়েছি। যে পাঁচ বছর আমি বেলুড় ছিলাম [১৯২৭-১৯৩১] তার মধ্যে প্রায় প্রতি বছর অক্ষয় তৃতীয়া দিবসে জয়রামবাটী যাওয়া হত। কামারপুকুর গ্রাম হয়েই যাওয়া হত। ঠাকুরের বাড়ী দেখে যাওয়া হত। কিন্তু সেখানে তখন কোন মঠ ছিল না। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর কোনো সময় মঠ ও মন্দির হয়েছে। ১৯২৭ সালে প্রথম জয়রামবাটী যাই জয়রামবাটী থেকেই আগত মহারাজ ও শ্রীশ্রীমায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র জানকীরাম মুখুজ্জের সঙ্গে। মনে আছে সেবার মার্টিন কোম্পানি ছোট রেলগাড়ীতে চাঁপাডাঙা গিয়ে তারপর দামোদর পেরিয়ে গোরুর গাড়ীতে গিয়েছিলাম। তখন শ্রীশ্রীমায়ের মূল মন্দির হয়েছে তবে সামনের সংলগ্ন নাটমন্দির হয় নি। পিছনে একটি দোতলা টিনের বাড়িতে আশ্রম ছিল। কয়েকজন সাধু থাকতেন। এখানে তাঁর জন্মস্থানের উপরেই মন্দির হয়েছে।

তাঁর মূর্তি স্থাপন হয়েছে ১৯২৪ সালে। ঠাকুরের ভিটাবাড়ীতে জন্মস্থান ঢেঁকিশাল একটি প্রাচীর ঘেরা ছিল। পাশে আমগাছটি এবং উঁচু মেজের উপর রঘুবীরের পূজার ঘর। নিজেদের দুটি বাসগৃহ খড়ের ছাউনি ঘর ছিল।

মনে আছে একবছর আমি বেলুড় থেকে সাইকেল নিয়ে যাই। সঙ্গে একব্যাগে কিছু ছবি ও ঠাকুরের প্রচার পুস্তিকা। বারবার যাওয়া আসার জন্য (প্রায় পঁচিশ বার-এর-ও বেশী) কামারপুকুর জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র জানকীদাদা, ক্ষুদিরামদাদা [ফুদি বলে শ্রীশ্রীমা বলতেন], ঠাকুরের ভাইপোর নাতি কানাইদা [কানাই ঘোষাল]-এর সঙ্গে আমার খুবই আলাপ পরিচয় হয়ে গিয়েছিল।

একবার কামারপুকুর পল্লীতে সাগরের মা নামে এক বৃদ্ধাকে আমি দর্শন করেছি—কানাইদা পরিচয় দেন—ইনি শ্রীশ্রীমায়ের অনেক সেবা এখানে করেছেন। আমি কুশল জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন তাঁর একটু দোক্তা দরকার। আমি তাঁকে একটি আধুলী দিই। মনে পড়ে ঠাকুরের মা চন্দ্রামণিও মথুরবাবুকে এক আনার মাত্র দোক্তা চেয়েছিলেন। কেন যে ঠাকুর ও মা ঐ দেশে জন্মেছিলেন তা আমরা বেশ বুঝতে পারি। প্রসঙ্গত বলি ওখানে লাহাবাজারে এক কাঁসার দোকানে এক বৃদ্ধ আমাকে বলেন—নানা যুগে নানা ঠাকুর হয়েছেন। আমাদের এই যুগে ইনিই আমাদের ঠাকুর।

কামারপুকুর ও জয়রামবাটী যাওয়ার সূত্রে বেশ কয়েকবার ঠাকুর ও মায়ের প্রথম মঠ কোয়ালপাড়া গিয়েছি ও অবস্থান করেছি। শ্রীশ্রীমা এখানে স্বহস্তে ঠাকুরের ছবির পার্শ্বে নিজেকে বসিয়ে পূজা ভোগারতি করেন। তারপরে মঠ প্রতিষ্ঠা হয়। তিনি এখানে অনেকসময়ে একটি ঘরে থাকতেন। বেলুড়ে থাকার সময়ে কোয়ালপাড়া মঠে স্বামী ধ্রুবানন্দের সঙ্গে সাক্ষাত করে আসি। একবার ১৯৬৯ সালে ৩১শে ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসবে কোয়ালপাড়া আশ্রমে থাকার সৌভাগ্য হয়। মনে পড়ে পরদিন ভোরে মঠের পাশে বড়রাস্তায় বেড়াতে বেরোলাম। মঠাধ্যক্ষ বর্ষীয়ান সাধু অটলানন্দ মহারাজও সঙ্গে আছেন। সূর্যোদয় হল। বললাম, মহারাজ আজ পয়লা জানুয়ারি, আপনি আমাকে আজ সূর্যোদয় দেখালেন। এই স্মৃতি চিরকাল জাগ্রত থাকবে। কতকবছর আগে একবার কামারপুকুরে একা গিয়েছিলাম। গেস্ট হাউস-এর একটা ঘরে আশ্রয় পাই। সেখানে ধানবাদের ওদিকের চারজন ছেলে ছিল। আমি একদিকে একা পড়ে আছি তারা নানারকম কথা বলছে। একটি ছেলে, তার মাথায় বেশী চুল, গোঁফদাড়ি আছে, [পরে শুনেছিলাম পোস্ট অফিসে কাজ করে] বলছে শুনলাম—দেখ, অনেকে বলে তোমরা ওখানে ঠাকুরের দেশে ঘোরাফেরা কর

কেন? আমি বলি কি ভাই, অনেক জন্ম তো ঘুরেছি একটি জন্ম না হয় জয়রামবাটীতে গেল—ভাবনা কি! আমার মনে হল—এমন সরল কথা আর শুনিনি। ঠাকুর ওখানে আছেন। তাঁর কথাও তো এমনি ছিল—হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহু।

আমার অধিকাংশ ভ্রমণই একক ভ্রমণ। যিনি আমার পরম আশ্রয় সেই ঠাকুর সর্বদাই সঙ্গে আছেন। যখনই কোনরূপ সমস্যায় পড়েছি, তিনি কোন না কোন পথে সাহায্য করেছেন।

জীবনের পথে পথে ঘটনার মিছিল। মানুষের মুখের মিছিল। কিন্তু সবকিছুর মধ্যে থেকেও আমি কখনও জীবনের উদ্দেশ্য থেকে অধ্যাত্মবোধকে পৃথক করিনি। আমি জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছি—শিক্ষাদান ও মানবসঙ্গ প্রকৃতপক্ষে দুটোই এক। সমস্ত জীবনই শিক্ষালাভ করতে হয়।

আনন্দ কোন পথে আসে সেটা নির্ভর করে কর্মপদ্ধতির উপর। কর্মের মধ্যে আনন্দ মিলতে পারে যদি পদ্ধতি উত্তম হয়। যেন তেন প্রকারেণ উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা করা সঠিক পন্থা নয়। ভাল কাজ করব ভাল ভাবে—মহাত্মা গান্ধীর জীবন থেকে এইরূপ শিক্ষাই আমি লাভ করেছি। কর্মফল ত্যাগ করে কাজ করলে আনন্দ সহজলভ্য হয়, তবে একেবারে সমস্ত ছাড়লে মানুষ বাঁচে না, তাই যতদূর সাধ্য উচ্চ চিন্তা ও সরল জীবন যাপন করা যায় তাই ভালো। দিনরাতের অধিকাংশ সময়, জীবনের সবচেয়ে বেশী সময় কর্তব্যবুদ্ধি, আর যাদের কাজ করছি তাদের দুঃখকষ্টবোধ আমাকে বেঁচে থাকার প্রেরণা যোগায়। সবসময় সচেতন থাকি যদি ভুলে খবর না পেয়ে কারো ক্ষুধিত ছেলে কষ্ট পায় তবে সেই দুঃখ আমাকে আঘাত দেবে বেশী। মানুষ বাঁচবে অপরের জন্য, প্রতিদিন কিছু করবে অপরের হিতের জন্য—এটাই আমার জীবনের আদর্শ, মূল জীবনচেতনা। যাঁরা কেবল আত্মোন্নতি খোঁজে, তারা জীবনের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। জীবনের অনেকটা পথ চলে এসেছি। আজ বিনা দ্বিধায় বলতে পারি—আমি ভালবেসেছি এই দেশকে, দেশের মানুষকে, বিনিময়ে পেয়েছি দেশের মানুষের হৃদয় ভরা ভালবাসা।

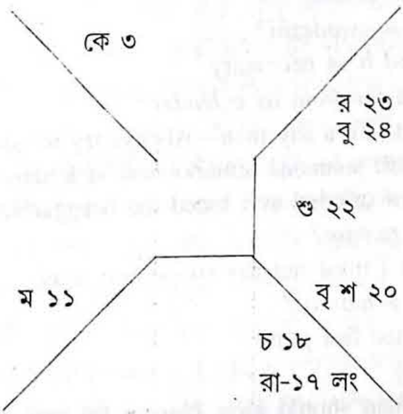
সর্বদা এই চিন্তায় মগ্ন আছি যেন সংগ্রামী সৈনিকের মত যুদ্ধক্ষেত্রেই জীবন শেষ করে যেতে পারি।

—

নির্দেশিকা

১ রমণীমোহন মাইতি-র জন্মপত্রিকা

শকাব্দ ১৮২২। ১০। ০।৪৪।৩০ [১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯০১]



২ পরবর্তীকালে রমণীমোহন তাঁর পঁচাশি বছর বয়সে 'গুণধর' সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশের সময় স্বয়ং এই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন।

৩ ১৩ মার্চ ১৯২৯। রমণীমোহন এ দিনের ডায়েরিতে লিখেছেন—''আজ শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব। সকালে সঙ্কীর্তন বাহির হইল—সভার আয়োজন —ওদিকে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা—তাম্রফলক স্থাপন—তৎপূর্বে শ্রীমন্মহাপুরুষ মঃ আমি প্রণাম করিবার সময় বলিতেছেন—'ঠাকুরের কাজ চলবেই এ শরীর থাক আর যাক। পাঁচ-সাত শত বৎসর এই স্রোত চলবে। বেশ লোকের ভীড়। স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, শ্রীম প্রভৃতি উপস্থিত...'।

৪ দক্ষিণ কাশিমনগর গ্রামের দামোদর হাজরার পুত্র ভুবনচন্দ্র হাজরা।

৫ প্রকৃতপক্ষে উল্লেখিত তারিখে বিদ্যালয়টির উদ্বোধন অনুষ্ঠান হয়। রমণীমোহন রচিত সংগীত এবং মদনচাঁদ মহাপ্রভুর পূজার্চ্চনা ও প্রসাদ বিতরণ দিয়ে। এর পূর্বে মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে ভুবনচন্দ্র ও রমণীমোহন স্থানীয় আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সহযোগে প্রথম সভাটি আহ্বান করেন ৩রা নভেম্বর ১৯৩১। মাত্র পাঁচটি সভার পরেই দু মাসের মধ্যে বিদ্যালয়ের উদ্বোধন স্থানীয় জনসাধারণের বিদ্যোৎসাহ এবং রমণীমোহনের অসাধারণ সংগঠন-শক্তির পরিচায়ক।

সিংহাবলোকন—A life of ninety years

- *Are you a brave man?*
  No I was timid
- *Why went to swadeshi?*
  I praised it as necessary.
- *Why not in forefront as a leader?*
  I feared like a shy man—Always try to conceal my identity— lest someone remarks-here is a hero—I am really a very low minded as I hated the braggarts.
- *Are you a patriot?*
  Yes but I must not say so—others may.
- *Are you a democrat?*
  Yes to the last point.
- *Why?*
  Every man should have respect for others openion—but we should be rational. I defended U.B. as other districts took it. Are the other people fools and I am a forward man ? They may be wrong yet they should have considerations. We must not be proud. I think modesty and forbearance is the best thing of human life. A fool is the man who thinks he is better than others.
- *Should we obey everyone?*
  No—We must think over and over.
- *How to work for the society?*
  In secrecy—that may lead to pride.
- *What about Lord?*
  He is kind and he may be propitious that is His Will. He is s child playing but who are we to judge Him?
- *What about poor men?*
  It's god's will and the man's lethargy.
- *How are you time day and night?*
  Like a shy boy stand like a beggar to Mother.

আমি দিয়েছি একটি জীবন

আত্মপ্রশংসা/প্রচার মৃত্যুর সমান। একথা মহাভারতে কর্ণপর্বে আছে।... তথাপি কেন এরকম একটি কাজ করতে গেলাম তার কিছু কারণ আছে। যেদিন তমলুকের পশ্চিমদিকে মানিকতলা চৌরাস্তার মধ্যস্থলে শহীদ মাতঙ্গিনী মূর্তি উন্মোচন হয়, সেদিন আমি উপস্থিত। চৌরাস্তার উত্তর-পশ্চিমে কিছু আসন Freedom Fighter-দের জন্য। আমি Freedom Fighter আসনে একা। পরে এলেন একজন। ইনি গুণধর ভৌমিক। শহীদ মাতঙ্গিনীর ঐ দিকের স্বাধীনতা যোদ্ধা। আমি যখন আসনে একা গিয়ে বসি কেউ ছিলেন না। একজন অফিসার জিজ্ঞাসা করেন—আপনি কি Freedom Fighter? আমি বলি—হাঁ। ওখানটা কেন ফাঁকা তা তখন বুঝতে পারিনি। মনে হয় স্বদেশ সেবক নেতৃবৃন্দ, পুলিশের উদ্যোগ দেখে স্বেচ্ছায় আসেন নাই। মাতঙ্গিনীর মূর্তি স্থাপনে মেদিনীপুর পুলিশের ভূমিকা ছিল।

যাই হোক পরে যখন Freedom Fighter পেনসন মঞ্জুর হয় ইন্দিরা গান্ধীর আমলে, তখন Freedom Fighter-গণ, ছয়মাসের বেশী কারাবাসী দেশসেবকগণ দরখাস্ত করেন—আমি ফাঁকের লোক—জিজ্ঞাসিত হলে বলি আমি ঐ দলের নই—মুখে বলি—আমি এমন কি করেছি যে দেশের লোকের কাছে প্রতিদান চাইব? এখনও তাই মনে করি। আমার দলে আপাতত দু জন—অনঙ্গমোহন দাস [ময়না] ও বিল্বপদ জানা [দেউলপোতা]। আর কারও কথা শুনি নাই।... আমার মনে সংশয় এল যখন উদারনীতি ঘোষণা হল। তখনও কেউ বলল, আসরে নেমে আসুন না—অনেকে পাচ্ছে—কেউ বলে, নাবালকরাও নাকি Freedom Fighter হয়েছে—তদ্বিরের জোরে সব হয়। আমি মনে করি প্রলোভন বিষম বস্তু।

শাস্ত্র বলে মহাভারত দেখ—আত্মপ্রচার/প্রশংসা মৃত্যুতুল্য হয়। কর্ণের কাছে লাঞ্ছিত যুধিষ্ঠির অর্জুনকে তিরস্কার করলে অর্জুন যুধিষ্ঠিরের নিন্দা করেন ও এই পাপের জন্য মৃত্যুবাসনা করেন—পার্থসারথি মীমাংসা করেন। অর্জুন আত্মনাশে উদ্যত হলে কৃষ্ণ বললেন : তুমি বলছ মৃত্যুই আমার এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত—তুমি তিনবার নিজের দর্প করে আত্মপ্রশংসা কর—তোমার মৃত্যুতুল্য প্রায়শ্চিত্ত হবে। নিজের মুখে নিজের কথা বলতে নাই—বিনয়াচারে বাধে। তবু ইতিহাসকে ফাঁকি দেওয়া ঠিক নয়। তাতে মিথ্যা আচার হবে। তাই কিছু লিখি।...

আমি কি Freedom Fighter—প্রশ্ন করি। মিথ্যা বলেছি কি? দরখাস্ত করি নাই—আমি মনে করি দেশ আমাকে অনেক দিয়েছে—আমি অযোগ্য সন্তান কিছু দিতে পারি নাই—তবু মনে করি Freedom Fighter আছি...

আমি জেলখানা দেখি নাই—সে ভাগ্য হয় নাই—ছাপাখানাসহ থানায় যেতে

হয়েছিল—তখনই ছাড়। পরদিন থানা আক্রমণ হয়, অনেকে শহীদ হন। আমরা জানতে পারি নাই। স্কুলে পরীক্ষা চলছিল। বিকালে শুনলাম গুলি চলেছে মিছিলের উপর—আমাদের ছাত্র ক্ষুদিরাম বেরা ফেরে নাই।

আমি দেশের কাজ যতটা করতে সুযোগ পেয়েছি তা আমার বড়দাদার উৎসাহে। ১৯৪৩ এর দুর্ভিক্ষ বৎসরে আমি স্কুল থেকে বিনা বেতনে ছুটি নিই আর্তত্রাণের কাজে—, এটা কি ঠিক কাজ হয়েছে? দাদা বলতেন—মানুষের জীবনে এমন দেশসেবার সুযোগ কমই আসে। দেশের সেবা করতে হলে, নিঃস্বার্থ হয়ে করতে হয়। আমি অতি দীন সেবক—এমন কিছু করি নাই যাতে দেশের কাছে পুরস্কার চাইব—যা যথাসাধ্য তা করেছি।

তারা প্রাণ দিয়েছে, জেল খেটেছে
মার খেয়েছে—
আমি দিয়েছি একটা জীবন
সে জন্য পুরস্কার!

[আপনি কি স্বাধীনতা সংগ্রামী? পেনসন দরখাস্ত করেন নাই কেন? এ ধরনের প্রশ্নের উত্তরে লেখা]

আমার জীবনে দৈব সংযোগ

□□ বাগবাজারের রাস্তায় কয়েকটি ছেলে লাটিম খেলছিল। আমি আসছি [বেলুড় মঠে অবস্থানকালীন ঘটনা : ১৯ নভেম্বর ১৯২৭] আর মনে পড়ছে, আমরাও লাটিম খেলতাম [তমলুকে ছাত্রাবস্থায়]। যদি একটি লাটিম পাই, এখনও খেলা করি—মন এমনই আছে। বেলুড় ফিরলাম। পরদিন দুপুরে জেটির পার্শ্বে গঙ্গায় স্নান করতে গেলাম। দেখি একটি লাটিম ভাসছে। মনে করলাম, কাহারও খারাপ লাটিম বুঝি, গঙ্গায় ফেলে দিয়েছে। তুলে দেখি দিব্য ভালো লাটিম। সুতা জোগাড় করে লাটিম খেলতে লাগলাম। আমার ক্ষুদ্র বাসনাটুকুও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নাই। তিনি যে অভীষ্টদ।

□□ যখন প্রথম 'আ মরি বাংলা ভাষা' অতুলপ্রসাদের গানটি শুনি, তখন উহা শিখবার বিশেষ আগ্রহ হয়। কিন্তু গানটি কোথাও সংগ্রহ করতে পারলাম না। একদিন কলকাতার পথে একটি কাগজ কুড়িয়ে পেলাম। খুলে দেখি উহাতে গানটি এবং উহার একটু স্বরলিপি পর্যন্ত দেওয়া আছে। কোনও মাসিক পত্রের একটি পাতা। কত কাগজ পথে ঘাটে পড়িয়া থাকে, দৃষ্টিপাত করিনা। আজ উহাই বা কুড়াইলাম কেন। কে যেন অজ্ঞাতে ছেঁড়া কাগজটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এই ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষাটিও তাঁর দৃষ্টি এড়াল না।

□□ ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাস। কোনও প্রয়োজনে বেলুড় মঠের সম্মুখে গঙ্গার ধারে ব্রাহ্মী শাক তুলছিলাম। সহসা মনে হল শ্রীশ্রীঠাকুরের নামে সংস্কৃত ভাষায় স্তোত্র রচনা করব যা গানের মত হবে। গুনগুন করতে লাগলাম। আপনা হতেই কয়েকটি লাইন গাঁথা হল। আমি তাড়াতাড়ি এসে সেগুলি লিখে ফেললাম। তিন চার দিন পরে বরানগরে শ্রীশ্রীঠাকুরের সমাধি উৎসবে গিয়ে শ্মশানে সমাধি দর্শন করতে গেলাম। ফেরবার পথে আরেক স্তবক স্তোত্র রচনা হল। এইরূপে আমার "দীপ্তমহিমোপেতমশেষগুণযুত-মভীষ্টদং" স্তোত্র রচনাটি সম্পূর্ণ হল। পরে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামীজীর নামে কয়েকটি স্তোত্র লিখেছি। তাঁর কৃপায় আমার ন্যায় মূকও বাচাল হল।

□□ ১৯৪৫ সালের কথা। গৌড়ীয় মঠের প্রচারক শ্রীমৎভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ ছায়াচিত্র যোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবনী বর্ণনা করেন। কলিযুগের তারকব্রহ্ম নাম—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

অসংখ্যাত ভাবে কীর্তন করায় কোন বাধা নেই, এরূপ বলেন। কয়েকদিন পরে এক গভীর রাত্রিতে আমি জাগরণে অনুভব করি আমার মধ্যে সেই মহানাম নীরবে কীর্তিত হচ্ছে। এই অদ্ভুত ঘটনা শ্রীমন্মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দের দয়া ভিন্ন আর কিছু নয় বলে মনে করি।

□□ ২৬ শে মার্চ ১৯২৮। স্বপ্নে দেখি জোয়ার গাঙে তুলসী মহারাজ ও আমি ভাসছি। ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯২৮ (বেলুড়মঠে অবস্থান কালে)—আজ কোথাও বের হলাম না। দুপুরে অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম—কে যেন বলছে—'ইষ্টদর্শন হলে সব ঠিক হয়, তার পূর্বে নয়।"

□□ ২রা ডিসেম্বর ১৯২৮ রাত্রিতে অদ্ভুত স্বপ্ন—পূজনীয় তুলসী মহারাজ আমাকে রং করা কাপড় দিচ্ছেন। যেন কোনও অজানা জায়গায় গিয়েছি।

[রমণীমোহনকে পরবর্তীকালে তুলসী মহারাজ দীক্ষা দেন। কলকাতা থেকে তমলুক সেকালের স্টীমার করে তুলসী মহারাজ আসেন। সঙ্গে রমণীমোহনও ছিলেন।]

□□ আমাকে মাকে দিয়ে গেছেন...
তাঁর কাণ্ডকারখানা চিন্তার অতীত। সর্বসংশয়ছেদন অভীষ্টদ আমার ঠাকুর। আবার মদীয় গুরুদেব আমাকে মাকে দিয়ে গেছেন, অথবা বলি তিনি মাকে আমাকে দিয়েছেন। যাঁর কৃপায় এই তুচ্ছ জীব কলিকাতা মহানগরীতে পাঁচ বৎসর ভ্রমণ করলেও কোনো প্রলোভনে পড়ে নাই—যখনই সামনে অশুভ আসিয়াছে, জানি মা পিছনে আছেন—মায়া দূরে সরিয়াছে। আপনাদের কেন লিখলাম যে অবস্থার মধ্যে আপনারা চলছেন—ঠাকুর ও মা চালিয়ে নিয়ে যাবেন—কত অশুভ মন ওখানে শান্ত হবে।...

আমি লিখেছি অক্ষম সন্তানে স্নেহ সমধিক মার—তাঁর দয়ার সীমা নাই—আমার পিছনে সেই মা সারদা তাঁর পা মেলে আছেন জয়রামবাটী মন্দিরে—আমরা পাব বলে। ধানবাদের ছেলেটা বলেছিল—অনেক জন্ম গেছে একটা জন্ম না হয় জয়রামবাটীতে গেল—ভাবনা কি?

শেষকথা

যুদ্ধ শেষ হয়েছে। সুখ দুঃখ দুইই হয়েছে। আমি অতীত ও ভবিষ্যৎ নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। ... বহু কষ্টে যে কাগজ যোগাড় করতে পেরেছি তা শেষ প্রায়।.... আমি ভারতের অতীত ও ভবিষ্যৎকে আবিষ্কার করতে পেরেছি? কিসের বন্ধনে তারা আবদ্ধ হয়েছে? অদৃশ্য বন্ধনে আবদ্ধ ভারতীয়গণ। অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক বিপরীত ভাবের সমাবেশ। বারবার আক্রমণেও ভারতআত্মা বিজিত হয়নি। মনে হয় বিজিত, কিন্তু তা নয়—অন্ধকারময় পথের ভিতর দিয়ে যাত্রা তথাপি উষ্ণপ্রভাত—সুখে দুঃখে পতনে উত্থানে I love India —ভারতে নবযুগের উত্থান হচ্ছে—বিশ্ব অনেক উন্নতি করেছে—কিন্তু ঘৃণা ও বিদ্বেষের উপরে তা স্থাপিত। যাতে মানুষ প্রকৃত মানুষ হয় সে পথে যাচ্ছে না। যুদ্ধ—সত্য ও মানবত্বকে নস্যাত করে। কখনও যুদ্ধ অনিবার্য কিন্তু তার ফল হয় ভয়ানক—অচিন্ত্যনীয়—মানুষ তো মৃত্যুর অধীন—সে কথা নয়।

কিন্তু deliberate and persistent propagation of falsehood and hatred—which gradually becomes the normal habits of the people—এই নিয়ে জীবনযাপন করা যায় না। এর ফলে মন সঙ্কুচিত হয়।... এখন ভবিষ্যৎও ভয়ানক হবে। স্বাধীন ভারত উজ্জ্বল হবে। বিশ্বাস ও দৃঢ়তায় সে অগ্রসর হবে—অন্যদের সঙ্গে সে সহযোগিতার শিক্ষা নেবে। অনুকরণ কিছু নয়—সঙ্কীর্ণ মনের দিন চলে গেছে।...

[নব্বই বছর বয়সের পরে পুরানো ডায়েরী'র পাতায় কোন একদিন লেখা—Epilogue শিরোনামে।]

পুরানো সেই দিনের কথা

তমালিকা

বর্তমান শতাব্দীর প্রথমের দিকে তমলুক শহর থেকে 'তমালিকা' নামে এক সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রচার ছিল। কাগজখানির সামান্য বিবরণ জানা যায়। সম্পাদক, মুদ্রাকর উভয়েই পরলোকগত। তমলুকের রাধাশ্যাম প্রেসে কাগজটি ছাপা হত। প্রকাশক ও মুদ্রক ছিলেন ঘাসীপুর নিবাসী বাবু সীতানাথ মণ্ডল। সম্পাদক ছিলেন তালুক-গোপালপুর নিবাসী শ্রীধরচন্দ্র অধিকারী। শ্রীধরবাবু বড় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও বাগ্মী ছিলেন। অতি কঠিন শাস্ত্রতত্ত্ব ও অতি সরল করে ব্যাখ্যা করে তিনি সকলকে মুগ্ধ করতেন। তাম্রলিপ্তে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আগমন বিষয়ে গবেষণা করে তিনি তমলুককে গৌরবান্বিত করেছেন।

১৩১৪ বঙ্গাব্দের একখানি তমালিকা আমরা দেখেছি। তাতে এই মর্মের একটি খবর ছিল : টাঠারিবাড় গ্রামের পূর্ব পাড়ায় এক ব্যক্তি সকালে হাই তুলতে গিয়ে মুখ খোলা মাত্র তার চোয়াল আটকে যায়। সে মুখ বন্ধ করতে পারে না। গ্রামস্থ শীতলা দেবীর নামে পূজা দেওয়ার মানসিক করে। তখন মুখ বন্ধ হয়। শোনা যায় সে পূর্বে উক্ত দেবীর নিকট পূজা মানত করেছিল কিন্তু পূজা দেয় নাই।

উমের কেতনা হ্যায়

একসময় মেদিনীপুর শহরকে পাঠান সেনাদের হাতে দেওয়া হয়েছিল। তারা চকে চকে পাহারা দিত। অর্থাৎ শহরের মধ্যে যে পঁচিশ তিরিশটি চক বা চৌরাস্তা আছে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকত। শহরের লোকদের উপর পাইকারি জরিমানা ধার্য হয়েছিল। সূর্যাস্ত হলেই কেউ রাস্তায় বেরোতে পারত না। রেল স্টেশন এই আদেশের বাইরে ছিল। তিরিশ বছরের কম বয়সী যুবকদের ওরা ধরত এবং থানায় জিজ্ঞাসাবাদ করত। এক পাহারা স্কুলবাজার চকে এক ছেলেকে ধরে জিজ্ঞাসা করে—উমের কেতনা হ্যায়? সে বলে সাত্তাইশ্। তখন পাহারাদার বলে—বিশ পচিস তিস—ইসকা ইধার কি উধার বতাও। ছেলেটি বলে উধার—তব্ চলা যাও।

সুকুলকা ইন্সপেক্টর কৌন্ হ্যায়

আমি একবার স্কুলের কাজে মেদিনীপুর যাই খড়গপুর থেকে সদরঘাটে খেয়া পার

হয়ে। আমি নদী থেকে উঠেই পাহারাকে বলি আমাকে স্কুল ইন্সপেক্টর অফিস যেতে হবে। সে বলে থানামে চলা যাও, নেহী তো পাকড় যায়েগা। আমি জগন্নাথ মন্দিরের সামনে পাহারাকে যখন জিজ্ঞাসা করি এক হাবিলদার হাজির। সে বলে—খবর কেয়া। আমার উত্তর শুনে বলে, সুকুলকা ইন্সপেক্টর কৌন হ্যায় রে! আমি বলি যাঁহা লেড়কা লোক পড়তা। সে বলে—তব্ চলা যাও।

হোরমিলার কোম্পানি

হোরমিলার কোম্পানি একটি বিলাতী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান—এদেশে তাঁদের একটি কারবারের সঙ্গে আমরা বাল্যকাল থেকে পরিচিত। ক্যালকাটা স্টীম নেভিগেশন কোম্পানির ছোট বড় স্টীমারগুলি মেদিনীপুর, হাওড়া ও চব্বিশ পরগণা জেলার দীর্ঘকাল সেবা করেছে—এমনকি কলিকাতা-শান্তিপুর একটা লাইনও ছিল। বড় দোতলা স্টীমার—পানসি নৌকার মতো গড়ন কয়েকটির ছিল—ষোড়শী, উর্বশী, কিন্নরী, সুকেশী। এদের দুটি করে চোঙ ছিল। পেছনে মস্ত বড় পাখা জলে খানিকটা ডোবা থাকত। ছোট—শীতল। ইন্দ্রিলা একচোঙা ছিল—তাদেরও পিছনে পাখা। তারা কোলাঘাট থেকে ঘাটাল যেত। যাত্রীরা উপরে, নীচে ইচ্ছামত বসতে, শুতে পারতেন। নীচতলায় সাধারণত মাল বহন করা হত। ষোড়শী ও উর্বশী শেষপর্যন্ত ছিল। সুকেশী ডুবে যায়। কিন্নরীও সার্ভিসে আসত। হাওড়া পুলের পাশে দক্ষিণ ধারে আর্মানীঘাট জেটি থেকে সকালে ছেড়ে বজবজ, উলুবেড়ে, ফলতা ইত্যাদি স্থানে ধরে গেঁওয়াখালি আসত। তারপর রূপনারায়ণের ঘাটে ঘাটে ধরে তমলুক, কোলাঘাট হয়ে ঘাটালের দিকে রানীচক যেত। এদিকে ভোরে রানীচক ছেড়ে তমলুক গেঁওখালি হয়ে আর একখানি স্টীমার কলকাতা যেত। হিজলী ক্যানেলে একবার তাঁরা ছোট লঞ্চ দিয়েছিলেন ইটামগরা পর্যন্ত। ক্রমে ডাঙায় মোটর, লরি, বাস এল। নদীতেও চর বাড়ল—ওদের ব্যবসায় গুটাল।

উটের গাড়ী—চন্দ্রালোকিত রাত্রে

উটের গাড়ীর নাম শোনা ছিল—আগে দেখি নাই। বাঁকুড়া শহরে যখন জাতীয় বিদ্যালয়ে থাকি [১৯২১] তখন দেখি লালবাজার থেকে দুখানি উটের গাড়ী বাঁকুড়া-মেজিয়া যাতায়াত করে। প্রতি গাড়ীতে দুটি উট জোড়া থাকে। গাড়ী কতকটা ঘোড়ার গাড়ীর মত—তবে লোকে সাধারণত উহার ছাদের উপরে বসে, চালকও সেখানে বসে। ভিতরে নিমপাতা অনেক পরিমাণে লওয়া হয়—উটেরা ঐ পাতা খায়। সন্ধ্যের পর একটু রাত হলে গাড়ী ছেড়ে রাত্রির মধ্যে আঠাশ মাইল রাস্তা অনায়াসে চলে যায়।

উটেরা বাঁকুড়া থেকে উত্তরমুখে গন্ধেশ্বরী নদীর উপর দিয়ে পার হয়ে, লম্বা লম্বা পা ফেলে যখন যায় চন্দ্রালোকিত রাত্রে, সেই দৃশ্য আমার পক্ষে নূতন অভিজ্ঞতা ছিল।

নাটশাল মঠ

নাটশাল গেঁওখালির মেদিনীপুরে। নাটশাল মঠের সঙ্গে আমার সম্পর্ক গোড়া থেকে। আমি যখন বেলুড়ে ছিলাম তখন নাটশালের দেবেনবাবু প্রায়ই সেখানে যেতেন। বর্তমানে যে স্থানে মঠ আছে ওখানে বাবু দেবেন্দ্রনাথ ধাড়া আশ্রম করবেন স্থির করেন। তিনি আমাকে ঐ স্থান দেখিয়ে বলেন, যখন বাবুরাম মহারাজ [স্বামী প্রেমানন্দ] বেলুড় মঠ থেকে এ অঞ্চলে আসেন তিনি বলেছিলেন, দেবেন, এই তিন গঙ্গার মুখে ঠাকুরের একটি আশ্রম হলে ভাল হয়। আমি ঠিক করেছি ঐ জায়গাটা দেব। একবার ওখানে বেলুড় শিল্প বিদ্যালয় থেকে ঠাকুরের একখানি ছবি বাঁধিয়ে এনে দিই। ২৩শে মে, ১৯২৭ বেলুড় শিল্পবিদ্যালয়ে স্বামী ব্রজেশ্বরানন্দ প্রেমানন্দজী সম্পর্কে যেসব কথা বলেন আমি ঐ সমস্ত কথা নোট করে নাটশাল মঠে দিয়েছি।

সেকালের দুই কর্তামশায়ের কথা

কাঁকুড়দা'র বেচারাম বাবু

কাঁকুড়দার বিখ্যাত জমিদার মাইতিবাবুদের নাম কীর্তি অনেক প্রচার আছে। মহিষাদল-রাজ যে সকল প্রজাদের বিশেষ গণ্যমান্য করতেন তাঁদের মধ্যে কাঁকুড়দার বেচারাম মাইতি অন্যতম।... বেচারাম খোস মেজাজের লোক ছিলেন। ধর্মপ্রাণতা তাঁর বিশেষ গুণ ছিল। একবার মহিষাদল-রাজ জ্যোতিপ্রসাদ গর্গ কোন লোক প্রমুখাৎ জানতে পারেন যে বেচারাম একটি ভাল শালগ্রাম শিলা [দধিবামনজী] পেয়েছেন। তিনি ইচ্ছা করলেন ঐ ঠাকুর নিজে প্রতিষ্ঠা করে পূজা করবেন। বেচারামবাবুর অনুপস্থিতিতে রাজার লোকজন তাঁর বাড়ী থেকে ঠাকুর নিয়ে চলে আসেন। বাড়ী ফিরে খবর শুনে বেচারামবাবু অত্যন্ত মর্মাহত হলেন ও অন্নজল ত্যাগ করে পড়ে রইলেন। এ খবর রাজার কাছে পৌঁছলে তিনি তৎক্ষণাৎ বেচারামের ঠাকুর ফেরত দিলে বেচারাম অন্নজল গ্রহণ করেন।

বেচারামবাবুর নজর সর্বদা উঁচু ছিল। একবার বেচারামবাবু সেবক দ্বারী দিন্ডা সহ প্রতিবেশী গ্রাম থেকে উপহার পাওয়া একটা মাছ নিয়ে ফিরছিলেন। কিছুদূরে গেলে বাবু বললেন—দ্বারী, মাছটা কত হবে বল দেখি। দ্বারী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল—কর্তা, মাছটা আড়াই বা তিনি সের হতে পারে। আরও কতক রাস্তা গিয়ে বাবু বললেন—মাছটা ঠিক কত হতে পারে। দ্বারী উত্তর দিত—আজ্ঞে তিন চার সের

হতে পারে। ঐরূপ পথে কয়েকবার বলতেন। দ্বারীও উপযুক্ত উত্তর দিত। বাড়ীর নিকটে ক্যানেলে খেয়া পার হওয়ার সময়ে প্রশ্নের উত্তরে দ্বারী বলত মাছটা পাঁচ ছয় সের হতে পারে। এরূপ জবাবে বাবু খুশী হতেন।

বাবু কোন চাষীকে বলতেন—বল্‌তো, এই জমিটায় কত ধান হতে পারে। সে বাবুর মেজাজ বুঝতো। বলতো—আজ্ঞে তা এক বিশি হতে পারে। [হয়তো আধ বিশিও তাতে হয় না। বিশি—অর্থাৎ কুড়ি মন। আশি মান ধান ওজনে প্রায় তের মন হত]।

বাবু বলতেন— বেশ বেশ তুই লক্ষ্মীভাগ্য লোক। কেউ যদি বলত—কর্তা ঐ জমিতে আর কত ধান হবে, দশ কুড়ি অর্থাৎ আধ বিশি হতে পারে। বাবু রাগ করতেন : বলতেন—কি এত কম ধান? তুই তো চোর রে!

ভোজন বিষয়ে বাবুর কথা শোনা যায়। গেঁওখালি হতে ঠাকুরের জন্য এক কাঁদি কলা নিয়ে নৌকায় আসছেন। পথে সহচরকে বললেন—কেমন কলা দাও তো দেখি। দু চারটা খেতে খেতে অধিকাংশ খাওয়া হয়ে গেল। মহিষাদলে নৌকা এল। বললেন—ওরে! ঠাকুরের কলাগুলো খেয়ে ফেলেছি, কি হবে? বড় দোষের কাজ হয়ে গেছে। সহচর বলতেন—চিন্তা কি, এখান থেকে এক কাঁদি নিয়ে নিন। মহিষাদলে কলা নিয়ে বাড়ী আসতেন।

সেই আনন্দময় পুরুষকে রাজা, প্রজা সকলে ভালবাসতেন। আমি ধন্য যে তাঁর এত কথা জেনেছি। পরবর্তীকালে তাঁদের বহু অন্ন আমি খেয়েছি। তাঁরা আমার কাছে চিরজাগ্রত।

ভুবনচন্দ্র হাজরা

দক্ষিণ কাশিম নগর গ্রামের দামোদর হাজরার পুত্র ভুবনচন্দ্র, বাল্যকাল হতেই বিদ্যোৎসাহী—এজন্য অর্থব্যয়ে সম্পূর্ণ অকুণ্ঠ, পরিশ্রমে সর্বদা অকাতর। তাঁর অকাল তিরোধানের [১৯ শে আগস্ট, ১৯৩৫] পূর্ব পর্যন্ত প্রায় ৩৫ বৎসর তিনি বিদ্যালয় পরিচালনে ব্যস্ত, বিদ্যালয়ের জন্য অর্থসংগ্রহে উদ্যোগী ছিলেন। হাজরা কর্তা বলতেন—ভুবন হাজরার পয়সা খরচের পয়সা, জমার পয়সা নয়।

নিজেই সব করবেন স্থির আছে তথাপি অন্য পাঁচজনের জন্য অপেক্ষা করা তাঁর [বিনয়গুণবশত] স্বভাব ছিল। ব্রাহ্মণগণের আনুকূল্য করা তাঁর ব্রত ছিল। মন্দির প্রতিষ্ঠায় ও বাৎসরিক নানাবিধ ধর্মকার্যে ব্রাহ্মণগণকে সম্মান জানাতেন। শিক্ষক ও ছাত্রগণকে স্বগৃহে প্রতিপালন করা ছিল তাঁর নিত্যকর্ম। কেমন করে কত উপচারে অতিথি সৎকার করবেন তাহাই ছিল তাঁর প্রধান চিন্তা। তিনি ছিলেন সামাজিক নেতা। অপরের মানরক্ষায় সাহায্য করেই তাঁর মানের প্রতিষ্ঠা। দেশবাসীগণকে যে কোন ব্যাপার উপলক্ষে স্বগৃহে সম্মান করতে পারলে তিনি আপনাকে কৃতার্থ মনে

করতেন। অবস্থা বিপর্যয়ের মধ্যেও ভুবনচন্দ্র দক্ষিণ কাশিমনগর উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়টিকে মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়ে উন্নীত করবার জন্যে দৃঢ় সংকল্প ছিলেন। বিদ্যালয়ের জন্য ভূ-সম্পত্তি, আসবাবপত্র, অর্থাদি কোনো কিছু দিতেই তিনি কার্পণ্য করেন নাই। বিদ্যালয়টি ছিল ভুবনবাবুর আনন্দ ও গৌরবের বস্তু। তিনি বলতেন—'বিদ্যালয়টি আমার নাকের তিলক, আপনারা ইহার প্রতি কৃপা দৃষ্টি রাখবেন।'

ভুবনবাবু স্বগ্রামে একটি রথের প্রতিষ্ঠা করেন—শ্রীরামনবমী দিবসে ঐ রথের মেলা হয়।

তাঁহার হস্ত ছিল সংসারে—দৃষ্টি ছিল উচ্চে। অন্তিম সময়ে একটিও সাংসারিক কথা কহেন নাই। কর্মের আকাঙ্ক্ষা ছিল অদম্য—অসমাপ্ত কর্মের মধ্যেই কর্মবীর ভুবনচন্দ্র অকালে প্রস্থান করেন।

[ভুবনচন্দ্র-স্মৃতিবাসরে পঠনের জন্যে রচিত]

মাটি কোথায় যায়

প্রায় সত্তর বছর আগের কথা [১৯২১ সাল নাগাদ]। লেখক তখন বাঁকুড়া শহরে একটা জাতীয় স্কুলে শিক্ষক। সেখানের বড় পণ্ডিতমশায় নলিনাক্ষ কাব্যতীর্থ একদিন বললেন—আমি সেদিন বড় মুস্কিলে পড়েছিলাম। ছাতনার ওদিকে এক মাঠের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। দেখলাম একদল লোক আসছে। আমাকে দেখেই তারা বলল—পাওয়া গেছে, পাওয়া গেছে। আমি একটু শঙ্কিত হলাম, কেননা তারা ঠিক প্রকৃতিস্থ ছিল না। একজন বলল, দ্যাখ্ তুই ঠিক পারবি। আমাদের একটা কথায় ঠেকে গেছে—আমরা যখন ধানের চারা পুঁতি তখন মাটি সরে যায়—প্রতি বছরই ধান গাছ পুঁতি, কিন্তু মাঠ ত উঁচু হয় না—সে মাটি কোথায় যায়? আমি ত মহা সমস্যায় পড়লাম। কিন্তু সাহস হারালাম না। বললাম—এই শাদা কথাটা তোরা বুঝতে পারিছস না? জঙ্গলে বড় বড় উই ঢিপি দেখিস না? তারা বলল—হাঁ হাঁ বেশ বড় বড় ঢিপি দেখা যায়—মানুষের থেকেও বড় হয়। আমি বললাম, তোরা ঠিকই বলেছিস—মাঠ উঁচু হওয়ার কথা কিন্তু ঐ মাটি সেখানে যায়, তাই মাঠ যেমন ছিল, তেমনই থাকে, তা না হলে মাঠ নিশ্চয়ই উঁচু হয়ে যেত। তারা ভারী খুশী হয়ে বললে—তুই ঠিক বলেছিস—লেখাপড়া জানা মানুষ ত বটে!

আমরা পণ্ডিত মহাশয়ের এই গল্প খুব উপভোগ করেছিলাম এবং এত বছর পরেও তা ভুলে যাইনি। অনেকে আমাদের দিন দুবেলা এই রকম বোঝান। যে সব খবরের কাগজ প্রকাশিত হয়, লক্ষ্য করলে দেখবেন তার মধ্যে প্রায় প্রতিদিন অনেক বড়লোকের বক্তৃতা প্রকাশ হয় এবং তারা যে কত রকম বোঝান তা লক্ষ্য করলে

আমাদের পণ্ডিত মশায়ের কথা মনে পড়ে। আমাদের মত নাবালকদের বোঝাবার জন্য তাঁদের কী দারুণ প্রচেষ্টা।

স্বামিজী বলেছেন—ঠাকুর মঠেই থাকবেন

আমাদের হোস্টেলে [বেলুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের শিল্প বিদ্যালয়ের] দোতালায় ঠাকুরঘরে ঠাকুরের সিংহাসনের উপরেই একটি ছোট কৌটা ছিল, উহা ফুলের সহিত গঙ্গায় ফেলিয়া দিয়াছে। কৌটাটি বহুমূল্য অথবা অমূল্য কেননা— উহার মধ্যে একটি সোনার লকেট ছিল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তজননী মাতা ঠাকুরানীর হস্তের একখানি রুলির কিয়দংশ তাঁহার ভস্মাবশেষ হইতে পূজনীয় দেবেন মহারাজ [স্বামী ব্রজেশ্বরানন্দ] পান। তিনি ঐ সোনার দ্বারা একটি অতিক্ষুদ্র লকেট প্রস্তুত করাইয়া উহার মধ্যে একপার্শ্বে ঠাকুরের, অন্য পার্শ্বে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর ছবি বাঁধাইয়া লন। প্রাণকৃষ্ণ নামক অসাবধান হতভাগ্য ছাত্র উহা ফুলের সহিত মুষ্টি মধ্যে গঙ্গায় লইয়া যাইবার জন্য তুলিয়াছে এবং খগেন পূজক উহা গঙ্গায় নিক্ষেপ করিয়াছে। ছেলেরা এজন্যে সকলেই ভাবিত। গঙ্গায় যাওয়া জিনিস যে আর পাওয়া যাইবে না, ইহা সকলেই মনে করিতেছে। তবু একবার চেষ্টা করিবার কথা হইল। তখন জোয়ার ছিল, সুতরাং মঠের দিকে উহা ভাসিয়া যাইবার কথা। আমি বলিলাম—যাও মঠের ঘাটের দিকে খোঁজ করগে। আমার মনে উহা ফিরিয়া পাইবার সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও আশা না থাকিলেও, এই কথা মনে হইতেছিল—ঠাকুর মঠে থাকিবেন একথা স্বামীজি স্বয়ং তাঁহার শিষ্যকে বলিয়াছেন। আজ কি সেই ঠাকুর ও মাতা আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবেন?

ছেলেরা খুঁজিতে গেল...আমি এ দিকে শুইয়া স্বামী শিষ্য সংবাদ পড়িতে লাগিলাম—মাঝে মাঝে মন বড় উৎকণ্ঠিত হইতেছিল...পুস্তক বন্ধ করিয়া মায়ের নাম স্মরণ করিতে লাগিলাম ও ভাবিতে লাগিলাম—মা কি সত্যই এই দীন ভবন হইতে প্রস্থান করিলেন! সহসা একজন ছুটিয়া উপরে গেল এবং যেন শুনিতে পাইলাম 'পাওয়া গিয়াছে।' আমি দৌড়িয়া গেলাম এবং দেখিলাম যে সত্যই প্রকাশ উহা গঙ্গার পাড়ে একটি নৌকার পাশ হইতে কুড়াইয়া আনিয়াছে। দেবেন মহারাজ তাহার পিঠে হাত দিয়ে বলিতেছেন—তুই-ই সত্যি মায়ের অনুরাগী। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—পাওয়া গেল? দেবেন মহারাজ উহার [লকেটটির] উৎপত্তি বিবরণ বলিলেন। ধন্য মায়ের কৃপা ও ঠাকুরের দয়া—নতুবা কে শুনিয়াছে—গঙ্গা গর্ভে নিক্ষিপ্ত সোনার লকেট পুনরায় ফিরিয়া পাওয়া যায়। আজ সত্যই ধারণা হইল—মা ও ঠাকুর বেলুড়ে—এই মঠেই রহিয়াছেন।

[২৩।৭।২৭ ডায়েরির পাতায় রমণীমোহন ঘটনাটি লিখেছেন।]

শহীদ গুণধর হাজরা ও কাঁকুড়দহ জাতীয় বিদ্যালয়

স্বর্গত শহীদ গুণধর হাজরার জীবন সেই যুগের স্বাধীনতা সংগ্রামী এক পুরুষ সিংহের কর্মজীবন। তিনি মাত্র ২৬ বছর এই পৃথিবীতে ছিলেন কিন্তু তার মধ্যেই অমর শহীদরূপে দেশবাসীর হৃদয়ে স্থান পেয়েছেন। তিনি মহিষাদলে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ নীতির প্রধান প্রবক্তা ও কাঁকুড়দহের জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। গুণধরবাবু রাজারামপুর গ্রামে কৈলাসচন্দ্র হাজরার মধ্যম পুত্র ছিলেন। তাঁর মাতার নাম তিলোত্তমা। সম্ভবত ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়।

রাজারামপুর মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়ে গুণধরবাবু প্রথম লেখাপড়া করেন। গুণধরের সঙ্গে এক ক্লাসে ছিলেন টাঠারিবাড় গ্রামের সুরেন্দ্রনাথ সামন্ত ও আমার মেজদাদা নিরাপদ মাইতি। গুণধরবাবু বাল্যকালে তাঁর সঙ্গীদের থেকে লেখাপড়ায় বিশেষ ভাল ছিলেন না। তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে সুরেন্দ্রবাবু প্রথম ছিলেন। সুরেন্দ্রবাবু মধ্যছাত্রবৃত্তি লাভ করে মহিষাদল রাজ হাই স্কুলে পড়েন ও এলাকায় তিনিই প্রথম ম্যাট্রিক পাশ করেন। মহিষাদলে পড়ার সময়ে গুণধরবাবুর মেধার বিকাশ হয় ও পরে মেদিনীপুর কলেজে পড়ার সময়ে তাঁর বিশেষ উন্নতি দেখা যায়। গুণধরবাবু মেদিনীপুর কলেজে আই. এস. সি ও কলিকাতার রিপণ কলেজে বি. এস. সি. পড়েন। তখনকার দিনে এই অঞ্চলে তিনিই একমাত্র বি. এস. সি. পাশ ছিলেন [১৯২০]। আমি যখন মেদিনীপুরে কলেজে পড়তাম তখন তিনি সেখানে কিছুকাল ডিমনস্ট্রেটারের কাজ করেন। ১৯২১ সালের প্রথমে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি মহিষাদলে নবচেতনার উদ্বোধন করেন। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে যখন উনি দেশে কাজ আরম্ভ করেন তখন আমি বাঁকুড়া ও সোনামুখী'র দুটি জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। ঐ সময়ে একবার দেশে আসি। তখন তিনি আমাকে একটি ন্যাশনাল স্কুল বা জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন-এর চেষ্টা করছেন বলেন। কাঁকুড়দা গ্রামে ঐ স্কুল হবে এও বলেন। গুণধরবাবু জেলে যাওয়ার পরে আমি সোনামুখী থেকে ফিরে কাঁকুড়দহ জাতীয় বিদ্যালয়ে যোগদান করি।

মহিষাদল থেকে দক্ষিণে সোজা ক্যানেল পাড়ে চলে গেলে প্রায় দুই মাইল দূরে কাঁকুড়দহ গ্রাম। গ্রামটি খুবই ছোট। ১৯২০ সালে এই গ্রামে ৫০ জন গৃহস্থ ছিলেন মাত্র। এই গ্রাম স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দুর্ভেদ্য দুর্গ ছিল। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের দপ্তরে কাঁকুড়দহ গ্রামের একটি বিশেষ স্থান ছিল। কাঁকুড়দার বিখ্যাত জমিদার মাইতিবাবুদের নাম অনেক প্রচার আছে। গুণধর হাজরা মহাশয় উক্ত মাইতিবাবুদের আনুকূল্যে ও গ্রামবাসীদের সহায়তায় মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের অঙ্গ রূপে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। মাইতিবাবুদের দুর্গামণ্ডপে ও সম্মুখস্থ নাটমন্দিরে বিদ্যালয়টি প্রথমে কিছুদিন চলে। পরে গ্রামের দক্ষিণ দিকে কিছু দূরে কাপাসএড়্যা মৌজার মধ্যে বাবুদের একটি বড় পুকুরের পাড়ে বিদ্যালয়ের জন্য একটি নব্বই হাত ঘরে স্কুল চলে যায়।

একদিন মহিষাদল রথতলায় বিলাতী কাপড় পোড়ানো হয়। জনসভায় গুণধরবাবু জোর বক্তৃতা করেন। আমি যতদূর জানি, তাঁর মধ্যে এমন একটি ক্ষমতা ছিল যাতে সভাস্থলে তিনি সকলকে পরাস্ত করে নিজমত স্থাপন করতে পারতেন। বোধহয় এইসব কারণে কিছুদিন পরে একদিন পুলিশ তাঁর বাড়িতে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা নিয়ে হাজির হয়। সেদিন তাঁর ছেলের অন্নপ্রাশন ছিল। তিনি শাস্ত্রমতে শ্রাদ্ধ করতে বসেছিলেন। শ্রাদ্ধ শেষে তিনি পুলিশের সঙ্গে চলে গেলেন। ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রাজদ্রোহ অপরাধে গুণধরবাবু আড়াই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। কিন্তু বেশীদিন তাঁকে আটকে রাখা সরকারের সাধ্য হল না। গুণধরবাবু ঐ বৎসর ২৮-এ এপ্রিল মেদিনীপুর জেলে অজ্ঞাত অসুখে প্রাণত্যাগ করেন।

কাঁকুড়দহ গ্রামের পূর্ণচন্দ্র মাইতি ও যোগেন্দ্রনাথ সিংহ পূর্ব থেকেই রাজবিদ্রোহের অপরাধে মেদিনীপুর জেলে বন্দী ছিলেন। জেল থেকে মুক্ত হয়ে যোগেনবাবু [তিনি একজন ডাক্তার ছিলেন] বলেন গুনধরবাবুর রোগনির্ণয় ও চিকিৎসা ঠিকমত হয়নি। জেলের ডাক্তার যোগেনবাবু প্রভৃতির কোন কথা শোনেন নাই।

দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল তাঁর কারাকাহিনী 'স্রোতের তৃণ' বইতে লিখেছেন : 'আমরা মেদিনীপুরের অধিবাসী সকলে আমাদের প্রাণের ভাই শ্রীমান গুণধর হাজরাকে এই মাসেই [১৯২২, এপ্রিল] চিরদিনের জন্য মাতৃযজ্ঞে আহুতি দিয়েছিলাম—অন্ততপক্ষে সেই ভীষণ সংবাদটি এই মাসেই আমাদের কাছে এখানে পৌঁছেছিল [আলিপুর জেল, কলিকাতা]। ভাই গুণধর মহিষাদল জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। আমি যখন গত বৎসর প্রচার কার্যে মহিষাদল গিয়েছিলাম তখন তিনি কিরূপ আমার জন্য অকাতরে কষ্ট স্বীকার করেছিলেন সে কথা এখনও আমার মনে পড়ে। এখনও আমার স্মরণ হয় তাঁর সৌম্য শান্ত মূর্তি এবং দেশের ও দশের কল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে তাঁর সেই ঐকান্তিক কামনা ও আগ্রহ। তিনি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন শুনেছিলাম কিন্তু কে জানত তিনি জেলের ভিতর এমনি করে ঘুমিয়ে পড়বেন এবং আমরা রইব চোখের জলে ভেসে যেতে।'

মেদিনীপুর জেলায় গুণধরের মতো মানুষ অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করেছেন। ছোট মেশিন তৈরী, সাবান তৈরী, খাম তৈরী প্রভৃতি শিল্পের শখ তাঁর ছিল। তিনি এক খাম কাটার কল এনেছিলেন। তাতে কাগজ কেটে দিতেন ও আমাদের দিয়ে খাম তৈরী করাতেন। উচ্চাঙ্গের জ্যোতিষচর্চা তাঁর অন্যতম শখ ছিল। গুণধরবাবুর মতো বিশাল হৃদয় স্বদেশসেবায় আত্মভোলা আর চোখে পড়ে নাই। আদর্শে নিষ্ঠা, অমোঘ তর্কশক্তি, দৃঢ় বিশ্বাস তাঁকে সর্বদা উৎসাহিত করেছিলো। তিনি প্রায়ই বলতেন জাপান যাবো, শিল্প শিখবো, দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি করবো, বিজ্ঞানের চর্চা করবো। মেদিনীপুরের জেল থেকে ছেলেদের উদ্দেশ্যে জাতীয় বিদ্যালয়ের তৎকালীন প্রধান শিক্ষক গোরাচাঁদ বাবুকে লেখেন—শান্তির সময়ে যে কোনো ছেলেই শিক্ষালাভ করতে পারে। কিন্তু সংগ্রামের সময় কেবল বীর বালকেরাই শিক্ষা লাভ করতে

পারে। আমাদের ছেলেরা তেমন হোক। এরূপ মনোভাব তৎকালে এ এলাকায় অতি বিরল ছিল।

গুণধরবাবুর মৃত্যুর পরে জাতীয় বিদ্যালয়টির নামের সহিত তাঁর নাম যোগ করা হয়। স্কুলে নূতন ধরনের পড়াশুনার ব্যবস্থা ছিল। 'আনন্দমঠ', 'কপালকুণ্ডলা', 'আর্যকীর্তি' প্রভৃতি পাঠ্য ছিল। ছেলেরা রবীন্দ্রনাথের নাটক অভিনয় করতো। জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ প্রকারান্তরে একদল সন্ন্যাসী ছিলেন। তৎকালে বঙ্গদেশে প্রায় একশত এরকম বিদ্যালয় ছিল।

বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতি 'গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন' নামে বিশ্ববিদ্যালয় গঠন করেন। জাতীয় বিদ্যালয় তাঁদের নির্দেশেই চলত।

নীলমণি হাজরা

গ্রামের নাম রাজারামপুর। এই গ্রাম মহিষাদল রথ সড়কের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে প্রায় তিন মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। গ্রামে দক্ষিণ অংশের মধ্যে দিয়ে ৪১ নম্বর জাতীয় সড়ক পূর্বমুখে হলদিয়া গিয়াছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের দুই মহারথী এই গ্রামে জন্মেছেন। একজন শহীদ গুণধর হাজরা। অপরজন স্বনামে খ্যাত বাবু নীলমণি হাজরা, যিনি লবণ সত্যাগ্রহ থেকে স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত এলাকায় সকলের নিকট কাকাবাবু নামে পরিচিত ছিলেন। নীলমণিবাবুর পিতার নাম শ্রীনাথচন্দ্র হাজরা। পদবী হাজরা হলেও বক্সী নামে তাঁদের পরিচয় সর্বত্র প্রচলিত—তাঁরা মহিষাদলের রাজ এস্টেটে কাজ করতেন। ১৯৩০ সালে যখন লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে দেশ উত্তাল তখন নীলমণিবাবু ও তাঁর পত্নী মহা উৎসাহে যোগ দেন ও আজীবন স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁরা যুক্ত ছিলেন।

নীলমণিবাবু আগস্ট আন্দোলনের একজন প্রধান পরিচালক ছিলেন। জাতীয় সরকারের সময়ে থানার মধ্যে তাঁর অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিল। দুষ্টেরা তাঁর নাম শুনলে কাঁপত। ১৯৪২ সালে থানা আক্রমণের পরে পুলিশ এসে তাঁর বাড়ী পুড়িয়ে দেয়। তিনি গৃহহীন হয়ে সম্পত্তি হারিয়েও নিরুদ্যম হননি। দীর্ঘকাল কারাবাসও করেছেন। কেবল রাজনীতি নিয়ে তিনি জীবন যাপন করেন নি। দেশের প্রতি গ্রামকে, প্রতি পাড়াকে দলাদলি মুক্ত করে শক্ত সমাজ গড়তে নীলমণিবাবুর অদম্য উৎসাহ ছিল। স্থানীয় এলাকায় বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য তাঁর বিশেষ চেষ্টা ছিল। নীলমণিবাবু ১৯৮০ সালে পরলোক গমন করেছেন। তিনি আজ আমাদের চোখের সামনে নাই কিন্তু তিনি আছেন দেশবাসীর হৃদয়ে। সেখানে তাঁর আসন চিরস্থায়ী।

কবি পূর্ণচন্দ্র দাস

বর্তমান শতাব্দীর প্রথমের দিকে মহিষাদল থেকে প্রায় তিনমাইল দক্ষিণে কাপাসএড়্যা গ্রামে বাবু পূর্ণচন্দ্র দাস একজন কবি ছিলেন। তখনকার দিনে দেশে শিক্ষার প্রসার খুবই কম ছিল, লোকসংখ্যা তেমন বেশী ছিল না। তার মধ্যেই পূর্ণবাবু সরস্বতীর প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। তিনি দুখানি কবিতার বই রচনা করেন—গাথা ও উচ্ছ্বাস। আরও একখানি বই এর খসড়া তিনি আমাদের দেখিয়েছিলেন, কিন্তু প্রকাশ করতে পারেন নাই, তার নাম ছিল বিকাশ। দরিদ্র কবি কতকটা ভাওয়ালের গোবিন্দ দাসের মতই ছিলেন। আপনভোলা লোক ছিলেন। তাঁর কবিতা মধুর এবং স্বদেশপ্রেমে, কবিত্বে ভরা ছিল। গাথা কবিতাখানির উৎসর্গপত্রে কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীযুত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর নাম ছিল, উচ্ছ্বাস বইখানি মহিষাদল রাজ শ্রীযুত সতীপ্রসাদ গর্গকে উৎসর্গ করেন। তাঁর উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার জন্য এ যাবৎ কিছু করা হয়নি। আমরা বিনম্র চিত্তে এই মহান সাধককে শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

কবি নিরালাজীর কথা

হিন্দী ভাষার সুপ্রসিদ্ধ কবি নিরালাজী মহিষাদলের একজন সুসন্তান ছিলেন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী। মহিষাদল রাজবাড়ীর দক্ষিণে যেখানে এখন ফুটবল মাঠ হয়েছে তার পূর্ব পার্শ্বে তাঁর বাড়ী ছিল। নিরালাজীর পিতা রাজবাড়ীতে সামান্য কর্ম করতেন। তখনকার দিনে উত্তরভারতের অনেক লোক এদেশে কাজকর্ম করতেন ও সেই উপলক্ষে এদেশে এসে তাঁরা এখানকার অধিবাসী হয়ে যেতেন। নিরালাজী বয়সে আমার থেকে কিছু বড় ছিলেন। ১৯১২ সাল নাগাদ তিনি মহিষাদল স্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে পড়তেন। ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কোন এক সাধারণ বিবাদে মহিষাদল রাজবাড়ীর কাজ ছেড়ে দিয়ে এখান থেকে ফিরে তাঁর গ্রামের বাড়ী উন্নাও-তে বসবাস করেন। পরে কলিকাতায় হিন্দী ছাপাখানায় কাজ করতেন শুনেছি। ক্রমে তিনি 'নিরালা' ছদ্মনামে কবিতা লিখতে থাকেন এবং হিন্দী সাহিত্যে প্রসিদ্ধ কবিরূপে পরিচিত হন। তাঁর রচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব আছে এমন কথা কেহ কেহ বলেন। তাঁর একপুত্র ও এক কন্যা ছিলেন। শেষ বয়সে তিনি প্রয়াগে বসবাস করেন। নিরালাজীর জীবন ছিল দারিদ্র্য ও নিঃসঙ্গতায় পূর্ণ। প্রায় দশ বছর পূর্বে যখন তাঁর মৃত্যু হয় তখন উত্তরপ্রদেশ সরকার তাঁর শেষকৃত্যের জন্য খরচ দেন। শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত নিরালাজী স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের শিষ্য ছিলেন। মহিষাদলের সুসন্তান নিরালাজীর জন্য আমরা গৌরব বোধ করি।

কাজীদাদার কথা

বাংলার বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম সকলের পরিচিত। তাঁকে আমরা দেখেছি—তাঁর মুখে তাঁর স্বরচিত গান শুনেছি—বিদ্রোহী কবিতার আবৃত্তিও শুনেছি। তিনি তমলুকে এসেছিলেন ১৯২৪ সালে। বাংলার গৌরব কাজী দাদা বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর গান ও কবিতা সেই যুগে বাঙ্গালী জাতিকে অপূর্ব উন্মাদনায় আন্দোলিত করেছিলেন। বিদেশী শাসক তাঁকে যখন হুগলী জেলে আবদ্ধ করেন—তিনি পায়ের বেড়ী বাজিয়ে গেয়েছিলেন—'শিকল পরা ছল এ মোদের শিকল পরা ছল—শিকল পরেই তোদের শিকল করব রে বিকল।' তিনি 'ধূমকেতু' নামে একটি ছোট পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন—আমরা দেখেই চমকে উঠেছিলাম। বাঙ্গালী জীবনে সে কী জোয়ার। 'অগ্নিবীণা' নামে কবিতার বই যখন পাই তখন একটা কথা মনে এসেছিল—আর ভয় নাই—এমন কবি যখন এসেছেন ভারত জাগবেই—বাঙ্গালী জোয়ান জাগবেই। তাঁর কথা বলে শেষ করা যাবে না। পরবর্তী জীবনে তিনি অপূর্ব সঙ্গীত ধারা দিয়ে গেছেন। তাঁর প্রতি ভারতীয় জাতি কৃতজ্ঞ থাকবেই। আমাদের বড় দুঃখ রয়ে গেল স্বাধীন ভারতে তাঁকে নিয়ে আমরা আনন্দ করতে পেলাম না। কঠিন কালরোগে বহুদিন তিনি মৌন হয়ে রইলেন। ঢাকাতে তাঁর শেষ আশ্রয় মিলেছিল। সেখানেই তাঁর মাজারে সেদিন বাংলাদেশের ভাইরা ফুল দিয়েছেন। আমরা দিতে পারলাম না, এজন্য আমাদের অপার দুঃখ। করুণাময় ঈশ্বর কাজী দাদার আত্মাকে শান্তিতে রাখুন।

সতীশচন্দ্রের স্মৃতি

তাম্রলিপ্তের সিংহহৃদয় পুরুষ সতীশচন্দ্র সামন্ত গত ৪ঠা জুন [১৯৮৩] পরলোকগমন করেন। সতীশবাবু আমার থেকে দু মাসের বড় ছিলেন। অজয়বাবু বয়সে কিছু ছোট ছিলেন। জাতীয় আন্দোলনে ১৯২২ সাল থেকে আমরা সঙ্গী ছিলাম।

সতীশচন্দ্রের জন্ম গত শতাব্দীর শেষে ১৯০০ সালের ডিসেম্বর মাসের ১৫ তারিখে মহিষাদলের নিকটে গোপালপুর গ্রামে। তাঁর বাল্যজীবন ও মহিষাদলে লেখাপড়া করার বিষয়ে প্রত্যক্ষ কোন অভিজ্ঞতা আমার নাই। কারণ আমি বাল্যে মহিষাদলে লেখাপড়া করার কোন সুযোগ পাই নাই। আমি তাঁর সঙ্গে যোগ দিই কাঁকুড়দা জাতীয় বিদ্যালয়ে—তার আগে আমি বাঁকুড়া জেলায় দুটি জাতীয় বিদ্যালয়ে কাজ করি। সতীশবাবুর সঙ্গে আমার সেই প্রথম পরিচয়। এখানে কিছুদিন অজয়বাবুও আমাদের সঙ্গে শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষকগণ অনেকে বাড়ী থেকে আসতেন—আমরা কয়েকজন গ্রামে বিভিন্ন বাড়ীতে থাকতাম। আমি বাংলা সাহিত্য পড়াতাম, সতীশবাবু ও ধীরেনদা ব্যাকরণ ও ইংরাজি শেখাতেন। সতীশবাবু ও আমাদের জীবনধারা

অন্যরকম ছিল। আমাদের তিনটি জিনিস ছিল না—জামা, জুতা ও ছাতা। ছোট ছোট কাপড়ের খণ্ড আমরা ব্যবহার করতাম। বিদ্যালয়ের কাজ ছাড়া আমরা কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনের কাজে গ্রামে গ্রামে প্রচার কাজে ব্যস্ত থাকতাম। যখন কাঁকুড়দার যোগেন্দ্রনাথ সিংহ, পূর্ণচন্দ্র মাইতি, শিক্ষক শ্রীপতিবাবু, ভবতোষ বাবু, গোরাচাঁদবাবু গ্রেপ্তার হয়ে জেলে গেলেন, তখন সতীশবাবুকে প্রেসিডেন্ট করে আমি ও দোরো আকুবপুরের প্রমথ মাইতি যুগ্ম সম্পাদক হয়ে দোরো মহিষাদল কংগ্রেস কমিটিকে কোনরূপে কার্যকর রাখলাম।

লবণ সত্যাগ্রহের দ্বিতীয় দিনে পেডী সাহেব যখন সতীশবাবুকে গ্রেপ্তার করেন তখন আমি নিকটে ছিলাম। সাহেব তাঁকে বলেন, সতীশবাবু, আপনি শুধু এই লবণ আইন অমান্য করবেন, না আরও আইন অমান্য করবেন? সতীশবাবু বলেন—যতগুলি পারি আইন অমান্য করব। সাহেব তাঁকে ধরে নিয়ে গেলেন।

তার পরে আরো কতকাল গেল—জাতীয় সরকারে তিনি সর্বাধিনায়ক হলেন। দেশ স্বাধীন হলে পরে তিনি গণপরিষদে গেলেন—ভারতের সংবিধান তৈয়ার হল—লোকসভার সদস্য হয়ে ছিলেন দীর্ঘকাল। হলদিয়ায় বন্দর স্থাপন করলেন। সতীশদা ছিলেন নীরব কর্মী। চীনা কোলিয়ারি'র দুর্ঘটনার পরে সতীশচন্দ্র সামন্ত কমিশনের সুপারিশেই কয়লা জাতীয়করণ হয়—একথা আজ আর কতজন মনে রেখেছে। ত্রিশ বছরেরও বেশী সংসদীয় রাজনীতিতে থেকেও তিনি কোনদিন প্রচারমুখী মানুষ ছিলেন না। আমাদের সেই সতীশবাবু একরকমই ছিলেন আপনার জন। একবার কয়েকদিনের জন্য তিনি দীঘায় ছিলেন। তখনও তিনি লোকসভার সদস্য আছেন। আমি ও আমার পুত্র আলোকনাথ তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য যাই। গিয়ে দেখি সমুদ্রতীরে একটি ছোট কুটীরে [যতদূর মনে পড়ে মাটির ঘর টালির ছাওয়া] তিনি একাই আছেন। জোয়ারের জল, উঠানে আসে। আমরা তাঁর অতিথি হয়ে দুদিন থাকি। সেই সরল অনাড়ম্বর জীবন।

যখন কঠিন রোগে জ্ঞান লুপ্তপ্রায় তখনও তিনি আমাদের চিনতে পারতেন। গত বৎসর একদিন তিনি আমার কাছে গীতাপাঠ শ্রবণ করলেন—দু একটী কথা উচ্চারণও করলেন। আমি বললাম, আরও বলুন আমি ধরিয়ে দিচ্ছি। তিনি বললেন, আর মনে আসছে না। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে একদিন দেখি তিনি শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। সেবক গোকুল বললেন—কে এসেছেন—চিনতে পারছেন? আমি মুখের কাছে কান নিয়ে গেলাম—বললেন, রমণীবাবু 'ড্রিংকিং ওয়াটার'—এই আমার শেষ কথা শ্রবণ। তাঁর 'কথা' দিয়েই তাঁর কথা শেষ করি।

মহিষাদলে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী

স্বামীজী মহিষাদলে কয়েক বছর [১৯১৭-১৯২০] ইংরেজ সরকারের রাজবন্দীরূপে অন্তরীণ ছিলেন। তাঁকে আমি দেখেছি, কিন্তু সাক্ষাৎ পরিচয় হয় নি। তাঁর সঙ্গে যাঁরা

পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য পেয়েছিলেন তাঁদের কাছে আমি অনেক বিবরণ পেয়েছি। তাঁর বিশেষ অনুগত মহিষাদল রাজ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত হরিপদ ঘোষাল ও তৎকালীন ছাত্র শ্রীসতীশচন্দ্র সামন্ত ও শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভূঁএঃ্যার নিকট অনেক কথা শুনেছি।

স্বামীজী বরিশালের মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের ব্রজমোহন স্কুলে শিক্ষক ছিলেন। ১৯২৬ সালে আমি বরিশালে যাই। সেখানে প্রধান শিক্ষক ভক্তিযোগ সঙ্কলক ঋষি জগদীশচন্দ্রকে দর্শন করি। সে সময় স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী প্রতিষ্ঠিত শঙ্কর মঠে অবস্থান করি ও মঠাধ্যক্ষ আত্মানন্দজীর সঙ্গে পরিচয় হয়। তখন স্বামীজীর নাম ছিল সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তাঁর উপরে ব্রিটিশ সরকারের সন্দেহ ছিল বিপ্লবী বলে। তাঁকে প্রথমে বরিশালের ওদিকেই অন্তরীণ করা হয়। কিন্তু সরকারের তাঁকে নিজের জেলায় রাখতে ভরসা হল না। মহিষাদলবাসীর বোধহয় বহু পুণ্য ছিল তাই বিধাতার বিধানে তাঁকে এখানে এনে রাখা হয়।

তিনি মহিষাদল বাজারের মধ্যস্থলে মালাকার বস্ত্রালয়ের উপরে একটা ঘরে থাকতেন। একাহারী সন্ন্যাসী ছিলেন। সম্বলের মধ্যে একটা মাদুর ও অতি অল্প পোষাক ও সরঞ্জাম ছিল। যখন রাস্তায় বেরোতেন হাতে ত্রিদণ্ড থাকত। হরিপদবাবু বলেন—তিনি একদিন ক্যানেলের পূর্বপাড়ে যেখানে এখন কলেজ হয়েছে তার নিকটে এই অপূর্ব সন্ন্যাসীকে দেখেন—আলাপ হয়। তখন স্বামীজী থানায় দৈনিক হাজিরা দিয়ে ফিরে আসতেন। ক্রমে হরিপদবাবু এই মহাজ্ঞানী সন্ন্যাসীর একান্ত অনুগত হন এবং তাঁর কাছে বেদান্ত অধ্যয়ন করেন। ছাত্রগণের মধ্যে অনেকে স্বামীজীর অন্তরঙ্গ ভক্ত হয়েছিলেন। স্বামীজীর স্বদেশ উদ্ধার মন্ত্রে তাঁরা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তবে প্রকাশ্যে তাঁর কর্মপদ্ধতি কেউ বুঝতে পারতেন না। থানার অফিসারগণও তাঁর প্রতি খুব সদয় ব্যবহার করতেন। যতীনবাবুর কাছে শুনেছি কখনও কোনো উপরওয়ালা এদিকে এলে আগেই থানা থেকে তিনি খবর পেতেন ও ছেলেরা তাঁর বাসায় গেলে সাবধান করে দিতেন। ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জী—প্রখ্যাত বিপ্লবী মহিষাদলে সংবর্ধনা সভায় স্বামীজীর নিকট গোপনে যাওয়া আসার কথা বলেছিলেন। হরিপদবাবুও অন্যান্য ভক্তের অনুরোধে স্বামীজী বই লিখতে প্রবৃত্ত হন। তাঁরা তাঁকে গোপনে বোম্বাই, পুনা প্রভৃতি স্থান থেকে দুর্লভ পুস্তকাদি এনে দেন। তাঁর অমর কীর্তি বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস, রাজনীতি, সবলতা প্রভৃতি এখানেই রচিত হয়। তাঁর প্রিয় শিষ্য অরুণ গুহ, মনোরঞ্জন গুপ্ত, নিশিকান্ত গাঙ্গুলী প্রমুখ সরস্বতী লাইব্রেরী স্থাপন করেন। এই সরস্বতী শব্দটি তাঁরা স্বামীজীর নামের শেষ অংশ থেকেই নিয়েছিলেন। অরুণদা ও নিশিদার কাছ থেকে আমরা কত বই খরিদ করেছি। অরুণদা দীর্ঘকাল ভারতের পার্লামেন্টের মেম্বার ছিলেন। অর্থনীতি বিষয়ে মূল্যবান গ্রন্থ লিখেছেন। সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, স্বামীজীর এক শিষ্য লোকসভা সদস্য ছিলেন—আমাদের সতীশচন্দ্র সামন্তও লোকসভায় ছিলেন। একটি কথা আমরা বলে থাকি—স্বামীজীর শিষ্যেরা ভারত শাসন করে থাকেন। এঁরা সবাই সাদা কাপড়ে

সন্ন্যাসী। যখন জওহরলালজী অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন কংগ্রেস দলের পরিচালন সুরেনবাবুর উপরে পড়ে। বটবৃক্ষের বীজ খুব ছোট কিন্তু তার মধ্যে সার আছে, তাই তার থেকে বিরাট মহীরুহ সৃষ্টি হয়। এখানে আমরা যে সতীশবাবুর মত ত্যাগী মহাবীর পেয়েছি তার মূলে ছিলেন স্বামীজী। আমাদের গুণধরবাবুও ঐ সময়ে মহিষাদলের ছাত্র ছিলেন। আমাদের দৃঢ় ধারণা স্বামীজীর প্রভাব থেকেই মহিষাদলে স্বাধীনতা আন্দোলনের বীজ রোপিত ও বর্ধিত হয়। সতীশচন্দ্র সামন্ত শূন্য হইতে সৃষ্টি হন নাই। এক মহা সাধকের সাধনার ফল ছিলেন তিনি। স্বামীজী অন্তরীণ মুক্ত হওয়ার পরেও একবার মহিষাদলে এসে কিছুদিন ছিলেন। তিনি কলেজের উত্তর পাশে হেডমাষ্টার মহাশয়ের বাসায় ছিলেন। কিন্তু শরীর খারাপ হওয়ায় চলে যান। অল্পদিন পরেই তিনি কলিকাতায় দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৩৬ বৎসর। বাংলা মায়ের এই বীর সন্তানের উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের প্রণতি জানাই।

মহিষাদলে চারণকবি মুকুন্দ দাস

যাঁদের বয়স এখন প্রায় ৫০ বৎসর [অর্থাৎ ১৯২৫ এর পরে] তাঁরাও স্মরণ করতে পারবেন না যে বাংলার চারণকবি বরিশালের মুকুন্দ দাস মহিষাদলে এসেছিলেন ও তাঁর অপূর্ব জাগরণ গানে এই অঞ্চলকে চঞ্চল করেছিলেন।

বরিশালের চারণকবি মুকুন্দ দাস তাঁর স্বদেশী যাত্রাদল নিয়ে মহিষাদলে এসেছিলেন ১৯২৫ সালে। লেখক তখন এখানের একজন ক্ষুদে সাংবাদিকরূপে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পান। ফলে তাঁর দলের অপূর্ব গান শুনে যেমন আনন্দ লাভ করেন, তেমনি দুই চারিটি মধুর কথা স্মৃতির মণিকোঠায় স্থান লাভ করে। এমন মহাপুরুষের সঙ্গলাভ করা সৌভাগ্যের বিষয়—তারই কিছু এখানে বলছি।

মুকুন্দবাবুর গান এখানে মহিষাদল, মধ্যহিংলী, লক্ষ্যা, দনীপুর প্রভৃতি স্থানে হয়েছিল। তিনি হলদী নদীর ওপারে ও কয়েক স্থানে গান করেছিলেন। তাঁর দলটি ছোটই ছিল। গাইয়ে বাজিয়ে এবং অভিনেতা মিলে পনের কুড়িজনের বেশী ছিল না। সাজসরঞ্জাম খুবই কম ছিল।

তাঁর তৈরী পালাগুলির মধ্যে 'কর্মক্ষেত্র', 'ব্রহ্মচারিণী' ও আর একটি [নাম মনে হচ্ছে না] খুব জনপ্রিয় ছিল। লক্ষ্যাতে তিনি 'পল্লীসেবা' বলে একটি নূতন পালা প্রথম অভিনয় করেন—তাতে মহাত্মাজীর আদর্শে পল্লীপুনর্গঠনের প্রেরণা ছিল। গান যখন চলছে মাঝে মাঝে বাইরে এসে লক্ষ্য করছেন গান কেমন হচ্ছে। আমি বলি—আপনার এ লেখাটা তো অন্য পালাগুলির মত সহজ নয়। এর ভাষা এত শক্ত করেছেন কেন? তিনি বললেন—ঠিক বলেছেন—এর মধ্যে একটু কঠিন কথা আছে।

'হিতবাদী' কাগজ একবার লিখেছে—মুকুন্দ দাস যাত্রাওয়ালা—বাংলা ভাষার বোঝে কি? তাই একটু অন্যরূপ করে লিখেছি। আমি বললাম—আপনি 'হিতবাদী'র উপর রাগ করে বাঙ্গালী শ্রোতাদের অসুবিধা করবেন, এটা কি ঠিক হবে? তিনি বললেন—সেটা অবশ্য বিবেচনা করছি। এই ত আরম্ভ পরে পরে আরও সংশোধন করব।

তাঁর 'কর্মক্ষেত্র' পালাটি তিনি প্রায় প্রত্যেক স্থানেই প্রথম দিন গাইতেন। প্রথম দৃশ্যের প্রথমে তিনি আসতেন না—দু একখানি গান, যেমন—'মা, মা বলে ডাক দেখি ভাই' বা ঐরূপ গান আরম্ভ করে ছেলেরা আসত। অশ্বিনী নামে ছেলেটির গলা অতি উচ্চগ্রামে উঠত আর আসর যেন ভরে যেত। খানিক পরে দু একটি কথার মুখেই প্রবেশপথ থেকে আবির্ভূত হতেন সেই বিরাট পুরুষ—গায়ে গেরুয়া আলাখাল্লা পাগল বা সাধুর বেশে, বুকে সোনা-রূপার মেডেলের মালা। আসরে এসেই দু একটি কথার পর গান ধরে দিতেন—'মায়ের নাম নিয়ে ভাসান তরি যেদিন ডুবে যাবে', অথবা 'করমেরি যুগ এসেছে'। গান দু চার লাইন গাইবার পর হঠাৎ থেমে গিয়ে কথা বলতে আরম্ভ করতেন। সমস্ত আসর মেয়ে পুরুষ একমনে তাঁর কথা শুনতেন। প্রায় প্রত্যেক আসরেই মেয়েদের বিশেষ করে বলতেন—মায়েরা শোনো—ছেলে মুকুন্দ দেশে দেশে ঘুরে কি বলছে—তোমাদের আজ জাগাতে হবে—তোমরাই তো জাগাবে—ছোট ছেলেটিকে যখন দুধ দিবে তখন থেকেই তার কানে মন্ত্র দাও, বাবা দেশের আজ বড় দুর্দিন, তোমাদের এই আঁধারের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। আবার গান ধরতেন 'মরণ-সাগর পার হতে হবে/সবাকার দিন গেল, বেলা অবসান/তরি বুঝি ছেড়ে যায়, উঠে পড় খেয়া নায়/ভয় নাই মাঝি ভগবান।' শ্রোতাদের হৃদয় উদ্বেলিত হোত, চোখে জল আসত।

আবার যখন 'ছেড়ে দাও রেশমী চুড়ি' গান ধরতেন—কত জায়গায় মেয়েরা চুড়ি ভেঙ্গে ফেলতেন দেখেছি। তাঁর খুব বিখ্যাত গান ছিল—'সকল কাজের মিলবে সময়,/আগে কিছু ভাতের যোগাড় কররে তোরা,/ভাতের যোগাড় কর/মানের গোড়ায় ছাই ঢেলে আজ কষে লাঙ্গল ধর।'

তাঁর পালার মধ্যে শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী, কামিনী ভট্টাচার্য প্রভৃতির গানও থাকত। 'সাবধান, সাবধান, আসিছে নামিয়া ন্যায়ের দণ্ড রুদ্রদীপ্ত মূর্তিমান' গান ধরে তিনি যখন আসরে আসতেন তখনকার মুকুন্দদাসের মূর্তি ভোলবার নয়। আর একটি গান ছিল—মহাকালীর নৃত্য, বিশ্বপ্রসবিনী ত্রিলোকপালিনী প্রলয়কারিণী ত্রিগুণময়ী শ্যামা।...মুকুন্দবাবু, অশ্বিনী ও অন্যান্যের। সমবেত কণ্ঠে গানটি এমন গাইতেন যে আসর স্তব্ধ হয়ে যেত। আমাদের কানে সে গান যেন এখনও বাজছে।

মহিষাদল বাজারে ও রাজবাড়ীতে দুর্গামণ্ডপের পাশে উঠানে সামিয়ানার নীচে তাঁর গান হয়েছিল। তাঁর নিয়ম ছিল রাত্রি আটটা নাগাদ গান আরম্ভ বারটায় শেষ। আসর পিছু সাধারণত একশ' টাকার কম নিতেন না। দলের খোরাক বন্দোবস্ত নিজের হাতই থাকত। তবে কোথাও শ্রদ্ধা করে খাওয়ালে তিনি না বলতেন না। সে

বছর বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন হয় হুগলী জেলার রাধানগরে—ঐ গ্রামে রামমোহন রায়ের জন্মস্থান। স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সভাপতি ছিলেন। ঐ সম্মিলন থেকে ফেরার পথে দনীপুরে স্টীমার থেকে নেমে মুকুন্দবাবুর সাক্ষাৎ পাই, ওখানে সেদিন গান হয়। ওখানে লক্ষ্য করেছি দলের ছেলেদের দিকে তাঁর বিশেষ লক্ষ্য—যেন তারা কোনরূপ বিলাসিতা বা বেচাল না করে। বলতেন, কতদূর থেকে কোথায় এনেছি ছেলেদের, তাদের স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখতে হবে, তাই রাত বারোটার পর গান করি না।

তাঁর দলের লোকদের দক্ষতা ছিল অদ্ভুত রকমের। যাকে যেটি সাজিয়েছেন সে এমন অভিনয় করত যে শাদা কাপড়ের স্বদেশী যাত্রা দেশকে মাতিয়ে দিয়েছিল।

তিনি এদেশ থেকে চলে যাবার পর—রেয়াপাড়ায় নবদ্বীপ ও ব্যবত্তার হাটে ধীরেন বেরা স্বদেশী যাত্রার দল করে বেশ সুনাম অর্জন করেছিল। বাংলার আরও বহুস্থানে তাঁর অনুকরণে ভাল ভাল স্বদেশী যাত্রা দল হয়েছিল। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর গান ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।...

তিনি সৈনিক ছিলেন। সৈনিকের মতই কর্মক্ষেত্রে গান করতে এসে দেহত্যাগ করেন ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে। মুগ্ধ বিস্ময়ে আমরা সেই বিরাট পুরুষকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

তমলুকের সে একদিন

বাঙালীর বল নামক প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থের লেখক রাজেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য এক সময়ে তমলুকে মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। সে সময়ে এখানে যুবকবৃন্দ এক সম্মেলন করেন। তার উদ্বোধন সংগীত তিনি লিখে দেন। ঐ লেখার মধ্যে 'বেলাকূল' নামে কথাটি ছিল। আমরা সেই সংগীত শুনেছি। বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রও এখানে বিচারকের কাজ করতেন। তাঁর 'যুগলাঙ্গুরীয়' নামক ছোট উপন্যাসখানির পটভূমিও এই তমলুক শহর।

তমলুকের একটি গৌরবময় দিনের কথা বর্ণনা করছি। তখন বৃটিশ রাজত্বের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন চলছিল। তারমধ্যে হ্যামিলটন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রুতিনাথবাবু ও তাঁর বন্ধুবর্গ ১৯২৪ সালে একটি স্বদেশী মেলা করেছিলেন। তার বিবরণ সংগ্রহের জন্য আমাকে উপস্থিত থাকতে হয়েছিল। তমলুক মহকুমার একমাত্র সংবাদ সাপ্তাহিক 'পথিক'-এর সংবাদদাতারূপে মেলায় যেতে হয়। মেলা উপলক্ষে আমন্ত্রিত হয়ে যাঁরা এসেছিলেন তার মধ্যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও তাঁর কয়েকজন সঙ্গী ছিলেন। স্কুলের সামনে প্রাচীরের মধ্যেই মেলার স্টল সব ছিল—সভামণ্ডপও ছিল। এখন যেখানে গাছের ফসিল ও খোদিত স্তম্ভদুটি বসানো আছে তার পাশেই বিকালে সভা হয়।

আচার্য রায় তাঁর প্রিয় ছাত্র পুলিনবিহারী সরকারের বাড়ীতে অবস্থান করেছিলেন। বিকালে সভায় বহুলোক সমাগম হয়। স্বদেশী মেলার বিষয়ে কিছু বক্তৃতাও হয়। সভায় গান গেয়ে সকলকে আনন্দ দেন কাজীদাদা ও তাঁর সঙ্গী নলিনীকান্ত সরকার প্রভৃতি বন্ধুবর্গ। কাজীদাদা প্রথমেই যে গানটি করেছিলেন তা হলো—বল ভাই মাভৈ মাভৈ, নবযুগ ঐ এল ঐ এল—অগ্নিবীণার গান। এ ছাড়া গেয়েছিলেন শিকল ভাঙ্গার ছল ও আরও গান। নলিনীবাবু স্বদেশী গান ছাড়াও হাস্যরসের আরও গান শোনান। আমরা পরে শুনেছি ইনি সুপ্রসিদ্ধ দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের চেলা ছিলেন—'বিজলী'র সম্পাদক ছিলেন। তখনকার দিনে মাইক ছিল না কিন্তু তাঁদের গলার গান সভাকে মুগ্ধ করেছিল—বলা যায় মাতিয়েছিল। সকলের বিশেষ অনুরোধে কাজীদাদা তাঁর বিখ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতা আবৃত্তি করেন। তার আগে তিনি বলেন আমার কবিতার বিষয়ে অনেকে অনেক কথা বলেছেন। আমি বলতে চাই—উপনিষদের সঙ্গে আমার লেখার যোগ আছে। তিনি যখন সমগ্র কবিতাটি উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করে শেষ করলেন তখন শ্রোতৃবৃন্দ মন্ত্রমুগ্ধের মত হয়ে গেছলেন।

শেষ লাইনগুলি আমাদের কানে এখনও যেন বাজছে—'যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না, যবে অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না........বিদ্রোহী রণক্লান্ত, আমি সেই দিন হব শান্ত......'

সেদিন সকালের একটু কথা বলছি। পুলিনবাবুর বাড়ীতে আচার্য রায় বসে কথাবার্তা বলছেন—চরকা খদ্দর প্রভৃতি প্রসঙ্গে—আমিও হাজির আছি। নলিনী সরকার মহাশয় ওখান দিয়ে ঘরের ভিতরের দিকে যাচ্ছেন। আচার্যদেব তাঁকে দেখিয়ে বলছেন—এরা চরকায় বিশ্বাস করেনা। নলিনীবাবু ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন—আমরা চরকায় সূতা হয় বিশ্বাস করি—স্বরাজ হয় বিশ্বাস করি না।

তমলুকের সে এক সৌভাগ্যের দিন।

বৃদ্ধার পুকুর

ঘটনাটি সত্য তবে অনেকদিনের। তাই নাম ঠিকানা সংগ্রহ করতে পারছিনা। লোকের মুখে প্রবাদের মত এই কাহিনী শোনা যায়।

মহিষাদল থানার পশ্চিম অংশে কংসাবতীর দিকে এক গ্রামে জনৈকা বৃদ্ধা জগন্নাথদেবের দর্শনের জন্য যাত্রা করেছিলেন। সেকালে পায়ে হেঁটে যেতে হত। কিছু দূর যাওয়ার পর এক মাঠের মধ্যে তিনি এসে পড়লেন। তখন চারিদিক থেকে অনেকগুলি গোরু এসে তাঁকে ঘিরে দাঁড়াল। তাদের এরূপ করার কারণ বৃদ্ধা নিজের বুদ্ধিতে বিচার করলেন—তারা তৃষ্ণার জল চায়। তিনি সেই গোরুদের বললেন—বাছারা, আমি ঠাকুর দর্শন করে যেন ফিরে আসি, তোমরা আশীর্বাদ কর। তখন

তোমাদের জলের জন্য একটা ব্যবস্থা নিশ্চয় করব। এই বলে বিদায় নিয়ে তিনি শ্রীক্ষেত্র যাত্রা করলেন এবং কয় মাস বাদে ফিরে এলেন। তখন রেল হয়নি—পথে আধি ব্যাধি কত রকম বাধা ছিল কিন্তু ঠাকুরের কৃপায় তিনি সব পার হয়ে এলেন। তিনি মাঠে সেখানে এসে বসলেন এবং সঙ্গী লোকদের মুখে বাড়ীতে ছেলেদের কাছে খবর পাঠালেন। তাঁর ছেলেরা এলে বললেন—এখানে একটা পুকুর করে দিতে হবে—তা না হলে আমি বাড়ি যাব না। ছেলেদের অবস্থা খুব মন্দ ছিল না। তাঁরা কিছু আপত্তি করলেও বৃদ্ধার প্রতিজ্ঞার কাছে হার মানলেন। গো জাতির মুখে ভাষা ছিল না কিন্তু চোখে আবেদন ছিল। বৃদ্ধা মায়ের প্রাণ দিয়ে তা বুঝেছিলেন।

শোনা যায়, সেই পুকুরটি এখনও আছে। মেদিনীপুরের মাটি বড় উর্বর। এখানে ঐরকম অগণ্য প্রাণের উৎপত্তি হয়েছে। শত শত বৎসরের ইতিহাস লক্ষ্য করুন—মেদিনীপুরের ছেলেমেয়েদের কীর্তিকলাপ দেখতে পাবেন। তমলুকের মাতা মাতঙ্গিনীর কথা, তেরপেখিয়া বাজারের বৃদ্ধার কথা আমরা কীর্তন করেছি। যাঁরা দেশ জননীর জন্য শত লাঞ্ছনা, চরম অপমান সহ্য করেছেন সেই মেদিনীপুরের মায়েদের কথা সর্বদা স্মরণ করি। তাই এই সামান্য জনশ্রুতি প্রকাশ করলাম।

'গুণধর'-এর কথা

'একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করিবার ইচ্ছা হয় ১৯৮০ সালের ঐদিকে। অনেক ঘোরাঘুরি করিয়া নাম রেজিস্ট্রারের ঠিকানা পাইলাম। নানারকম নাম মনে আসিতেছে—কোনোটাই মনে ধরে না—সহসা শহীদস্তম্ভে [মহিষাদল] চোখ পড়িল—প্রথমেই গুণধর হাজরা বাবুর নাম আছে। তখন মনে করিলাম এই নামই লইব। বারীন্দ্র হাজরা, গুণধরবাবুর পুত্র, তাহাকে প্রকাশক হইতে বলিলাম। সে রাজী হইল—তমলুকে গিয়া তাহার দ্বারা দরখাস্ত করাইলাম। পরে দিল্লীর রেজিষ্টার নম্বরের দরখাস্ত করি। কিন্তু অর্ডার আর কিছুতে আসে না। শেষে প্রায় দুই বৎসর পরে ইন্দিরা গান্ধী নিহত হওয়ার কয়েকদিন পরে ঐ শোকাবহ ঘটনা লইয়াই গুণধর প্রকাশ করিলাম—বারীন্দ্রকুমার হাজরা প্রকাশক, আমি সম্পাদক। মহিষাদলে বনান্তী প্রেসে ছাপা হইতে লাগিল।

'প্রথমেই কথা উঠিল—পাঠক মহলে 'গুণধর' নাম কেন? ইহার অর্থ কি—গুণধর কে? তখন গুণধরবাবুর জীবনী দিলাম। মেদিনীপুর জেলে তাঁহার মৃত্যুর কথা লিখিলাম। নামটিও অর্থবহ তবে শুনিতে নূতন লাগে।

'যথাসাধ্য দৌড়াদৌড়ি করি—আর্থিক অবস্থা সুবিধা হয় নাই। কত গ্রাহক পয়সা দিল না—যাহাদের কথায় কাগজ পাঠাইলাম, তাহারাও কোনো সাহায্য করিল না। অনেকেই মনে করিল বিনা পয়সায় কাগজ চলিতে পারে!

'শেষে প্রকাশক বারীন্দ্রের নাম দিয়া এক লেখা প্রকাশ করিয়া বন্ধ করিলাম। .... উদ্দেশ্য একরূপ সফল হইয়াছে মনে করি—পাঠক লক্ষ্য করিল বুঝিবেন।'*

---

* রমণীমোহন স্বয়ং উল্লিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। 'গুণধর'-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় চৌঠা ডিসেম্বর ১৯৮৪ এবং শেষ সংখ্যাটি [মোট ৩৯টি সংখ্যা] প্রকাশিত হয় ২৬শে নভেম্বর ১৯৮৫ সালে। প্রায় বিজ্ঞাপনবিহীন চার পাতার গুণধর এর মূল্য ছিল মাত্র পঁচিশ পয়সা।

প্রথম সংখ্যাতেই রমণীমোহন 'কেন এই উদ্যম' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানান—'প্রয়োজনে আয়োজন করতে হয়। তাই এই সামান্য উদ্যম। যাঁদের কথা ভুলে গেলে চলে না তাঁদের পুণ্য নাম নিয়ে তাই এই উদ্যম। গৃহস্থ যখন নিদ্রামগ্ন তাঁর পোষা রক্ষী তখন জেগে থাকে। সে ঘুমের ব্যাঘাত করতে পারে কিন্তু বিপদের আভাস দিতে পারে—গৃহস্থ সতর্ক হতে পারেন।

'মহিষাদলের ইতিহাস আছে, গৌরব আছে তার কাহিনী ভুলে গেলে চলে না। এখনকার রেডিও টেলিভিসনের যুগে, জেট প্লেন বোমারু ক্ষেপনাস্ত্রের মুখে সমাজ সেবার সাধন এই ক্ষুদ্র পত্রিকা কি কিছু করতে পারবে? বিরাট বিশাল জাহাজ নদীবক্ষ তোলপাড় করে চলে যাচ্ছে তার কাছে এই ছোট ডিঙ্গী নৌকা কি পাড়ি জমাতে পারবে? আশা করি সেও তার সাধ্যমত কাজ করবে। কাঠবিড়ালীও সমুদ্র বন্ধনে লেগেছিল।

'বর্তমান কুটীল রাজনীতির ধূম্রজালে জনগণকে বিভ্রান্তির চেষ্টা চলছে—তার মধ্যে আলোকপাতের চেষ্টা আমরা করে যাব।

'আমাদের অনেক কথা জানবার আছে—জানাবার আছে। তাই সরল ভাষায় বিনা আড়ম্বরে আমরা নিবেদন করে যাব। আশা করি দেশবাসী কালের প্রয়োজন বুঝে সেগুলি যথাযোগ্য বিচার করে গ্রহণ করবেন।'

অন্যত্র রমণীমোহন লিখেছেন—'কেন জানিনা ঠাকুর আমাকে মঠে ভিড়তে দিলেন না [রমণীমোহন বেলুড়মঠে ছিলেন ১৯২৭-৩১ পর্যন্ত।] বোধহয় ইচ্ছা—আমি দশ ও এই দেশের সেবা করি। .....সাধু সাজবার আশা বাদ দিয়ে ঠাকুরের ইচ্ছায় ১৯৩১ সালের শেষের দিকে দেশে এসে স্কুল স্থাপনে উদ্যোগী হই। সুহৃদ মহারাজ আমাকে লেখেন—যেখানে নিঃস্বার্থ হয়ে কাজ করবে সেটাই ঠাকুরের field....।

বিদ্যা বিস্তার, পঞ্চায়েত পরিচালনা, সমবায় সংগঠন, সমাজ শিক্ষা প্রসার, সংবাদপত্র প্রকাশ—জীবনব্যাপী রমণীমোহন যা কিছু করেছেন—সবই ঠাকুরের কাজ ভেবেই করেছেন—সকলই দশ ও দেশের জন্যই করেছেন। স্বামীজী প্রবর্তিত সেবাধর্ম সত্যভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কিনা তার দৈব প্রমাণ পাওয়ার অভিপ্রায়ে একদা রমণীমোহন বেলুড়মঠে শ্রীশ্রীমা ও শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীমৎ স্বামীজীর মন্দিরে প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন। তাঁর সেই মনস্কামনা সিদ্ধ হয়েছিল—সর্বসংশয় দূর হয়েছিল।

পঁচাশি বছর বয়সে একক উদ্যোগে গুণধর সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশের প্রয়াস-ও স্বামীজীর সেবাধর্ম-অনুসরণে রমণীমোহনের আন্তরিক ইচ্ছারই অভিব্যক্তি।

কথার মত কথা

গণতান্ত্রিক পথে উন্নয়ন

আমাদের সব থেকে বেশী ভয় আত্মম্ভরিতাকে। আমরাই সবার সেরা এমন ভ্রান্ত ধারণা। আর এক মহাভ্রম সরকার সব করবে, মেম্বার সব করবে। আমরা কিছু ভাবব না দেখব না—বর্তমান সমাজে এটা অচল। কেননা এর নাম গণতন্ত্র নয়, সমাজতন্ত্রও নয়।

সব গ্রামে পানীয় জল ঠিক মিলছে তো? রাস্তা সুগম হয়েছে তো? বর্ষা জল নিকাশ ব্যবস্থা ঠিক আছে তো? ঝোপ, জঙ্গল, মশা মাছির উৎপাৎ নাই তো? প্রতি পরিবারে স্যানিটারী ল্যাট্রিন কি এখনও হয়নি? পঞ্চায়েত যদি পিছিয়ে থাকে গ্রামবাসীগণ নিজেরাই এগিয়ে আসেন তো?

আর সব থেকে আগে দেখতে হবে দেশের নৈতিক অবস্থা কেমন।

[দেশের উন্নয়ন—কিছু ভাবনা]

উন্নয়নের নিশানা

....একথা ভুললে চলবে না যারা নীরবে সেবা করছে—গ্রামে শহরে বন্দরে। তাদের উপযুক্ত সম্মান দিতে হবে। তাদের অভাব অভিযোগ শুনতে হবে—প্রান্তিকদের অন্তরে স্থান দিতে হবে। তবেই জাতির প্রকৃত উন্নতি হবে। গড়ের মাঠের ধারে আঠারো তলা বাড়ী উন্নতির মনুমেন্ট নয়। আমরা যখন আমাদের নিম্নবর্গের লোকদের, আমাদের মায়েদের সম্মান রক্ষার জন্যে মন দিব, তখনই জাতির উন্নতি হচ্ছে বলা যাবে।

[আমরা কোথায় চলেছি]

চাই মাদক বর্জন

.....সাধারণভাবে গ্রামে গঞ্জে দেখছি নেশার দ্রব্য মানুষের বুদ্ধি বিপর্যয় করছে। সুতরাং সিদ্ধান্ত করতে পারি নেশা কম হলে অপরাধ ও কম হবে।.....এর ফলে দুদিক

থেকে মঙ্গল আসে—আর্থিক ও নৈতিক। আমাদের সুদীর্ঘ ৯০ বৎসরের অভিজ্ঞতা থেকে আবেদন করছি—দেশকে রক্ষার জন্যে, আসুন সকলে নেশার বিরুদ্ধে একজোট হয়ে সংগ্রাম করি। দেশের শিশুদের মুখ চেয়ে শপথ গ্রহণ করি—আমাদের গ্রামে একটিও নেশাখোর থাকবে না।

[নেশাই যত গোলের গোড়া]

সবার উপরে নীতি

....অন্নাভাব ঘটলে সব ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে যাবে একথা সত্য কিন্তু জাতি বেঁচে থাকে নীতির উপরে, অন্নের উপরে নয়।

[পল্লীর পুনর্গঠন]

ভাল পথে ভাল কাজ

....মহাত্মাজী সমাজতন্ত্র কথাটার মর্ম যত গভীরভাবে বুঝেছিলেন আমরা ততটা বুঝতে পারি নাই! ভাল পথে ভাল কাজ কর—একথা উন্মাদের প্রলাপ নয়, মানবজাতির ধ্বংস থেকে রক্ষা করবার মহামন্ত্র। ....আমাদের আবেদন—পথিক, তুমি পথ হারিয়েছ, সরল পথে গাড়ী চালাও। কেবল মানুষ মারলেই মানুষের মঙ্গল করা যাবে না।

[তৃতীয় রিপুর মহিমা]

কার্য উদ্ধারই আসল কথা নয়

....লোকের ভ্রম উৎপন্ন হয়েছে, যে কার্য উদ্ধার করাই আসল কাজ—কার্য ধ্বংসেন মূর্খতা। বাদ্যযন্ত্রে দুইরকমই বাজান যায়।

[নীতির বিচার]

সামাজিক ব্যাধি নীতিবোধহীনতা

....এখনকার সমাজে সততা নামক কথাটি পুস্তকেই থাকবে, এমন যদি হয়, তাহলে সন্দেহ হয়—কবির গান—প্রলয় বুঝি ঘনিয়ে আসে বোধহয়—সত্য হয়ে উঠবে।

....আমাদের বাইরের ঠাট মন্দ নয়। রেলগাড়ী ছুটছে, বিমান উড়ছে, জাহাজ ভাসছে সবই সত্য। তারে বেতারে পৃথিবীর অপর পার থেকে খবর আসছে—কত কঠিন ব্যাধি বিদায় নিয়েছে। অথচ আমাদের সমাজদেহের বিষম ব্যাধি নীতিবোধহীনতার জন্য সবই কি বিফল হবে। শরীরের মধ্যে হৃদয়টিই বড়, সে যদি থেমে যায় বা দুর্বল হয়ে পড়ে তাহলে বিনাশ আসন্ন। এই পচনশীল ক্যান্সার থেকে আমরা বাঁচব কি?

[যা শুনেছি পথে ঘাটে]

অভাব—বিনয় ও নম্রতার

....দেশে মিষ্টান্ন প্রিয় লোকের সংখ্যা কম নয়। কিন্তু তাঁরা যে সন্দেশে চিনি কম ছানা বা ক্ষীর বেশী তাই পছন্দ করেন।....বিনয় ও নম্রতা না থাকলে অতিবুদ্ধিমান লোকেও সফল হতে পারে না। [বড় ভাবনার কথা]

নীতিশিক্ষার বেড়া

....শিশু শিক্ষার সময় থেকেই কেবল শিক্ষক নহেন—অভিভাবকগণও নীতিশিক্ষা বিষয়ে লক্ষ্য রাখবেন। আমাদের ছোটবেলায় চাণক্য শ্লোক পাঠ্য ছিল—এখন তা দেখা যায় না। একথা বলতে আমরা খুবই লজ্জা বোধ করি যে চোর ডাকাত বদমাস বা গুন্ডা গাছ থেকে পড়ে না। আমাদের কোনো না কোনো গৃহস্থের বাড়ী থেকে তাদের পাওয়া যায়। সুতরাং বেড়া কোথায় দিতে হবে তা আমাদের অজানা নয়।

[কাগজের জবর খবর]

শ্রেষ্ঠ নীতি রাজনীতি

....দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল নন্দীগ্রামে সভায় যে বক্তৃতা করেন তা শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন—রাজনীতি মানে রাজার নীতি নয়—শ্রেষ্ঠনীতি। এটি ঠিক না থাকলে আপনার সামনে থেকে ভাতের থালা ও সরে যেতে পারে।

[কাগজের জবর খবর]

জাতির স্থায়িত্ব

....একটি উচ্চ নীতি জ্ঞানসম্পন্ন জাতিই টিকে থাকতে পারে।

[আমাদের সংসার যাত্রা]

দেশ এখনও বীর শূন্য হয়নি

....এক বাস লাইনের জংশন। গাড়ী এসে থামতেই দুই দরজা দিয়ে যাত্রীগণ নামছেন—এদিক সেদিকে গাড়ী ধরতে হবে। এত ভীড় ছিল যে সকলের ভাড়া চাওয়ার সময় হয়নি-কন্ডাকটর বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। অনেকে পয়সা দিয়ে চলে যাচ্ছেন। শেষে কন্ডাকটর গাড়ীতে উঠতে যাচ্ছেন, পিছন থেকে এক বৃদ্ধ তাঁকে ডেকে পয়সা দিলেন। কন্ডাকটর বললেন—অনেকদিন এ লাইনে আছি, আজ এই প্রথম দেখলাম ডেকে পয়সা দিয়ে যায়। বৃদ্ধ বললেন—ভাই, তোমার বয়স কম-কতটুকু দেখেছ—জেনো, দেশ এখনো বীরশূন্য হয়নি। একটু নাটকের মত কথা হল বটে।

[বৃদ্ধ রমনীমোহন স্বয়ং—কাগজের জবর খবর]

ছাত্র ও শিক্ষকের প্রতি

.... যে রকম দুর্দিন তাতে ছাত্রদের বলব লেখাপড়া মন দিয়ে কর। কিছু শরীর শ্রম ও চাই আর জীবিকার দিকে লক্ষ্য রাখ—শিক্ষকদের সাহায্য চাও। শিক্ষকদের বলব—আপনারা দেশের সংগঠন ও কাজের জন্য নিজেদের দায়িত্ব স্বীকার করুন ছেলেদের পড়ান ছাড়াও আপনাদের কাজ করতে হবে—বড় বড় রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে গোখেল, রাধাকৃষ্ণান, অনিলবরণ রায়, নিবারণ দাশগুপ্ত প্রভৃতির মত হউন। ....শিক্ষক সংস্কারমুক্ত না হলে ছাত্রও ঠিক শিক্ষা পাবে না। কোনো একরকম মতবাদকে নিজের পছন্দ মত চালিয়ে সুকৌশলে শিক্ষাদান করলে ছাত্র স্বাধীন মানুষ হবে না—তালিম পাওয়া সৈনিকের মত মাত্র হবে, মানববুদ্ধি বিবর্জিত একপ্রকার ভারবাহী পশুতে পরিণত হবে—শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে—মানবজাতির সর্বনাশ হবে। তাই এই বিষয়ে শিক্ষক সমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করি। তাঁরা যেন কোনো দলের ভিতরে না পড়েন। বৃটিশের এত কঠোর শাসনের মধ্যেও আমাদের সুযোগ্য শিক্ষকগণ ছিলেন এমনই মানুষ—তাই ভারত স্বাধীন হতে পেরেছে।

জগন্নাথের ডাক

....জগন্নাথের রথ বিশ্ব কাঁপিয়ে চলেছে—আমাদের ভাগ্য ভাল যে তার রশিতে টান দিচ্ছি—ধনী, দরিদ্র, সুখী অসুখী সকলেই। যে আনন্দে আছে সেও যেমন, যে নিরানন্দে আছে সেও জগন্নাথের কাজ করছে—মানব সেবার মধ্য দিয়ে তাঁর সেবা করছে। নিজেদের শ্রম দিচ্ছে, ঘাম ঝরাচ্ছে, শক্তি দিচ্ছে। যে মূঢ় সেই অলস সমাজের ঘাড়ে বোঝা হয়ে আছে, শোষক হয়ে আছে। জগন্নাথের ডাক সে শুনতে পায় না—

কেবল নিজের স্বার্থ চিন্তায় মেতে আছে। তার জন্ম বিফল। আসুন আমরা সকলে তাঁর রথের রশি ধরি—মানব সেবার কাজে নিজেদের সমস্ত উদ্যমকে নিয়োজিত করি। [রথযাত্রা]

লক্ষ্য ও পথ

....যাঁরা বিপ্লবের পথকে মান্য করেছিলেন, তাঁদের অন্তর ছিল মহৎ কিন্তু কঠোর। লক্ষ্য উত্তম ছিল হয়ত—পথ তেমন ছিল না। লেখক বলেন পথটা উত্তম হওয়া চাই—অন্যে বলেন যেন তেন প্রকারেণ উদ্দেশ্য সাধন চাই। এই তর্কের মীমাংসা হয় নাই। একজন বলেছেন আমার কোন দেশ নাই। যেখানেই মানুষ নির্যাতিত নিপীড়িত সেই আমার দেশ। তাঁরা শোচনীয় মৃত্যু পেয়ে অমর হয়েছেন। প্রমাণ হয়েছে পৃথিবী এখনও মানুষের উপযোগী হয়নি। ঠিক পথ পেতে সময় লাগবে। কিন্তু আমরা কবির কণ্ঠে বলি—আসিবে সেদিন আসিবে।

[আমরা এখন হারিয়ে যাচ্ছি]

দিক্ দর্শন

যখনই কোন কাজ করতে যাবে প্রথমে দেখবে তোমার সেই কাজের দ্বারা যারা সব চেয়ে দীন, সব থেকে হীন, তাদের কোন উপকার হবে কিনা—বলেছেন মহাত্মা গান্ধী।

সমাজ সেবা করতে গেলে আগে পশ্চাৎপদ লোকদের দেখ। অন্যথায় যতই আড়ম্বর ও অর্থ ব্যয় কর না কেন তাহাতে সমাজের উন্নতি হবে না। কেবল গরীবের জন্য কাঁদিলে কোন লাভ নাই—যে উপায়ে তাদের দুঃখ দূর হয় তা করাই কর্ত্তব্য। আর একটা কথা মহাত্মাজী বলেছেন, সৎ উপায়ে সৎকাজ কর। যে কোন উপায়ে কোথাও টাকা ঢালিলে মধ্য পথে তাহার কতক তলাইয়া গেল—উপকারের অপেক্ষা ক্ষতি বেশী হয়। এখনকার কর্মবীরদের এসব কথা ভাল লাগবে কি?

কথায় কথায়

সবার আগে সমাজ শিক্ষা

শিক্ষা বলিতে আমরা সাধারণত স্কুল কলেজের শিক্ষা মনে করি; কিন্তু যে দেশে এখনও নিরক্ষরের সংখ্যাধিক্য, সেখানে দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য কেবল বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষাই পর্যাপ্ত নয়। একটি স্বাধীন দেশের লোককে যদি স্বাধীনতার ফলভোগ করিতে হয়, তাহা হইলে কেবলমাত্র বিদ্যালয়ের শিক্ষা দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। সমাজশিক্ষার ব্যবস্থা সকলের আগে করা আবশ্যক।

এখন সমাজ বলিতে আমাদের ভারতীয় সমাজ ও তাহার আদর্শ বিষয়ে লক্ষ্য স্থির না থাকিলে, যেকোনো রূপ শিক্ষা ব্যবস্থা দ্বারা এমন একটি অবাঞ্ছিত অবস্থার উদ্ভব হইতে পারে যাহা দ্বারা মূল সমাজই খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যাইবে। রামায়ণ ও মহাভারতের সমাজই আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত, অতএব প্রাথমিক স্তর হইতেই আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে আমরা ছাত্রগণকে ও দেশবাসীগণকে কোন্ পথে চালিত করিতেছি। শিক্ষক মহাশয়গণ পরিবেশ পরিচয়ের মধ্যে কয়েকটি অল্প বয়স্ক ছাত্রগণকে কিছু জ্ঞান দিয়া থাকেন, তাহা উত্তম কথা। কিন্তু তাঁহাদের শিক্ষা ক্ষেত্রের বাহিরে অগণিত নরনারীর জন্য কিরূপ ব্যবস্থা আছে? জেলায় জেলায় একজন সমাজ শিক্ষা আধিকারিক ও মাঝে মাঝে একএকটি ছোট বড় পাঠাগার [পুস্তকালয় বলিলে ঠিক হয়] ইহাই যথেষ্ট কি?

যাহা হউক আমাদের প্রয়োজন কি, তাহা দেখিবার পূর্বে আমাদের বর্তমান অবস্থা কিরূপ আছে তাহা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া দেখা ভাল। শহরগুলিতে নাগরিকগণের উপযুক্ত সভ্য সমাজের অর্থাৎ আরাম প্রিয় মানব সমাজের [মানব প্রেমিকগণ অপরাধ লইবেন না] উপযুক্ত জল, আলো, শিক্ষালয় ও আমোদ প্রমোদাদি আছে। তুলনায় পল্লীগ্রামে বিশেষ কিছু নাই এবং আমরা শহরবাসীগণের ন্যায় সুবিধা করিতে আগ্রহী নহি। কিন্তু মানবজীবনকে এখনকার যুগে টিকাইয়া রাখিতে হইলে অত্যাবশ্যক কতকগুলি ব্যবস্থা আমাদের চাই এবং সেগুলি করিতে গেলে সর্বপ্রথম যে জিনিস চাই তাহারই নাম সমাজশিক্ষা। পল্লীপথগুলি ময়লায় এখনও পূর্ণ, পানীয় জল অনেকস্থানে সহজলভ্য নয়। খাদ্য-পুষ্টিকারিতার বিষয়ে এবং রোগাক্রমণের বিষয়ে সাধারণের একান্ত অজ্ঞতা এবং স্বাধীনতার বিষয়ে বিকৃত ধারণা হেতু সঙ্ঘবদ্ধ অবিচার ও অত্যাচার এখন গ্রাম বাংলাকে অশান্তিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। ইহার প্রতিকারকল্পে আবশ্যক সমাজশিক্ষা।

গ্রামবাসীগণ দারুণ অর্থনৈতিক চাপে পড়িয়াছেন—ফলে প্রতি পরিবার অপরের

কথা চিন্তা করিবারও অবসর পাইতেছেন না। সমাজ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বাহ্যিক ধর্মাচরণও মেলা উৎসবাদি যাহা আছে তাহার মধ্যে গতানুগতিকতা ছাড়া বোধ হয় আর কিছুই নাই অথবা আর যাহা দেখা যায় তাহা অপ্রিয় হইলেও বলার বাধা নাই—কিছু সন্তাদর উচ্ছৃঙ্খলতা ও আমোদপ্রিয়তা মাত্র। নাবিক বিহীন তরণীর মত সমাজ তরণী আজ ভাসিয়া চলিয়াছে। আমাদের সুস্থ সমাজ জীবনে যদি একতা ও জাতীয় চেতনা আনিতে হয়, যাহা আজ বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে, তবে সকলের আগে আবশ্যক সমাজশিক্ষা।

কিরূপভাবে সময়োপযোগী সমাজশিক্ষা প্রচলন করা যায় সে বিষয়ে কিছু চিন্তা করা যাইতে পারে—চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ আরও সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিতে পারিবেন।

এতদর্থে দুইপ্রকার কর্মব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। প্রথম—যে কাজগুলি করা কর্তব্য, দ্বিতীয়—যে সকল কুঅভ্যাস ও কুসংস্কার বর্জন করা উচিত তাহা নির্দেশ করা। অর্থনৈতিক দুরবস্থা হইতে অধিকাংশ দরিদ্রগ্রামবাসীকে উন্নতিতে আনিতে কেবলমাত্র সমবন্টনব্যবস্থা কার্য্যকরী হইবে এরূপ ভ্রম অনেকেই করিতেছেন। বরং ইহা দ্বারা অবস্থা আরও শোচনীয় হইতে পারে। প্রতিযোগিতার যুগে উৎপাদনের দিকে আগে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। যথা-দুইটি স্থানের মধ্যে যে স্থলে উভয়প্রান্তে দশটি করিয়া রিক্সা যান চলিলে চালকগণ জীবিকা অর্জন করিতে পারেন, সেইস্থলে প্রতি প্রান্তে বিশটি করিয়া যান চালু করিলে, সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন এবং পরিণামে সকলকেই ডুবিতে হইবে। এইরূপ চিন্তার কারণ এই যে, অর্থনীতির পটভূমিকার উপরেই সমাজশিক্ষার ব্যবস্থা পরিচালিত হইবে। সরল করিয়া বলিতে গেলে এইরূপ বলা যায় যে, যাহাদের ঘরে একান্ত অন্নাভাব, যাহাদের শিশুরা ক্ষুধার তাড়নায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়াছে তাহাদিগকে নৈশ বিদ্যালয়ে বা পাঠাগারে শিক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য আকর্ষণ করা সম্ভব কি?

সুতরাং এই দরিদ্র দেশে দুটি মোটা ভাত ও মোটা কাপড়ের সংস্থান করিবার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ শিক্ষা দ্বারা জনগণের চেতনা জাগ্রত করিতে হইবে। আধুনিক বিদ্যালয়ের সাহায্যে ইহা সম্ভব নয়। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে উত্তম প্রচার মাধ্যমে বহু উপকার হইতে পারে। আমরা সত্য সত্যই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুবোধ, গোপাল হইয়াছি—যাহা পাই তাহাই খাই, পুষ্টি বিষয়ে জ্ঞান নাই। গ্রামের স্বাস্থ্য যে সমবেত চেষ্টা ছাড়া রক্ষা করা সম্ভব নহে, এই সরল সত্যটুকু আমরা বুঝিতে চাহি না। আমরা এখন স্বাধীন রাজ্যের প্রজা সুতরাং নিজের ইচ্ছামত চলি, বলি ও কর্ম করি—ফলে সমাজের এই অবস্থা। আমাদের গণতন্ত্র কেবল মুখেই আছে। সত্যই যদি আমরা সমাজতন্ত্রী বা গণতন্ত্রী হইতাম তাহা হইলে গ্রামের এই শোচনীয় অবস্থা দেখিতাম না।

অপরপক্ষে যে সকল কদভ্যাস বর্জন করা উচিত তাহার দিকে সমাজশিক্ষার মধ্যে বিধান থাকা আবশ্যক। আমাদের সরকার স্বাধীন রাজ্যের সরকার, সকলকেই স্বাধীনতা দিয়া গৌরববোধ করেন। সুতরাং অজ্ঞ জনসাধারণ যে স্থলে নিজেদের

পায়ে নিজেরা কুঠার আঘাত করিতেছেন তাহাতেও হস্তক্ষেপ পরিতে চাহেন না। শিশু অজ্ঞান সে আগুনে হাত দিতে চাহে। তাহার পিতামাতা যদি তাহাকে তাহা করিতে স্বাধীনতা দেন, তবে যেরূপ পরিণাম সম্ভব, আমাদের সরকারের কার্য্যও সেইরূপ হইতেছে বলা যায়। আমরা যে কি প্রকারে আত্মঘাতী তাহা বুঝিতে হইলে পল্লীগ্রামে কতকগুলি মন্দ অভ্যাসের কথা বলিতে হয়। স্বাস্থ্য বিভাগ ও পঞ্চায়েত বিভাগ চিরকালই নির্দেশ দিয়াছেন গ্রামের পথের পার্শ্বে মলত্যাগ করিবেন না—কেহ নিজ অধিকারে জঙ্গল কচুরিপানাদি রাখিয়া অন্যের ক্ষতি করিবেন না। কিন্তু সে কথা কেহ মানে না। তাহার জন্য কোনো শাসনও নাই কারণ অধিকাংশ লোক সেইরূপ আচরণ করিয়া স্বাস্থ্যহানিকর কর্মকে প্রথায় পরিণত করিয়াছেন। নিম্নবঙ্গের জনৈক ধর্মপ্রাণ ভদ্রলোক বলিয়াছেন—আমাদের স্বর্গলাভ সুনিশ্চিত কারণ আমরা আজীবন নরকের মধ্যে বাস করিয়া গেলাম—ভগবান নিশ্চয় আমাদিগকে আর নরকে প্রেরণ করিবেন না।

গ্রামের সমাজে পূর্বে নিজেদের বিচারব্যবস্থা ছিল এখন তাহা আর নাই—দেশ এখন একরূপ অরাজক একথা বলিতে আমাদের দ্বিধা নাই এবং যাঁহারা দেশ শাসনের ভার পাইয়াছিলেন বা লইয়াছেন তাহারাই এরূপ অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছেন। সম্পূর্ণ অরাজক বলিতে চাহিনা কেননা এখনও থানায় কয়েকজন আরক্ষা কর্মচারী আছেন এবং গ্রাম হইতে বহুদূরে হইলেও বিচারাধিকরণ বর্তমান আছেন। বহুলোকে স্বেচ্ছামত আচরণ করিতে পারিলে প্রথমত সন্তোষ বোধ করেন কিন্তু তাঁহারা ক্রমে বুঝিতে পারেন—প্রত্যেকে স্বেচ্ছাচারী হইলে গ্রাম সমাজের অবস্থা সঙ্কটজনক হয়। এবং গ্রামে তখন অরণ্যের আইন চলিতে থাকে। সরকার অর্থে বহু চিন্তাশীল মানুষের সমবায় এরূপ আমরা মনে করি। সুতরাং গ্রামকে অরক্ষিত রাখিয়া তাঁহারা দেশের শান্তি কিরূপে রক্ষা করিবেন তাহা আমরা ধারণা করিতে পারিনা। সুতরাং সমাজ শিক্ষাদানের মাধ্যমে স্বশাসিত সমাজ শান্তিপূর্ণ সমাজ হইতে পারে এরূপ আশা করা অসঙ্গত হইবে কি?

সকল রকম শিক্ষার সিলেবাস আছে—সমাজ শিক্ষার কি সেরূপ সিলেবাস বা পাঠ্যক্রম নাই? সত্যই সাধারণ শিক্ষার মত লিখন, পঠন, অঙ্ক প্রভৃতি ইহাতে আবশ্যক আছে। কিন্তু সর্বাগ্রে যে দর্শন ইহার প্রসঙ্গে উত্থাপন করা যায়, তাহা নিম্নরূপ হইতে পারে মনে করি।

প্রত্যেক মানুষ সমাজের নিকট ঋণী। জন্মের সময়ে মাতা পিতা, ধাত্রী প্রভৃতির নিকট তাহার ঋণ অপরিশোধ্য—তাহার পর হইতে দেশের নিকট অর্থাৎ দেশবাসীর নিকট তাহার ঋণ বাড়িতে থাকে। কেননা এমন কেহ নাই যিনি অপরের সাহায্য বিনা সমাজে জীবন যাপন করিতে পারেন। এই সকল ঋণ যথা—দেবঋণ, পিতৃঋণ স্বদেশের ঋণ প্রভৃতি শত চেষ্টাতেও সম্পূর্ণ পরিশোধ্য নয়। তথাপি এই অসম শোধের চেষ্টাতেই মনুষ্যত্বের পরিচয়। যে বিপথগামী দুর্মনা ব্যক্তি এই দায়িত্ব পরিহার করে বা তাহা পরিহার করিতে চেষ্টা করে, তাহাকেই লোকে নিষ্ঠুর বা অমানুষ বলিয়া

থাকে। সুতরাং সমাজশিক্ষার মূল উপাদান এই সংস্কার জন্মাইবার চেষ্টা করা যায়। এই মূল সূত্র প্রচারের জন্য পাঠাগার, ছায়াচিত্র, রেডিও, টেলিভিসন প্রভৃতির সাহায্য লওয়া যাইতে পারে।

স্বাধীনতার পর প্রায় ত্রিশ বৎসর গত হইয়াছে। এখনও শতশত ব্যক্তি, মেয়েদের কথা অনেক দূর—নিজের নামটুকু স্বাক্ষর করিতে সক্ষম নন—এখনও বহু অল্পবয়সের ছেলে পাওয়া যায় যাহারা মোটেই লেখাপড়া করে নাই। বিদেশী শাসনের সময়ে একবার, সম্ভবত ১৯২৩ সালে বকলম স্বাক্ষর রদ করিবার জন্য উত্তরবঙ্গের জনৈক কাউন্সিলর একটি বিল আনেন কিন্তু তখন তাহা সরকারের অনুমোদন লাভ করে নাই। কারণ তাঁহারা মনে করিতেন দেশে শিক্ষা যত কম থাকিবে তাঁহাদের পক্ষে তত সুবিধা হইবে। কিন্তু স্বাধীন ভারতেও তো কোনো স্বদেশ হিতৈষী মন্ত্রীসভা বা দেশের প্রতিনিধি বকলম রদ করিতে কোন চেষ্টা করিলেন না। যাঁহারা স্বাক্ষর করিতে পারিবেন না তাঁহাদের কোনো আবেদন গ্রাহ্য হইবে না এরূপ ব্যবস্থা হইলে প্রজাসাধারণের অসুবিধা হইবে এরূপ কারণ দেখান খুব যুক্তিসহ নহে, কারণ মানুষ দায়ে না পড়িলে প্রায় কোনো কার্য করে না। জনৈক পল্লীবাসীর বিষয় আমরা জ্ঞাত আছি যিনি সমবায় সমিতিতে ঋণ গ্রহণ সময়ে স্বাক্ষর করিতে অক্ষম বলিয়া প্রত্যাখ্যাত হওয়ায়—সকলেই জানেন সভ্যগণকে পরস্পরের জামিন হইতে হয়—তিনদিনের মধ্যে নিজ নাম স্বাক্ষর অভ্যাস করিয়া সভ্য হইতে পারিয়াছিলেন। সমাজ শিক্ষা বিস্তারের জন্য উক্তরূপ যে সকল প্রচার ব্যবস্থা বা শিক্ষা ব্যবস্থা করা যাইতে পারে তাহা ব্যাপক হইলে অর্থাৎ গ্রামে গ্রামে এরূপ কেন্দ্র নিয়মিত চলিতে থাকিলে লোকের মধ্যে সত্য জ্ঞানের উন্মেষ হইবে।

সমাজশিক্ষা গ্রহণে বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা করিতে হইলে বিরাট ও ব্যাপক ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রথমত গ্রামস্থ সমূহ নিরক্ষর নরনারীর তালিকা প্রস্তুতকরণ আবশ্যক। তাঁহাদিগের জন্য পৃথক পৃথক প্রতিষ্ঠান গৃহ ও তাহাতে কর্মী নিয়োগ আবশ্যক। কেবলমাত্র অবসর সময়ে যথা পুরুষদের সন্ধ্যায় ২ ঘন্টা সেখানে উপস্থিতি আবশ্যক। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র প্রেরণ না করিলে যেরূপ দণ্ডবিধান ব্যবস্থা আছে [১৯৩০ সালের আইন] সেই ধরনের বিধি প্রণয়ন করাও আবশ্যক হইবে। ইহাও একটি গুরুতর যুদ্ধ একথা স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করি।....

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা

মানুষদের মানুষ করিতে হয়। সমূহ শিক্ষাব্যবস্থার মূলে এই চিরন্তন সত্য বিরাজমান। দেশ, কাল, পাত্র যেমনই হউক না কেন—জ্ঞান বিজ্ঞানের শীর্ষে অবস্থিত ইউরোপ, আমেরিকা বা গভীর অরণ্য ও মরুভূমির মধ্যস্থ আফ্রিকার অনগ্রসর দেশ—সকলেরই লক্ষ্য শিক্ষা এমন হইবে যেন মানুষ নামক এই প্রাণীটা প্রকৃতপক্ষে মনুষ্যত্ব অর্জন

করিতে পারে। জন্মসূত্রে মানুষের ভেদ নাই—আছে সংস্কারের ক্ষেত্রে। সুতরাং আমরা চিন্তা করি শিক্ষার ব্যবস্থা যাহাদের জন্য হইবে, তাহারা সভ্যতার কোন্ স্তরে আছে বা তাহাদের মানসিক গঠনই বা কেমন?

এই মূলতত্ত্বের উপর নির্ভর করিয়াই যুগে যুগে শিক্ষার ব্যবস্থাপকগণ নূতন নূতন শিক্ষাপদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়াছেন। ইহার কতক শিশুদের জন্য, কতক বয়স্কদের জন্য, আবার কতক বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান ও শিল্পাশ্রয়ী। সকলেই জানেন শিশুকাল হইতে মানব শিশুকে নৈতিক শিক্ষা না দিলে সে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার পরিবেশের মধ্যে পড়িয়া সংসর্গ দোষে অমানুষ বা অপরিণত মানুষ হইয়া যাইতে পারে। সুতরাং শিশুর শিক্ষা বিষয়ে মনীষী চিন্তাবিদগণ চিন্তা করিয়াছেন।

কেবলমাত্র সমাজে বাসোপযোগী নৈতিক শিক্ষা হইলে চলে না। মানুষকে গ্রাসাচ্ছাদনের উপরেও নির্ভর করিতে হয়। পৃথিবীর শীত গ্রীষ্ম বর্ষাকে ও অগ্রাহ্য করা চলে না। প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে মানুষ পৃথিবীর নানা দেশে দেশকালোপযোগী জীবনধারণ ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হয়। সুতরাং শিক্ষার বিষয়বস্তুর মধ্যে নানাপ্রকারের কথা আসিয়া পড়িল। যতদূর মনে হয় শিশুর মনস্তত্ব বিষয়ে সেকালে বিশেষ ভাবনা ছিল না। কতকগুলি আবশ্যকীয় বিষয় শিক্ষা দিলেই চলিত। যে শিখিবে তাহার মনের খবর তাহার ক্ষমতার পরিমাণ লইয়া কেহ ভাবিতেন না। বেত্রহস্ত গুরুমহাশয়গণ তিনটি শিক্ষা দিয়াই মানব শিশুগণকে কুটীল সংসার পথে ছাড়িয়া দিতেন। অবশ্য নানা শ্লোকে নানা ছন্দে কিছু সাবধান বাণী দিতেন। মানবকবৃন্দ গুরুর আশীর্বাদ লইয়া বিদায় হইত।

গত শতাব্দী হইতে নানা দেশে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ শিশুগণকে কি প্রকারে শিক্ষাদান করিলে তাহারা সহজেই বহু জ্ঞান পাইতে পারিবে, তাহার জন্য নানারকম উপকরণ সৃষ্টি বা সংগ্রহ করিলেন। মনোবিজ্ঞানের চর্চাও তাঁহারা করিলেন। বিজ্ঞ চিকিৎসকের মত তাঁহারা রোগীর নাড়ী নির্ণয় করিয়া এমন সরল পদ্ধতিরূপ ঔষধ প্রয়োগ করিলেন যাহাতে শিশু সহজে উপস্থাপিত বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে এবং তাহার বুদ্ধির বিকাশ হইতে পারে। শিশু স্বভাবত চঞ্চল ও অমনোযোগী—কিরূপে তাহাকে আকর্ষণ করা যায় তাহাই তাঁহারা প্রথম ভাবিলেন। তারপর ভাবিলেন সাধারণ মানুষের জীবনে কি কি আবশ্যক হইবে।

যে সকল বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা এইরূপ—মাতৃভাষা, অঙ্ক, ভূগোল ইতিহাস ও সামান্য প্রকৃতি পরিচয়। তন্মধ্যে ভূগোল ইতিহাসের গুরুত্ব সমধিক কারণ অধিকাংশ ছাত্রই উচ্চতর শিক্ষার জন্য যাইতে পারে না। এই সময়েই যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান না দিলে তাহারা বঞ্চিত থাকিবে। নৈতিক শিক্ষা ও ধর্ম কথা ভাষাপুস্তকের মধ্যে সুগভীরে থাকে, ছাত্রগণ সোজাসুজি বুঝিতে পারে না। কিন্তু পরবর্তীকালে ঐ শিক্ষা কাজে লাগিবে আশা করা যায়। বহু শিক্ষাবিদ বলেন, শিশুর অজ্ঞাতসারে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাই উৎকৃষ্ট। রোগীকে অচেতন করিয়া ঔষধ দেওয়ার মত এই পদ্ধতি। আমরা এই শতাব্দীর প্রথম দশকে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়াছিলাম। যতদূর স্মরণ

হইতেছে তৎকালে যে সকল নীতিবাক্যাদি মুখস্থ করানো হইয়াছিল, তাহার ফল পরবর্তী জীবনে বেশ ভালই হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করি, সরকার প্রদত্ত পুস্তকে এমন সব শিকার কাহিনীর নিষ্ঠুর বর্ণনা আছে যাহা শিশুগণের হৃদয়কে কঠোর করে। আমরা মনে করি শিশু হৃদয়ে করুণা জাগ্রত হয় এমন এমন বিষয় [কবি কুমুদরঞ্জনের এইমর্মে কবিতা আছে] থাকা উচিত। মানব ও দানব শব্দের মধ্যে একটি মাত্র অক্ষরের তফাৎ আছে। অভিমন্যু, একলব্য এ যুগে দুর্লভ, কিন্তু উহাদের কাহিনীর মধ্যে শিক্ষালাভের কিছু কাহিনী সুকৌশলে বর্ণিত আছে।.....ইংরাজি শিখাইবার আগ্রহ ছিল—একেবারে গোড়া হইতে ইংলিশ ছিল না। যুগের প্রয়োজনে অনেক বিষয়েই—পোষাক সাজসজ্জা কেশবিন্যাস কত পরিবর্তিত হইয়াছে, এ বিষয়ে আপত্তির কিছু নাই—কেবল আশা করি মানুষের আদর্শ যেন থাকে।

এখনও যে দেশে নিরক্ষরতা অত্যন্ত বেশী—বোধহয় পূর্বাপেক্ষা বেশী—সেখানে একথা বলা প্রয়োজন যে সমাজে শিক্ষাবিস্তারই সকলের আগে দরকার। এখন পৃথিবী যেন ছোট হইয়া গিয়াছে—বিজ্ঞানের কল্যাণে সকলে সকলের নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। বিশ্ববাসী যখন শ্রবণ করেন যে ভারতের ন্যায় বিরাট দেশে বত্রিশ কোটীর উপর ভোটার ভোট দিয়া সরকার গঠন করেন, তখন নিশ্চয় তাঁহারা বিস্ময়ে অভিভূত হন [এমন দেশও আছে যেখানে লোকসংখ্যা কয়েক লক্ষ মাত্র], কিন্তু যদি তাহারা অবগত হন যে ভোটারদের অর্ধেকের বেশী নিরক্ষর তখন তাঁহাদের বিস্ময় কৌতুকে পরিণত হয়। বিশ্বসভায় এজন্য আমরা হাসির পাত্র হইতেছি। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করনে কেবল ভারত নহে আরও বহুদেশ বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু আমরা দৃঢ় বিশ্বাস করি নিরক্ষরতা দূরীকরণ আধুনিক জগতে সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা হওয়া উচিত। প্রস্তরে মুষ্টির আঘাত কখনও ফলপ্রদ হয় না। স্বার্থান্ধ কতিপয় কূটবুদ্ধি লোক ভিন্ন বোধ হয় সকলে এই প্রচেষ্টা অনুমোদন করিবেন।

আমাদের নিবেদন, সকলে চিন্তা করুন কাহাদের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা অগ্রে হওয়া আবশ্যক এবং তাহার বিষয়বস্তু সংক্ষেপে কিরূপ হওয়া উচিত। সমস্যাটি যে পরিমাণে বিরাট, তাহার সমাধানে অবহেলাও ততোধিক হইয়াছে। নিরক্ষরেরা আপনা হইতে বিদ্যার্জন করিতেছে না কেন, এইরূপ উদ্ভট চিন্তা যদি আমাদের মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত না করে তাহা হইলে জাতীয় পরিকল্পনায় সর্বপ্রথমে ইহার স্থান হওয়া আবশ্যক। নির্দিষ্ট সময় মধ্যে [ধরুন তিন বৎসর] ভারতে নিরক্ষর থাকিবে না—শিক্ষিত সমাজ তথা শাসকবর্গ এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করুন।

মাষ্টার-টীচার-গুরু মহাশয়

এখন থেকে অন্তত আশি বছর আগে [১৯১০ সাল নাগাদ] প্রায় প্রতি গ্রামে একটি পাঠশালা ও তাতে একজন গুরু মহাশয় ছিলেন। এমন পল্লীও ছিল যেখানে এই রকম

বিদ্যালয় ছিল না। কতকগুলি গ্রামের মধ্যে একটি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। পাঠশালাগুলিকে নিম্নপ্রাথমিক বা লোয়ার প্রাইমারী বা এল পি স্কুল বলত। একটি থানার মধ্যে একটি বা দুটি হাইস্কুল স্থাপিত হয়েছিল। চার পাঁচটি মধ্য বিদ্যালয় ছিল—সেখানে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ান হত। অবশ্য তখন যে কোন গ্রামের লোকসংখ্যা এখনকার অর্ধেকও ছিল না।

একজন গুরু মহাশয় কেমন ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ লেখক লালবিহারী দে মহাশয় তাঁর বেঙ্গল পীজান্ট লাইফ বা বঙ্গীয় কৃষক জীবননামক উপন্যাসে বর্ণনা করেছেন। বিলাতের গোল্ডস্মিথ সাহেব ভিলেজ স্কুল মাষ্টার কবিতা লিখে তাঁদের সম্মান দিয়েছেন।

আমাদের গুরু মহাশয়দের শিক্ষকতা ছাড়াও অন্য পেশা ছিল—এটা ছিল গৌণ পেশা। তাঁরা দলিলপত্র লিখতেন বা ছোট দোকানও করতেন। দেশের লোকে কোন ধনী লোকের চণ্ডীমণ্ডপে বা গ্রামের বারোয়ারী তলায় আটচালার মধ্যে পাঠশালার জায়গা দিতেন। মাহিনাপত্র তিনি খুব কমই পেতেন—ছাত্রদের দেওয়ার ক্ষমতাও কম ছিল। তখনকার মুদ্রায় চারআনার বেশী মাহিনা ছিল না। উচ্চ প্রাইমারী স্কুলে আটআনা ও মধ্য বিদ্যালয়ে এক টাকা পর্যন্ত মাহিনা ছিল। গুরু মহাশয় সব ছেলেকে নিজে পড়াতেন না—বড় ছেলেরাই ছোট ছেলেদের পড়িয়ে দিত। বর্ণপরিচয় ও সামান্য অঙ্ক শেখান হত। ভাল ছাপা শিশুশিক্ষার বই বেরোবার আগে শিশুবোধক নামে দু'আনা দামের একটা বই ছিল। সেই পুস্তকে বাংলা অক্ষর শিক্ষা থেকে আরম্ভ করে বানান, শুভঙ্করী নামে হিসাব শিক্ষা এবং খানিকটা পুরাণ কথা থাকত। গঙ্গার বন্দনা, দাতাকর্ণ, প্রহ্লাদ চরিত্র ও শেষের দিকে একশত আটটি চাণক্য শ্লোক থাকত। এইমাত্র বিদ্যা গুরুমহাশয়ের কাছে পেয়েই অনেকে সংসার-সমুদ্রে পাড়ি জমাতেন। চাণক্য তাঁদের যে পথ দেখাতেন ও পুরাণের কাহিনী তাঁদের মনে যে দাগ কাটত একজন সাধারণ লোকের পক্ষে তাই যথেষ্ট মনে করা হত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হাতে কেহ কেহ এরপরে পড়তেন। একজন সামান্য পল্লীবাসী এই গুরুমহাশয় বিশেষ মাননীয় ছিলেন। আমরা দেখেছি পরে যাঁরা ব্যবসায়ী, মহাজন বা জমির মালিক হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, তাঁরা তাঁদের গুরুমহাশয়ের জন্য গর্ববোধ করতেন।

প্রাইমারী ও মধ্যবিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ পণ্ডিত মহাশয় নামে অভিহিত হতেন। তাঁদের ইংরাজি শিক্ষা কম ছিল কিন্তু তাঁরা বাংলা সাহিত্য, পাটীগণিত, শুভঙ্করী, ইতিহাস, ভূগোল, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান প্রভৃতিতে যথেষ্টে জ্ঞান দিতে পারতেন। বর্তমান শতাব্দী যত এগিয়ে আসতে লাগল, ততই এই পণ্ডিত মহাশয়গণ মাষ্টার উপাধি প্রাপ্ত হলেন। ইংরাজিতে মাষ্টার শব্দের অর্থ অনেক রকম হয়। আমরা এখন বুঝতে পারি আমাদের সেই পণ্ডিত মহাশয়গণ প্রভু, পারদর্শী শাসক একাধারে সমস্তই ছিলেন। যদিও তাঁরা বিদ্বানের নম্রতাগুণের জন্য কখনও গর্বভরে নিজেদের গুণ প্রচার করতেন না। তাঁদের কথা যতই স্মরণ করছি ততই আশ্চর্য হচ্ছি যে পরাধীনতার সেই

অন্ধকারময়যুগের মধ্যে তাঁদের মত মহাপ্রাণের আবির্ভাব বোধহয় এই দেবভূমির উপর ভগবানের অপার করুণার প্রকাশ ছিল।

ঈশ্বর যুগে যুগে অবতার হয়ে থাকেন, একথা শাস্ত্র মারফত জানিয়ে রেখেছেন। পৃথিবীর অন্যান্য অংশেও অনুরূপ ধারণা। ভগবান নিজের অনুরূপে তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানবকে স্বর্গের উদ্যানে পালন করে পরে তাদের মর্ত্যে বিতাড়িত করেছিলেন। এখানে তাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বাঁচতে দারুণ কষ্ট পেতে হল। কিন্তু ঈশ্বর তাদের ভুলেন নাই—নিজের পুত্রকে পাঠিয়ে তাদের আবার স্বর্গের পথ পরিষ্কার করে দিয়েছেন। আমাদের বাল্যের শিক্ষকমহাশয়গণ ভগবানের দূতরূপেই আমাদের স্বর্গের পথ সরল করে দিয়ে গেছেন। তাঁদের স্মরণমাত্র নয়নে অশ্রু সঞ্চার হয় না এরূপ পাষণ্ড বোধহয় সংসারে জন্মগ্রহণ করে নাই। মাষ্টার মহাশয়ের মধ্যে যাঁরা ছোট বড় উপাধি দেন আমরা তাদের পছন্দ করি না।—তুলসী পত্রের ছোট বড় হয় না, উভয়েই নারায়ণের মস্তকে স্থান লাভ করে।

সাহেবগণ আমাদের জন্য বহু উপাধিপ্রাপ্ত টীচার বা শিক্ষক সৃষ্টি করেছেন কিন্তু তাঁরা নিজ নিজ বিভাগে বিশেষ জ্ঞান দানে নিযুক্ত থাকেন। বালক বালিকাগণের অন্তরে স্থানলাভের জন্য তাঁরা যে শিক্ষা প্রণালীতে দক্ষতা প্রদর্শন করেন, তার দুইরকম ফল দেখা যায়। কখনও এই আচার্যগণ লোকাতীত আকর্ষণ সৃষ্টি করে কোমলমতি ছাত্রগণের জীবনে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেন। অপর অনেকে ঘন ঘন কর্মস্থল পরিবর্তন করে শেষে বিস্মৃত হয়ে যান। এমন শিক্ষকও বিরল নয় যিনি একটা বিদ্যালয়ে সারাজীবন কর্ম করে বিদায় গ্রহণ করেছেন। এমন শিক্ষক ও দুর্লভ নয় যিনি বহু প্রতিকূলতার মধ্যেও বিদ্যালয় সংগঠন ও পরিচালনা উভয় ব্যাপারেই গুরুতর পরিশ্রম করে শেষ জীবনে শান্তিলাভের জন্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও অবসর গ্রহণ করেছেন।

কৃষক যখন বীজ বপন করে তখন সে জানে না সেই বীজ কতদূর কাজের হবে- এটাও সে জানে না কোন্ বীজ পাথরে পড়ে নষ্ট হবে বা কোন্ বীজ প্রতিকূল আবহাওয়ায় পড়ে অঙ্কুরিত হবে না, কিন্তু তার আশা সে ছাড়ে না। আমাদের শিক্ষাব্রতী মাষ্টার মহাশয়গণ চিরকাল আশাবাদী। বছর বছর ছাত্রছাত্রীদের ধারা চলে যায়, শিক্ষক শিক্ষিকাগণ বুক বেঁধে থাকেন, নিশ্চয় তাদের শ্রম বিফল হবে না।

মাষ্টার মহাশয়ের মনোবেদনা

এ বছর পরীক্ষার ফল ভাল হয়নি—প্রায় সকলে পাশ করেছে তবে বেশীর ভাগ তৃতীয় বিভাগে—তাই মাষ্টারমশাই বিমর্ষ হয়ে পথে চলেছেন। বুড়ো দাদাও ঐ পথে আসছিলেন। তাঁর বয়স আশি পেরিয়ে গেছে। মাষ্টারমশায়ের দুঃখের কারণ শুনলেন। বেশীর ভাগ তৃতীয় বলেই দুঃখ। তাঁরা ত সবাইকেই সমান যত্নে পড়িয়েছেন।

বুড়ো দাদা বললেন ঐ রকমই হয়ে থাকে। দেখুন গ্রামে যত লোক আছে তারাও তিন শ্রেণীর। প্রথম শ্রেণীতে আছেন যাঁরা নিজের স্বার্থচিন্তা বাদ দিয়ে সর্বদাই অপরের হিতচিন্তা করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকে নিজের কাজও করেন আবার গ্রামের হিতের কাজেও মন দেন। তৃতীয় শ্রেণীর লোক কেবল নিজের স্বার্থই দেখেন অপরের সুবিধা বা মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য করেন না। দেশে এই দলের যেখানে সংখ্যা বেশী সেখানে কোনরকম উন্নতির আশা করা যায় না।

আর একদল আছে তাদের আকার মানুষের মত কিন্তু তারা অন্ধকারের বাসিন্দা, সমাজ বিরোধী—সমাজও তাদের উপর সর্বদা রেগে আছে, তাই তারা ছদ্মবেশে বিচরণ করে—তারা কিন্ত আকাশ থেকে পড়েনি। কোন না কোন গৃহস্থের ঘর থেকেই এসেছে ।

এখন আপনারা কি করবেন এই কথার জবাবে মাষ্টারমশাই বললেন—তৃতীয়কে দ্বিতীয় এবং দ্বিতীয়কে প্রথম বিভাগে তোলার চেষ্টা করব । বুড়োদাদা বললেন—ঠিক বলেছেন—আমাদের গ্রামেও ঐ রকম তৃতীয় শ্রেণীকে দ্বিতীয় এবং দ্বিতীয়কে প্রথমে উঠোতে হবে। তার জন্য চাই উপযুক্ত সমাজ শিক্ষা—কেবল স্কুলের শিক্ষাতে কিছু হবে না। লাইব্রেরী, সিনেমা, রেডিও প্রভৃতির মাধ্যমে জনগণের মনে দেশ সেবার জন্য ত্যাগ স্বীকারের পথ দেখাতে হবে। কেবলমাত্র সরকারের চেষ্টায় কোনো দেশের উন্নতি হয়নি—হবে না।

সরল করে লিখুন

উপদেশ দিতে পারি এমন ধৃষ্টতা করিনা—সে যোগ্যতা নাই, তাই বিনীত নিবেদন করি যাঁরা বই লিখবেন বা খবরের কাগজে বা ম্যাগাজিনে লিখছেন তাঁরা দয়া করে একটু সরল করে লিখুন। স্কুলের ছেলেদের নিম্নমানের জন্য যে ইতিহাস লেখা হয়েছে তার একখানি হাতে পড়েছে। স্বীকার করি বইটি সুলিখিত ও মূল্যবান কিন্তু যারা পড়বে তাদের বিদ্যা বুদ্ধি বয়স বিবেচনায় মনে হয় ছাত্র-ছাত্রীর বোধগম্য হওয়া কষ্টকর হবে। অবশ্য শিক্ষক শিক্ষিকাগণ সরল করে বুঝিয়ে দিতে পারেন তবে তাঁদের কথাও একটু ভাবতে হয়। ৪০-৫০ জন ছাত্র সময় মাত্র ৪৫ মিনিট তাঁরা পড়া দেখিয়ে দেন আর ছেলে-মেয়েরা ঘরে কেবল বই পাঠ করতে থাকে। এই একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিলাম।

একটি কাগজের পুজা সংখ্যা দেখলাম আড়ম্বর করেই করা হয়েছে কিন্তু একটি রাজনৈতিক আলোচনা বেশ। সাধারণের পক্ষে আজকালকার কতকগুলি শব্দ সহজে বোধগম্য করা শক্ত হয়। যারা ঐসব চর্চা করেন তাদের খুব কষ্ট হবে না। যে দেশে শিক্ষিতের ভাগ বড় কম আবার অল্প শিক্ষিতই বেশী সেখানে একটু সরল করে লিখলে বোধহয় ভাল হয়। যাদের জন্য এত কথার অবতারণা তাদের গ্রহণ ক্ষমতা

বিবেচনা করে একটু সহজ ভাষায় লিখুন। হয়ত লেখার ষ্টাইল তেমন হবে না হয়ত বেশী জায়গা লাগবে, কিন্তু হজম করার মত আমরা কিছু পাব এবং দেশে নূতন নূতন জ্ঞান বাড়বে।

সংস্কৃতচর্চার কথা

ভারতীয় হিন্দুদের জীবনে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এমন কি মৃত্যুর পরেও সংস্কৃত ভাষার আবশ্যক হয়। শ্রাদ্ধশান্তি, পূজাপার্বণ এবং দৈব ও পারত্রিক নানা অনুষ্ঠানে সংস্কৃত ভাষা এখনও ব্যবহৃত হয়। তখন দেশীয় ভাষা পুরোহিত ব্যবহার করেন না। যজমান প্রতি শব্দের অর্থ হয়ত বুঝতে পারেন না, তথাপি পিতৃপুরুষকে মন্ত্র বলে পিণ্ডাদি দেন ও অন্যান্য দানের কাজ করেন।

সংস্কৃতের চর্চা কেমন ছিল তার একটু সন্ধান করলে আমরা দেখি দুইরকম প্রতিষ্ঠানে এই ভাষা শিক্ষা দেওয়া হোত—হাইস্কুল ও কলেজে এবং চতুষ্পাঠী বা টোলের মধ্যে। অতি প্রাচীন কাল থেকে আমাদের সংস্কৃত ভাষা নিয়ে কারবার। এখন দেখছি হাই স্কুলে দুই ক্লাসে কিঞ্চিৎ ব্যবস্থা আছে। যতটা পড়া হয় তাতে মনে হয়, আমাদের ছাত্রদের ভবিষ্যতে ঐটুকু জ্ঞান বিশেষ কাজে লাগবে না। সংস্কৃত বেশ কঠিন ভাষা শিখতে অনেক দিন লাগে। বিদ্যাসাগর মহাশয় পথ দেখালেন—তাই আমরা সেকালে হাইস্কুলে উপক্রমণিকা নামক সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রথম পাঠ এবং তারপর ব্যাকরণ কৌমুদী নামক বড় ব্যাকরণ পড়তে পাই। সঙ্গে কিছু পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ ছিল। তখন টোল বা চতুষ্পাঠীও অনেক ছিল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়গণ নিজ নিজ বাড়ীতে বসেই অনেক ছাত্রকে বিদ্যাদান করতেন। কোন কোন জায়গায় টোল সংস্কৃত বিদ্যালয় নামে পরিচিত ছিল। আদ্য,মধ্য, উপাধি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি ওখান থেকেই হোত। তমলুক হ্যামিলটন স্কুলে যিনি আমাদের সংস্কৃত শিক্ষা দিতেন সেই স্বনামধন্য চিন্তামণিবাবু সাতটি বিষয়ে উপাধি লাভ করেছিলেন। বাংলাদেশে এত রকম সংস্কৃত উপাধি ছিল ভেবে আমরা অবাক হতাম। কাব্য, ব্যাকরণ, স্মৃতি, ন্যায়, দর্শন, পুরাণ ও আয়ুর্বেদ প্রভৃতি বিষয়ে উপাধিপ্রাপ্ত অনেক পণ্ডিত মহাশয়ের নাম আমরা শুনেছি। তখন হাইস্কুলে শিক্ষক মহাশয়দের মধ্যে অনেকে কাব্যতীর্থ, ব্যাকরণতীর্থ, পুরাণতীর্থ প্রভৃতি উপাধিপ্রাপ্ত ছিলেন। আমাদের সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় কম্পালসরি ও এডিশনাল দুরকম ব্যবস্থা ছিল। সমস্ত ছেলেকে সংস্কৃত কম্পালসারি পরীক্ষা দিতেই হোত। আবার অনেকে অতিরিক্ত সংস্কৃত পরীক্ষাও দিতেন। আমরা যেটুকু শিখেছিলাম তাতে সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদি পড়বার পক্ষে কিছু সাহায্য নিশ্চয় হয়েছে এবং তা আমাদের জীবনে বৃথা যায়নি। এখন সংস্কৃত পঠনপাঠনে তেমন উদ্যম দেখি না।

পাঁচশত বছর আগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময়ে নবদ্বীপে সংস্কৃতচর্চার যে বিবরণ

পাওয়া যায় তা সত্যই বিস্ময়কর। তিনি দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতকে পরাস্ত করেছিলেন। তাঁর অনুগামী রূপ, সনাতন, স্বরূপ, জগদানন্দ, মুরারি গুপ্ত প্রভৃতির লেখা দেখলে আমরা বিস্মিত হয়ে ভাবি—এত সংস্কৃতজ্ঞান তাঁরা কিরূপে আহরণ করলেন। স্বনামধন্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ও কবি কর্ণপূর প্রভৃতি বিদ্যার জাহাজ ছিলেন বলা যায়।

যাঁদের নাম নিয়ে আমাদের গৌরব সেই মহাকবি ও দার্শনিক মহাশয়গণের নাম নিয়ে সকলের কাছে প্রার্থনা করি সংস্কৃত পঠনপাঠনে সকলে আগের মত মন দিন।

আমাদের গ্রামের অঞ্চলে একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় ছিল তার থেকে প্রতি বৎসর অনেক ছাত্র আদ্য মধ্য ও উপাধি পরীক্ষা কেন্দ্রে যেতেন—অনেকেই উত্তীর্ণ হয়ে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। পরীক্ষা কেন্দ্র বিষয়ে জনৈক পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট জানতে পারি ভগবানপুর থানার পশ্চিমাংশে বড়বড়িয়া গ্রামের বদান্য জমিদার হাজরা মহাশয়গণ পরীক্ষার্থীগণকে তিনদিন আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করতেন। এমন দাতা কলিযুগে দুর্লভ বলা যায়। প্রতি বৎসর তাঁরা তিনশতাধিক পরীক্ষার্থীর সেবা করতেন। তাঁদের বাড়ীর বিশাল অঙ্গনে পরীক্ষার আসর ছিল—সরকারী পরিদর্শকও থাকতেন। আমরা মনে করি বর্তমানযুগে এরূপ উদ্যমকে মহাযজ্ঞ বলা যায়। সংস্কৃত বাঁচলে ভারত বাঁচবে—সংক্ষেপে এরূপ সিদ্ধান্তও করতে পারি।

মানুষ করার কথা

মানুষদেরও মানুষ করতে হয়। কথাটির মধ্যে রহস্য আছে। যে মানুষ হয়েই জন্মেছে তাকে আবার মানুষ করবে কি করে? সাধারণভাবে লোকে মনে করে মানুষ করা মানে ছোট ছেলেমেয়েদের বড় করা ও উপার্জনক্ষম করা। তথাপি বলতে শোনা যায়, ছেলেটা লেখাপড়াও শিখল, আয় উপায়ও করছে ভাল, কিন্তু মানুষ হলনা। এখানে বোঝা যাচ্ছে মানুষ বলতে আরও এমন কিছু বোঝায় কেবল বিদ্যা বুদ্ধি বা অর্থ উপার্জন নয়।

অমানুষ বলে একটা কথা আমরা প্রায়ই শুনি। তখন বুঝি মানুষের যে সব গুণ থাকলে তাকে প্রকৃত মানুষ বলা যায় ঐ লোকটির তা নাই। কি সেই গুণ যা মানুষকে মনুষ্য পদবাচ্য করে? বড় বড় লোকে মানুষের কয়েকটি বিশেষ গুণ বা ক্ষমতা থাকা আবশ্যক মনে করেন। তাঁরা বলেন কেবল মানুষের দেহ ধারণ করলে বা বল বিক্রম দেখালেও তাকে আমরা মানুষ বলবনা—তার বেশী আরও কিছু চাই। আবার কতক আচার ব্যবহার এমন আছে যা দেখলেই আমরা বলে থাকি—এরা মানুষ নয়। যদিও আমরা স্বীকার করি তারা আকারে দেখতে মানুষের মত। তাহলে কি সেই বস্তু? প্রকৃত মানুষের থাকা চাই একটি মহৎ হৃদয় যাকে আমরা বড় প্রাণও বলে থাকি। অমনিই কথা উঠে তাহলে ছোট প্রাণ কি? এটা বোঝা বেশী সহজ। যাতে মানুষ

অপরকে পীড়া দেয়, কষ্ট দেয় বা নিরানন্দ করে, সোজা কথায় নির্দয় বা নিষ্ঠুর লোককে আমরা অমানুষ বলি। মহামতি টলষ্টয় পৃথিবীর খ্যাতনামা মহাপুরুষ—তিনি বলেছেন—ভগবান মানুষের মধ্যে দয়া দিয়েছেন। এই দয়া না থাকলে সৃষ্টি থাকত না। যে এই দয়াকে প্রকাশ না করে সেই অমানুষ। মানুষের হৃদয়ে দয়া মায়া প্রীতি প্রভৃতি সবই আছে কিন্তু কর্মগুণে বা সংসর্গ দোষে মানুষ পতিত হয়। তখন তাকে মানুষ করা দরকার হয়। যার ভাগ্য ভাল সে সৎপথে সুরক্ষিত থেকে প্রকৃত মানুষ হতে পারে। আর তেমন সৎসঙ্গ যদি না জোটে, মন্দ পথে গড়িয়ে যেতে বেশী সময় লাগে না, তখনই সে অমানুষ হয়ে যায়। আরও বেশী আলোচনা কঠিন ও জটিল হয়ে উঠবে।

কে আপনার সব থেকে প্রিয়

যখন থেকে আপনার জ্ঞান হয়েছে তখন থেকে আপনি কতক ব্যাপার ভাল আবার কতক মন্দ মনে করে আসছেন। কিন্তু উপরে যে প্রশ্ন করেছি তার উত্তর দিতে গেলে আপনি ভাবনার কূল পাবেন না। কখন মনে হয় একটি প্রিয় আবার পরক্ষণেই মনে হবে না ওর থেকে আরও জিনিস আছে। আবার পরদিন মনে হল ওটাও ঠিক নয়। এই রকম করে শেষের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করুন।

তার আগে অন্য একটা কথার অবতারণা করি। কোনো লোক কোনো অপরাধ করলে আপনি রেগে যান কেন, আবার সে যদি দোষ স্বীকার করে তখন আনন্দিত হন বা তাকে ক্ষমাও করেন কেন? আদালতের হাকিমও বিচারের প্রথমেই আসামীকে জিজ্ঞাসা করেন—তুমি দোষী না নির্দোষ? সাধারণত দেখা যায় আসামী বলে আমি নির্দোষ। কখনও আসামী স্বীকার করে যে সে দোষী তখন বিচারক তার বিচার আরম্ভ করেন এবং আইনত দণ্ড দেন অথবা তিরস্কার করে খালাসও দেন—সে ক্ষমতা তাঁর আছে। কিন্তু তিনি আইনকে মান্য করেই সব কাজ করেন—সেটা তাঁর কর্ত্তব্য। যদি তিনি কোনো সময়ে বিচারে গোল করে ফেলেন তখন উপর আদালতে তা খণ্ডন হতে পারে যদি দণ্ডিত ব্যক্তি সেখানে যেতে পারে— সে ক্ষমতা হয়ত অনেকের থাকেই না—নিম্ন আদালতেই তার দম ফুরিয়ে যায়।

এর আসল কথাটা কি? আপনি ভালবাসেন সত্যকে, মিথ্যার উপরে আপনার বিরাগ আছে। যে নিজেই শয়তান সেও মিথ্যাকে সহ্য করতে চায়না—সঙ্গীর সঙ্গে দাঙ্গা লাগিয়ে দেয়। এই যে অন্তরে সত্যের প্রতি টান এটা সংসারে একটা গূঢ় তত্ত্ব। চোর যে গোপনে কাজ করে তার মূলেও ঐ সত্যের প্রতি প্রীতি বা ভীতি। দুই অবস্থাতেই প্রমাণ হয় মানুষ সত্যকে ভালবাসে—তবে অবস্থা গতিকে নিজের স্বার্থের জন্য তাকে গোপন করে এবং সমাজের অন্য লোকদের প্রতারিত করে। তখনও তার উদ্দেশ্য সে যেন অন্যের কাছে মিথ্যাবাদী বা মিথ্যাচারী বলে ঘৃণিত না হয়।

আমাদের প্রার্থনা আপনাদের সত্যের প্রতি এই অন্তরের টান সর্বদা ও সর্বস্থানে প্রকাশিত হোক। ব্যবসায়, রাজনীতি, সর্বত্র যে খেলা চলছে তার মধ্যে সত্যকে যেন আপনারা চিনে নিতে পারেন—প্রতারিত না হন। যিনি আপনাকে এই কঠিন ব্যাপারে সাহায্য করেন তিনিই আপনার বন্ধু, আর যারা বাইরে চমক দেখিয়ে আপনাদের দলে টানবার চেষ্টা করে [যেমন চোর ডাকাত দল বাঁধে] তাদের বর্জন করে চলুন। অমূল্য জীবনকে একবার ঐ পথে নিয়ে গেলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তখন অনুতাপেরও সময় থাকবে না। আরও বেশী খুলে বললে আপনাদের প্রীতিকর হবে না। চাণক্য বলেছেন—মা ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।

গোলমালের গোড়া

কেবল আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীতে ছোট বড় যে কোনো রকম অশান্তি বা গোলমাল ঘটে থাকে তার মূলে কিছু না কিছু কারণ থাকে। বিন্দুমাত্র আগুন থেকে গোটা গ্রাম পুড়ে যেতে পারে। বিশ্বব্যাপী যে মহাযুদ্ধ দু বার হয়ে গেছে তার গোড়াতে যদি একটু ধৈর্য থাকত হয়ত তা নিবারণ করা যেত, কিন্তু রাজনীতিকরা বিভ্রান্ত হয়ে এমন কাণ্ড করলেন যে আগুন দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ল। আগষ্ট মাসের ছয় তারিখে ১৯৪৫ সালে হিরোসিমা নাগাসাকিতে আণবিক বোমা পড়েছিল—লক্ষ লক্ষ প্রাণ বিনষ্ট হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ আহত বিকলাঙ্গ হয়ে মরণাধিক কষ্ট পাচ্ছে। ১৯১৪ সালে জার্মাণ কাইজার সহসা বেলজিয়াম আক্রমণ করলেন—মহাযুদ্ধ বেধে গেল। তা চলেছিল ১৯১৮ সাল পর্যন্ত। একপক্ষে ছিল জার্মানি, অষ্ট্রিয়া অপর পক্ষে বৃটেন, ফ্রান্স, ইটালি প্রভৃতি। ভারত থেকে এ দেশীয় সেনা ইংরেজ ফরাসি পক্ষে যুদ্ধ করতে গিয়েছিল। একটু ধৈর্য ধারণ করলে হয়ত এত বড় ব্যাপার ঘটত না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ও ঐ রকম কথা। জার্মানির হিটলার ধৈর্য ধারণ না করে পোলাণ্ড আক্রমণ করলেন, সমগ্র পৃথিবীতে আগুন ছড়িয়ে পড়ল। একপক্ষে জার্মানি, ইটালি, জাপান অপর পক্ষে পাঁচ শক্তি বৃটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া, চীন ও আমেরিকা। ফল কি হয়েছিল তা উপরে বলেছি।

এ বারে বড় কথা বাদ দিয়ে ছোট ছোট ঘটনার কথা বলি। একটি গৃহস্থের ঘরে কয়েক জন বাস করেন। নানা কারণে মতভেদ বা ক্ষোভ দুঃখ হতেও পারে কিন্তু লোকদের মধ্যে যদি ধৈর্য থাকে সামান্য চেষ্টায় শান্তি এসে যেতে পারে। না হলে নাটকীয় পরিস্থিতি ঘটে যায়। লেখকেরা হয়ত তাই নিয়ে কাব্য নাটক তৈয়ার করে হাজার হাজার টাকা আয় করে নিতে পারেন। মানুষের পরীক্ষার জন্য ভগবান অনেক রকম চক্র করে রেখেছেন। অস্থির হলে বা ধৈর্য হারালে চলবে কেন? রবিবার [১১.৮.৮৫] বিকালে দেখা গেল মহিষাদলের দক্ষিণে চাঁপী গ্রামে মোটর বাস যেখানে থামে সেখানে এক মহিলার মৃতদেহ দেখবার জন্য বহুলোক জড় হয়েছেন।

তিনি আগের দিন বাড়ীতে ঝগড়া করে হাইরোডে চলন্ত গাড়ীর সামনে প্রাণ বিসর্জন করেছেন। মহিষাদলের উত্তরে ট্রেন লাইনে কোন কোন পুরুষ মহিলা প্রাণ দেন—বিষপানে আত্মহত্যা করে কত ছেলে মেয়ে। এ সবের মূলে আছে ঐ অধীরতা। একটু ধৈর্য ধারণ করলে হয়ত এই রকম করুণ ব্যাপার ঘটত না। সংসার বেশ কঠিন জায়গা—এখানে কেবল সুখ নাই দুঃখ আছে—বলতে পারি দুঃখ কষ্টের সাগর আছে। তার মধ্য দিয়েই জীবন তরী বয়ে যেতে হবে। একটু ধৈর্য ধারণ করে দেখুন, নিশ্চয় সংকট কেটে যাবে। আর যদি অধীর হয়ে পড়েন কেউ আপনার জন্য কেয়ার করবে না। এই ধ্রুব সত্যকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না যে মানুষ একা এসেছে—একাই যাবে সুতরাং একটু ধৈর্য ধারণ করে চলা সকলের দরকার। নির্দেশ বা উপদেশের কোন এক্তিয়ার আমাদের নাই, দেশ বিদেশের অবস্থা লক্ষ্য করে ঐরূপ লিখতে বাধ্য হয়েছি।

ইঙ্গিত বুঝতে হয়

একজন লোক এক তেলীর বাড়ী শাবল চাইতে যায়। তেলী বললে—শাবল পাবেন না—সরিষা পোরা আছে। লোকটি বললে, তা কি করে হবে। তেলী বললে—ওটা বুঝে নিতে হয়। দেবনা বললে কি ভাল হত?

সংসারে চলতে গেলে ইঙ্গিত বুঝতে হয়। আপনি দেখলেন রাস্তার ধারে একটা সাইকেল টায়ার ঝুলছে—বুঝলেন নিশ্চয় সেটা সাইকেল মেরামতের দোকান। পথে যেতে দেখলেন এক ভদ্রলোক গলায় ষ্টেথস্কোপ। বুঝলেন তিনি ডাক্তার, সেই মত ছোট কাঠের বা টিনের বাক্স হাতে দেখলে নাপিতকে চিনতে পারেন। উত্তরের বাতাস জোর আসছে—বুঝলেন শীত জোর পড়বে। এই রকম অনেক জিনিসের কথা সোজা বুঝতে পারা যায়। কিন্তু ব্যাপারটা অত সোজা নয়।

তেরপেখিয়া বাজারে অনেকদিন আগে এক দোকানদার ছিলেন, তিনি খদ্দের আসতে দেখলে হাঁচতে সুরু করতেন। উদ্দেশ্য তাঁর দোকানের লঙ্কা যে ভারী তেজী সেটা ইঙ্গিত করা। তেমনি খবরের কাগজে বা রেডিওতে একটা খবর বেরোল, পরদিন আবার অন্যরূপে বা অন্যভাষায় সেটাই বেরোল, বিবিধ ভারতীতে একটা নাটক হল—তার মধ্যে এক জায়গায় একজনের মুখে একটা শাড়ী বা সুগন্ধির খ্যাতি বলান হল, আসলে ইঙ্গিত মালের কাটতি বাড়ান। একজন মোটর বাসের মধ্যে উঠেই দাঁতের ব্যারামের কথা—যন্ত্রণার কথা বলতে লাগল—আসল উদ্দেশ্য তার কাছে মাজন কিনুন—একজন বিক্রেতা নিজের হাত কেটে তাতে মলম লাগিয়ে দেখাতেন কাটা কেমন জুড়ে যায়—কেউ হাট বাজারে পাশে ডুগডুগি বাজিয়ে ম্যাজিক দেখাতে লেগে গেল—উদ্দেশ্য ঔষধ বিক্রী করা বা মাদুলি দেওয়া।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার ঘটে যখন অনেক দূর দিয়ে কেউ চাল দেয়। যেমন দাবা

খেলার ঘোড়া কোন পাশে যে আড়াই ঘর লাফাবে তা সহজে বোঝা যায় না। সরকারী চাল সব্‌সে মোক্ষম ধরা বড় কঠিন। বাইরে জনহিতে অশ্রুবর্ষণ হচ্ছে ভিতরে ভোট পাবার ধান্দা আছে। কাগজের দাম বেড়ে যাচ্ছে, বই খাতার দাম বাড়িয়ে দেওয়া হল—সরকার বিনামূল্যে বই দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন—শতকরা তিরিশ খানা বইও সময়ে এলনা। আসল ইঙ্গিত শিক্ষা সঙ্কোচ কর নচেৎ লেখাপড়া জানা লোক বেশী হলে বেকার হয়ে চাকরীর জন্য জ্বালাতন করবে। কিন্তু ইঙ্গিত যে বুঝতে পারে, সে বুঝতে পারে কেন লক্ষ লক্ষ ফুটবল ভলিবল গ্রামে গ্রামে বিলি করা হবে। বুড়োদের ভাতা দাও, বিধবাদের খোরাক দাও—খোঁড়াদের সাহায্য কর, ইঙ্গিত সরকারের ভাবমূর্ত্তি উজ্জ্বল কর—আগামী দিনের পাথেয় সঞ্চয় কর। ইঙ্গিতজ্ঞ ব্যক্তি বোঝেন যে অঞ্চলে একজন মাত্র বিধবা ভাতা পায় চারজন বৃদ্ধ সাহায্য পায়, শত বিধবা দরখাস্ত নিয়ে দৌড়ায়, তখন ভিতরের কথা বুঝতে বাকী থাকে না।

তাই আবেদন, যাঁরা দেশের প্রকৃত মঙ্গল চান তাঁরা ইঙ্গিত বুঝে পথ ঠিক করে চলবেন—দেশকে বিভ্রান্তির হাত থেকে রক্ষা করবেন।

একদিকে দুটি চোখ

ইচ্ছাময় ভগবান ইচ্ছা করেই আমাদের দুটি চোখ সামনের দিকে দিয়েছেন। যদি তিনি একটা চোখ সামনে ও আর একটা পিছনে দিতেন তবে বোধহয় আমাদের সুবিধা হত। অবশ্য তিনি যত রকম ছোট বড় সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে মানব দেহ যে সব চেয়ে আশ্চর্যজনক একথা আর কেউ না বুঝে ডাক্তারবাবুরা জানেন। সুতরাং তাঁর পক্ষে সামনে ও পিছনে চোখ তিনি দিতেও পারতেন।

যে জন্য এই বিষয়ের কথা তুলছি তা এই যে সত্যিই আমরা সামনে যত টুকু দেখতে পাই তার দ্বারা অনেক ভ্রমের মধ্যে আমরা পড়ে যাই। পিছনে কি ঘটছে তা দেখতে পাই না কেননা যারা দেখাবার কর্ত্তা তারা পর্দার উপরে যে ছবির ছায়া ফেলে আমরা সেইটুকু মাত্র দেখতে পাই। পিছনে বা গোপনে তলে তলে যে কি মতলব আছে তা বুঝতে পারি না। আমরা মনে করি যা দেখান হচ্ছে তাই বুঝি সত্য। অদৃষ্ট বলে কথাটা তাই এসেছে।

ধর্মনীতি বা রাজনীতির মধ্যে যে সকল গোপন তত্ত্ব ও তথ্য থাকে তার একটা দিকই আমরা দেখতে পাই—মঞ্চের উপরে বা পুথিপত্রের মধ্যেও তারই প্রকাশ দেখে আমরা করতালি দিই। কিন্তু পিছনে যে ষড়যন্ত্র, কুটিল মতলব আছে তা বোঝে কার সাধ্য। তাই বলছি ভগবান যদি আমাদের পিছনে চোখ দিতেন তাহলে আমাদের আত্মরক্ষার সুবিধা হত। আমাদিগকে মোহিত করে সর্বনাশের দিকে কেউ নিয়ে যেতে কেউ পারত না।

তথাপি বলব ভগবান দয়াময় কৃপাময়। তিনি মানুষকে সব কথা জানতে না দিয়ে বোধহয় তাদের রক্ষা করেছেন।

হত্যাকারী আমার পিছনেই আছে—আমার সঙ্গেই আছে অথচ আমি বুঝতে পারলাম না। সুযোগ বুঝে সে আঘাত করল। আমার শেষ হয়ে গেল। শত গোয়েন্দা, সেনাবল, প্রহরীদলও আমাকে রক্ষা করতে পারলনা। নিজেদের স্বার্থের জন্য জনগণকে আড়ম্বর করে বোঝান হল যে আমার পেছনে এস—তোমাদের মোক্ষলাভ হবে। আমাদের দৃষ্টি কেবল সামনে—পিছনে কিছু দেখতে পেলাম না। ভগবান যে বুদ্ধিটা দিয়েছিলেন তা কোন কাজে লাগালাম না সুতরাং ভ্রম এসে আমাদের আচ্ছন্ন করল।

আবেদন করি ভগবান আমাদের যেটুকু বুদ্ধি দিয়েছেন তাকে কাজে লাগিয়ে আমরা সত্য পথ নির্ণয় করে যেন চলি—কোনোরকম প্রচারে বিভ্রান্ত না হই।

সময় কাটান বড় দায়

এখনকার দিনে বেঁচে থাকার জন্য মানুষকে বড় ব্যস্ত থাকতে হয়—অনেকের দুটো কথা বলার সময় থাকে না। আবার যাদের যন্ত্রের সঙ্গে কাজ তাদের ত এক মিনিট অন্য দিকে মন দেওয়ার অবসর নাই—বিপদ ঘটতে পারে। তাঁরা বুঝতে পারবেন না হাতে কোনো কাজ না থাকলে সময় কাটান কত কষ্টকর।

মানবজাতির কর্ম তিনরকম—কর্ম, বিকর্ম, এবং অকর্ম—এই তিন অবস্থা বুঝে চলবার জন্য গীতায় উপদেশ আছে। ওখানেই বলা আছে যিনি কর্মের মধ্যে অকর্ম ও অকর্মের মধ্যে কর্ম দেখেন তিনিই বুদ্ধিমান। এত কঠিন বিচারে না গিয়ে আমরা সোজা যা দেখছি তার কথা কিছু চিন্তা করি।

যাদের অবসর আছে বা যাঁরা ফাঁক পেয়েছেন কোনোক্রমে দু-চারজন জুটে গেলে তাস, পাশা ইত্যাদিতে সময় কাটান, বিকালবেলার দিকে এমন যোগ প্রায় লেগে যায়, কিছু দর্শকও সময় কাটাবার এই সুযোগ ছাড়েন না। সেদিন মাইকে ঘোষণা শুনি তাস খেলার ম্যাচ হবে—পুরস্কার দেওয়া হবে। অনেক রকম খেলার ব্যবস্থাও হয়েছে—তাতে ছেলেদের ব্যায়াম হয়—স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। কিন্তু পিঁপড়ে জানে গুড়ের সন্ধান। সময় কাটাবার সুবিধা করে দেওয়া তথা ভ্রমণাদির আনন্দ লাভের যোগাড় দিয়ে কেমন করে পয়সা আয় করা যায় তারও উকিল আছে, দালাল আছে। আসল কথা সময় কাটতে চায় না যখন, তখন ঝগড়া মারামারি দাঙ্গা না করে [যেমন ছোট ছেলেরা কারণে অকারণে করে থাকে] একটু সভ্য রকমে সময়টা যদি কাটাতে পারি, তবে এই অকর্মের দুঃখটা যায়। মধু অভাবে গুড়ং দদ্যাৎ এই প্রবাদ সকলে জানেন।

এই এক চক্রে পড়ে সন্ধ্যার পর, কখনও বা বিকাল বেলা কত রকম সার্কাস,

থিয়েটার সিনেমা, নাচ, গান কত কিছু উপলক্ষে প্রতিদিন আমরা লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করছি, অনেকে নেশাটা জমাবার জন্য বহু রকমের মাদক আমদানিও করছি এবং পিছনের দিকে এক বারও তাকাইনা। তুলসী দাস বলেছেন—এক যাঁহা যাতা হ্যায় সব যাতা হ্যায় ওহি বাট।

রেডিওতে সেদিন শুনলাম এখনকার খেলোয়াড়েরা নাকি বেশীর ভাগই মাদক সেবন করে খেলার মাঠে নামে। আগে এমন কথা শুনিনি।

এই স্রোতের সামনে কে দাঁড়াতে পারে, এই তরঙ্গ যে রুখতে যাবে তাকে সবাই পাগল বলে উড়িয়ে দিবে। মানোয়ারী জাহাজের সামনে জেলে ডিঙ্গী ডুবে যাবে।

যোগী, সন্ন্যাসী ও ভক্তগণ ভগবৎ চিন্তায় সময় কাটাতে পারেন। আমরা সকলে তেমন হতে পারি না, তবু নিবেদন করি যাঁরা সময় কাটাতে অসুবিধা বোধ করেন তাঁরা আন্তরিকভাবে মানব সেবার কাজে লেগে যান—দেশের দুঃখীদের কথা একটু ভাবুন আর ভগবানের কাছে তাদের জন্য দয়া প্রার্থনা করুন। এতে আপনাদের সময় বেশ কেটে যাবে।

লটারী-লটারী-লটারী

আজকাল লটারীর চলন এত বেশী হয়েছে যে এর পরিচয় দেওয়ার দরকার নেই। কত রকমের কত জায়গার ছোট বড় ভাগ্য পরীক্ষা চলছে তার ঠিক নেই। এই রকম ছোট ছোট খেলার বিচিত্রতা এমন যে আমাদের ছেলেদের উদ্ভাবনী কৌশলের তারিফ করতে হয়। কোন কোন পাঠক জানতে চান এইসবের গোড়ার কথা এবং এতে ভাল মন্দ কতটা হচ্ছে।

আমরা যতদূর জানি কলিকাতার টাউনহল লটারীর পয়সায় হয়েছিল। সেকালে ইংরেজ সাহেবরা এই টাকা সংগ্রহের জন্য এই এক অভিনব পদ্ধতি চালু করলেন। যত টাকা টিকিট বিক্রী করে পাওয়া গেল তার মধ্যে কিছু কিছু পুরস্কার দিয়ে বাকী টাকা সাধারণের হিতার্থ উক্ত বাড়ী নির্মাণে খরচ করা হয়।

নানা প্রকার জুয়া খেলা এ দেশে বহুদিন থেকে চলিত আছে—আইনে সেগুলি নিষিদ্ধ আছে—পুলিশও তৎপর আছেন কিন্তু তাদের প্রচলন বন্ধ হয়েছে বলে মনে হয় না—এখনও অনেক জায়গার জুয়াড়ীরা ধরা পড়ছে খবর মিলে। অনেকের মনে হয় লটারীও এক রকম জুয়া খেলা সুতরাং মন্দ। আবার অনেকে বলেন সংসারে ভাগ্য পরীক্ষা ত সকলের চলছে তার মধ্যে এটাও এক রকম হলে দোষ কি?

কথাটা একটু বুঝে দেখতে হয়। আইন কর্ত্তারা যত আইন করেছেন তার প্রত্যেক আইনের গোড়ায় কিছু কথা থাকে। কেন আইন হল—কিভাবে তা কার্যকর হবে বা তার জন্য কার্যবিধি ও নিয়মাবলী এ সব ঠিক না হলে কোন আইন চালু হয় না। তখন ঐরকম আইন কেবল কাগজে লেখাই থাকে।

আইন কর্তাদের মূল উদ্দেশ্য কি? একজন যাতে অন্য কোন লোককে ঠকাতে না পারে বা অন্যরূপ ক্ষতি করতে না পারে সেজন্য তাঁরা আইন করেন। কিন্তু মানুষের স্বভাব এমন হয়েছে যে কি করে অপরকে প্রতারিত করা যায় তার চেষ্টা সে করে থাকে—নীতিকে সে এড়িয়ে যায় স্বার্থের জন্য। ছোটবেলা থেকেই ছেলেরা যদি ঐরকম অভ্যাস করে এবং কোনো রকম বাধা না পায় বা নিন্দিত না হয় তাহলে মানুষ বেশ সহজেই নীতিহীন পথে এগিয়ে যায়। মানুষের মাথা ভারী উর্বর—একে আরও তেজী করতে এমোনিয়া, ইউরিয়া, পটাশ বা ফসফেট লাগে না। মানুষের যত রিপু আছে তার মধ্যে লোভ প্রধান। যে একবার এর কবলে পড়েছে তার বুদ্ধি জ্ঞান সবই আচ্ছন্ন হয়ে যায় সে দিনরাত ঘোর অস্বস্তির মধ্যেই কাটায়—সাধুগণ তাই লোভকে সংযত করতে বলেন। লোককে প্রলোভনে ফেলে দেওয়া নিশ্চয়ই অপরাধ অথচ অগণ্য লোকে তাই করে যাচ্ছে।

স্বামী বিবেকানন্দ ও হরি মহারাজ [স্বামী তুরিয়ানন্দ] যখন আমেরিকায় ছিলেন তখন একদিন হরি মহারাজ তাঁর ঘড়ি টেবিলে ফেলে রাখেন। স্বামীজী এ নিয়ে অনুযোগ করে বলেন—হরি ভাই, তুমি সকলকে ভাল মনে কর কিন্তু কোন লোককে প্রলোভনে ফেলার তোমার কি অধিকার আছে? এখন আমরা দেখছি একশত লোকের কাছে টাকা নিয়ে একজনকে তা ভাগ্য লটারীর নামে দেওয়া হচ্ছে। আমরা অন্যদিক দিয়ে বলি নিরানব্বই লোকের চোখের জলে একজনের গলায় সোনার হার পরান হচ্ছে, দোহাই দিচ্ছি ভাগ্যের—ভগবানের। ভগবান কি সত্যই এই রকম ব্যবহার পছন্দ করবেন?

দেশবাসীকে একটা কথা বিবেচনা করতে আবেদন করি। বর্ত্তমান সভ্যতাকে রক্ষা করতে হলে সমাজ থেকে ন্যায়নীতি বর্জন করা চলবে না। আইন বেশীদূর যেতে পারে না। মানুষই মানুষকে বাঁচাতে পারে। তেমন মানুষ কি জাগবে না? গণমতের বিশাল তরঙ্গের মধ্যে আমাদের ক্ষীণ কণ্ঠ কি ডুবে যাবে?

যাত্রার আসর

এখন ব্যাপার যা চলছে তাকে যাত্রার আসরের সঙ্গে তুলনা করা যায়। আমরা দর্শকগণ আশা করে থাকি কখন দুজন বা দুদল যোদ্ধা ঢাল তরোয়াল প্রভৃতি নিয়ে আসরে অবতীর্ণ হবেন এবং পরস্পরে ঘোর লম্ফ ঝম্প লাগিয়ে দিবেন। প্রত্যহ সকালে যখন দৈনিক কাগজ আসে, সকলে বড় বড় অক্ষরে কি লিখেছে দেখবার জন্য ঝুঁকে পড়েন। কোথায় লড়াই কেমন চলছে কোন কোন রথী মহারথীর পতন বা উত্থান হল সেই খবরের দিকেই সকলের মন। সংবাদপত্র যথাসাধ্য চেষ্টা করে খবর যোগাড় করে দেন। এগুলি যে জানা দরকার তা আমরা সকলেই বুঝি। তাছাড়া আমরা আরও অনেক জিনিস চাই—দেশের লোকের সুখ দুঃখের কথা কিছু শুনতে

চাই। কোথায় বাস উলটালো, ট্রেন লাইনচ্যুত হল সবই জানতে আমাদের কৌতূহলের সীমা নাই।

সরকার কি করছেন—দুষ্ট দমন ও শিষ্ট পালন কতটা হচ্ছে তার দিকে পাঠক সাধারণের লক্ষ্য বরাবর আছে তবু আমরা বলব, হে বীর যোদ্ধাগণ তোমরা লক্ষ্যপথ থেকে দূরে সরে যাচ্ছ—যাত্রার আসরে দেশের অবস্থা ঠিক প্রতিফলিত হচ্ছে না। কোন্ দল কতটা ক্ষমতা লাভ করছে সেদিকেই সবার লক্ষ্য—তার মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের রূপায়ণ চাই। গরিবি হঠাতে হবে, নিরক্ষরতা দূর করতে হবে, স্বাস্থ্য বিধান কতটা হচ্ছে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

বার বার ঘোষণা হচ্ছে এখানে এত কোটী ওখানে অত লক্ষ বরাদ্দ হয়েছে—আজ শুনলে আমাদের ভাবনা বেড়ে যায়। সরকারের টাকা আয় হয় নানা পথে—তাছাড়া দেশ থেকে ও বিদেশ থেকে দেনা করা হয়। আমরা বলি টাকা খরচ করলেই কি প্রজাসাধারণের উন্নতি হবে বা সুখ বিধান হবে? জনগণের অংশ গ্রহণের কথাও আলোচনা হয়—উন্নয়ন প্রকল্প, গণমাধ্যম, জনগণ প্রভৃতি ভাষার আড়ম্বরও শোনা যায়। জনগণ কতটা যোগ্য—তারা কতটা শিক্ষিত সেটা ভেবে দেখা হয় কি? মোট জন সংখ্যার শতকরা কত অংশ লেখাপড়া জানে, মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার হার কত—বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার বিস্তার কতটা হয়েছে সে কথা যখন ভাবি তখন মনে হয় যাত্রার আসর আমাদের তেমন খুশী করতে পারছে না। যুদ্ধ করার আগে সেনাদের তালিম করতে হয়—ভাল শিক্ষিত সেনাদল না হলে যুদ্ধ জয় হয় না একথা সকলেই বোঝেন। একটা স্বাধীন জাতি উন্নয়নের পথে শত বাধা-বিপত্তির বিরুদ্ধে মার্চ করছে অথচ তার যুব শক্তি আর নারীশক্তি কোন পথে চলেছে। খেলার মাঠে, টেলিভিসনে, সাজসজ্জায়, প্রসাধনে তারা মেতে আছে। কঠোর সৈনিক জীবন তাদের চাই—এ কথা কি আমরা চিন্তা করছি? অন্য দেশের তুলনায় প্রাথমিক শিক্ষায় আমরা কোথায়? যে দু দশটা ছেলেমেয়ে প্রতিভাবান তাঁরা বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে।

বক্তব্য খুব পরিষ্কার করতে পারা গেলনা, তবু আবেদন করি জাতি গঠনের কর্মসূচীর মধ্যে কোনটা আগে আর কোনটা পিছে তা সকলে ভেবে দেখবেন।

ভোটের জোর

এই দুনিয়ায় কার জোর বেশী—এ কথার উত্তরে যদি বলি—ভোটের জোর—বোধ হয় কেউ দুইমত করবেন না। ইউ. বোর্ড, পঞ্চায়েত থেকে বিধানসভা বা লোকসভা সর্বত্র ভোটের জয়জয়কার।

যেখানে আপাতদৃষ্টিতে দেখবেন ভোট দেখা যাচ্ছে না সেখানেও দেখবেন ফল্গুধারার মত তলে তলে ভোটের অর্থাৎ বহুজনের মতাধিক্যের প্রভাব আছেই। দৃষ্টান্ত দিয়ে যদি এসব দেখাতে চাই গোটা এক সপ্তাহের কাগজেও কুলোবে না।

তথাপি সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বলি—আপনি করিৎকর্মা বিজ্ঞব্যক্তি তাবলে যে আপনিই ভোট পাবেন এমন কিছু নয়। লোকের যদি খেয়াল না হয় বা অপরপক্ষের প্রচারও প্রলোভনের সঙ্গে আপনার স্বভাবসিদ্ধ ধীর কথা পাল্লা দিতে না পারে তাহলেই আপনি গেছেন আর কি! অপর পক্ষ যদি একটা ঢাক বাজায় আপনি জোড়া ঢাক মানত করুন। তারা জোড়া ঢাক জোগাড় করে আপনি জগঝম্প আনুন তবে ত টিকতে পারবেন। কোন্ পাড়ার কাকে ধরলে কিছু ভোট বাগান যাবে—কোথায় কোন্ সমিতি আছে তাদের পেটে দিলে পিঠে আপনার ভোটের ভার বইবে সে সব সন্ধান করুন অথবা বড় বড় ভারী ভারী দলের শরণাপন্ন হোন, তবে ত আপনি সভ্য হতে পারবেন? আজকাল জনকয়েক ভোটের জোরে ক্ষমতা দখল করছে অমনি সংখ্যালঘুদের হাজার আবেদন—ন্যায় বিচার, যুক্তি, কান্নাকাটি সবই ভেসে যাচ্ছে যথেচ্ছাচারিতার স্রোতে। কিন্তু খবরদার, তুমি একলা মানুষ বা দলে কম, তোমার কোন কথা না বলাই ভাল। তাঁরা বলেন, বেশী লোকে আমার দলে, তোমার মত যদি ভাল বেশী লোক তোমার দলে নাই কেন? আমার গ্রামে এক কর্তা ছিলেন, তাঁর বাড়ীতে একবার একটি ক্রিয়াকাণ্ডে তিনি কতকগুলি নিরীহ ব্রাহ্মণকে বাদ দেওয়ার কথায় বললাম আপনি পাঁচ পণ্ডিত চান—না একশত মূর্খের সঙ্গে চলবেন। তিনি বললেন—আমার একশত মূর্খই ভাল। তখন আমি বলি—তাহলে বলি রাজা কি ভাল কাজ করেন নি? তিনি বললেন আমাকে গাঁয়ে বাস করতে হবে আমি পণ্ডিত নিয়ে পাতালে যেতে চাইনে।

সুতরাং ভোটার ভাইদের জানাই ভোটের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ যাতে থাকে সেইদিকে লক্ষ্য রাখবেন। ভোট কথার অর্থ যে স্বাধীন মত প্রকাশ একথা সকলেই জানেন, কিন্তু ব্যবহার ক্ষেত্রে তার অপব্যবহার কুইনানের মতই সমাজের পক্ষে মারাত্মক। আমরা রাজশক্তিকে মুখে নাই হোক, অন্তর থেকে কদাচার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে শতকরা নিরানব্বই ভোট দিয়ে রেখেছি। তার ফলেই দণ্ডবিধি আইন সৃষ্টি হয়ে সমাজকে রক্ষা করছে। সুতরাং ভোটের মত জিনিসকে সামান্য ভেবে কেউ তাচ্ছিল্য করবেন না এবং দেশকে আপনি যত জিনিস দিতে পারেন তার মধ্যে এইটি সবচেয়ে মূল্যবান মনে করবেন, এই সময়োপযোগী কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আপাতত বিদায় হই :

ভোট বিচারের কথা নিম্বের সমান।
আখেরেতে হিতকর শুনে পুণ্যবান॥

পূজা ও বাদ্য বাজনা

পূজা হচ্ছে অথচ বাদ্য বাজনা নাই একথা কেউ ভাবতে পারবেন না। অথচ আদিম যুগে বেদ বেদান্তের মধ্যে ধ্যান ধারণাদির আভাস মিলে কিন্তু ঢাক, ঢোল, কাঁসর

ঘণ্টার কথা দেখিনা। পরবর্তী সময়ের কর্মকাণ্ড যাগযজ্ঞে হোম বলি প্রভৃতির কথা পাই—বাইবেলেও পশুবলি হোম করার কথা মিলে কিন্তু এখনকার দিনে যে রকম বাদ্য বাজনা হয় সেরকম কিছু মিলে না। এখনকার পূজার প্রথমেই বাজনার শোরগোল আমরা শুনতে পাই।

লোককে জানান যে দেবতার পূজা হচ্ছে এইরূপ মনে করা যায়। কিন্তু চিন্তা করলে মনে হয়—কেবল ঠাকুরকে নয়, ভক্তদেরও বিজ্ঞাপিত করা এত শব্দ করার প্রধান উদ্দেশ্য। পাঁচজনে জানুক, আমি পূজা করছি। ঠাকুর ত অন্তর্যামী তাঁকে মনে মনে বললেই পূজা হয়—তাঁর নানা গুণগান স্তবস্তুতি করে খুশি করার চেষ্টাও করা হয়। কিন্তু প্রবল শব্দ উৎপন্ন করে লম্ফঝম্প করে বাদ্য বাজনা করে পূজা অনুষ্ঠান এখনকার দিনে হয়ে থাকে। পূজার শেষে ঠাকুর যাবে বিসর্জন—তার বাজনার সমারোহ আরো বেশী হয়ে থাকে। সেখানেও এত আড়ম্বর করা হয় যে অনেক সময় পূজার আসরও ম্লান হয়ে পড়ে।

পূজা ব্যাপারটি রজোগুণের প্রকাশ—সত্ত্ব ও তমোগুণের প্রকাশও পূজাতে প্রকাশ পায়। কীর্তন করা, নমস্কার, প্রণামাদি করাও পূজার অঙ্গ। আমরা লক্ষ্য করছি, যেখানে কতক লোক মিলিত হয়ে কোনো দেবতার পূজা করেন, তাঁরা অনেক খরচ করেও বাদ্য বাজনার ব্যবস্থা করেন। আজকাল মাইকের ব্যবস্থা বোধহয় অনেক জায়গায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে—ঠাকুর অনেক পিছনে পড়ে গেছেন। তার উপরে উৎসবাদি ব্যাপারে মাইকে রেকর্ড বাজান হয়—সুরুচি কুরুচির বিচার নাই বললে চলে। কাজটা ঘোর তমোগুণের হয়—লোকে বড় বিরক্ত হয় কিন্তু তাদের কেউ গণ্য করেন না। তোমরা শোন বা না শোন আমরা শোনাবই। চীৎকারে আমাদের আনন্দ, বাধা পড়লে ভাল লাগে না। আমাদের অর্থ আমরা খরচ করে তোমাদের খুশী করবার মতলব করেছি—তোমরা যদি পছন্দ না কর আমরা কি সেজন্য বাজনা বন্ধ করে দেব? আমাদের একটা ছোট প্রার্থনা আছে—

গণতান্ত্রিক সমাজে যে যার মতলব মত চলতে পারেন তবে ঠাকুরদের নাম করে এই সব তান্ডব না করলেই ভাল হয় না কি? তাঁদের একটু মর্যাদা রক্ষা করলে বোধ হয় ভাল কাজই করা হবে। মানুষ সাধারণত সংসারের গোলমালে ভগবানকে ভুলে যায়। তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য সকালে সন্ধ্যায় কিঞ্চিত বাদ্য করার যে নিয়ম আছে তা আমরা আনন্দের সঙ্গে শ্রবণ করে থাকি।

মানুষের দাসত্ব

মানুষ কখনই স্বাধীন নয়, তাই তার সর্বদা চেষ্টা কি করে সে স্বাধীন হবে। খ্রিষ্টজন্মের বহু বৎসর আগেও দাসেরা বিদ্রোহ করত, প্রতিরোধ করত। রোম দেশে একবার তারা দেশ ছেড়ে যাবে বলে হুমকি দিল। মালিকরা নিজেদের বিপদ বুঝে রফা করলেন, অনেক অধিকার দিলেন।

কিন্তু সত্যই কি মানুষ স্বাধীন? লক্ষ্য করলে দেখি সে বহু বিষয়েই দাস। একে একে বলি :

প্রথমত মানুষ জন্ম থেকেই মাতা পিতা ও আত্মীয়ের উপর নির্ভরশীল। বহু জীব জন্মের পরেই অনন্য নির্ভর—তবে তারা মানুষ নয়, পশু, কীট বা সরীসৃপ। মানুষ অবস্থার দাস। এ থেকে তার পরিত্রাণ নাই। অনেকে গবেষণা করে মানুষের কল্যাণের জন্য কত উৎকট পন্থা দেখিয়েছেন—তার নাম ইজম্।

প্রসঙ্গত শরৎচন্দ্রের বৈঠকী গল্পের মধ্যে এক ব্রাহ্মণ সন্তানের কথা পাই। লোকটি অবস্থা বিপর্যয়ে ব্রহ্মদেশে রেঙ্গুন থেকে উত্তর ব্রহ্মে চলে যায়। সেখানে এক কসাই মুসলমানের বাড়ী আশ্রয় নিয়ে সে তার পরিবারভুক্ত হয় ও গোহত্যা করে—মাংস দোকান চালাতে থাকে। জন্মগত সংস্কার সে ছেড়ে দেয়। শরৎচন্দ্র বলেছেন—জন্মগত সংস্কার ও অবস্থার প্রভাব কোন্‌টি বড় তা নির্ণয় করা কঠিন। অঙ্গুলীমাল দস্যু বুদ্ধ-শিষ্য হয়েছিলেন, রত্নাকর বাল্মীকি হয়েছিলেন, এই সব পরিবর্তন দেখা যায়।

মানুষের দাসত্বের প্রমাণ সে অভ্যাসের দাস। আহার বিহারাদির যেমন অভ্যাস হয়ে যায় তা বদল করা বেশ কষ্টকর হয়। যারা ভোরে ওঠার অভ্যাস করে না, কোন দিন শীঘ্র শয্যাত্যাগ করতে তাদের কষ্ট হয়। খাদ্যের অভ্যাস বদলান ত আরও কষ্টকর। ভাত ছেড়ে রুটি আমাদের ধরতে হয়েছিল খাদ্য সংকটের সময়—প্রথমে বেশ অসুবিধা হয়েছিল পরে অভ্যাস হয়ে গেল। আহারে পোষাকে যার যেমন রুচি হয়ে যায় তা ছাড়া বেশ কষ্টকর। শোনা যায় জনৈক বড় নেতার এক বাক্স জামা ছিল। অন্য বিষয়ে তিনি খুবই সাধারণ ছিলেন।

আর এক বিষয়ে মানুষ ধর্ম সংস্কারের দাস। ধর্ম ত্যাগ করলেও পুরাতন ধর্মের কোনো কোনো সংস্কার ছাড়তে পারে না। বাংলাদেশের পশ্চিমাংশে এক গ্রামের এক মুসলমান জমিদারের কথা জানি। তাঁদের গ্রামে পুর্বপুরুষ থেকে গোহত্যা নিষেধ করা আছে। কয়েকদিন আগে একজন নব্য নেতা মন্দিরের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় হাত জোড় করে প্রণাম করে ফেলেছিলেন—এক খবরের কাগজে তার সমালোচনা করেছিল।

এমন অনেক সংস্কার আছে যে পাশ্চাত্য প্রথায় রুচিসম্পন্ন আধুনিক যুবকেরা পুরাতন সংস্কার যথা—গুরুজন সাক্ষাতে ধূমপান, প্রণাম, নমস্কার করে থাকেন। নিজেদের অজান্তেও তাঁরা পুরাতন অভ্যাসের দাস হয়ে পড়েন।

আর একরকম দাসত্ব মায়ার। মানুষ ভালই জানে যে পৃথিবীতে তার অবস্থান সীমিত তবু সে মনে করে তাকে কখনও যেতে হবে না। বকরূপী ধর্ম যুধিষ্ঠিরকে ঐরকম এক প্রশ্ন করায় ধর্মপুত্র এই আশ্চর্য ব্যাপার বলেছিলেন। এই মায়াকে অতিক্রম করা খুবই কঠিন কেবলমাত্র ঈশ্বর কৃপাতেই মানুষ তা করতে পারে। এই মায়া যদি একটি দিন ছেড়ে যায় সৃষ্টি নাশ হয়ে যাবে। মা ছেলেকে দেখবে না—বন্ধু বন্ধুকে চিনবে না—কেউ কারো জন্য শ্রম করবে না—কলকারখানা ব্যবসা বাণিজ্য সমস্তই অচল হয়ে যাবে। সুতরাং মায়ার বশে থাকতেই হয়।

মানুষ তবে যাবে কোথায়? জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস—মহাজন বাণী প্রমাণ করছে যে, ঈশ্বরের অধীনে যে থাকে ভগবানের ভক্ত, আল্লার বান্দা—তার দাসত্ব অবাঞ্ছিত ব্যাপার নয়। অর্জ্জুন ভাগ্যবান ছিলেন, বুদ্ধিমানও ছিলেন, বলেছিলেন—আমার মোহ নাশ হয়েছে।

সুতরাং মানুষের ভয় নাই—তার দাস জীবনের মধ্যেও অসামান্য মাধুর্য আছে। রামকৃষ্ণ বলেছেন, আমার অভিমান যখন যাবে না তখন দাস হয়ে থাকাই ভাল।

পঞ্চায়তের পঞ্চকথা

আজকাল পঞ্চায়তের কথা নিয়ে বেশ আলোচনা হচ্ছে। এতকাল পরে এই পুরাতন প্রতিষ্ঠানের উপর কেন সবার নজর এল তার অবশ্যই কারণ আছে। কিন্তু কোন জিনিস বুঝতে গেলে কিছু পুরাতন কথা জানতেই হয়। তাই এখন থেকে অন্তত সত্তর বছর আগে থেকে কিছু কথা আরম্ভ করি।

বৃটিশ আমলে আমাদের গ্রামে তখন একজন বা দেড়জন চৌকিদার ছিল অর্থাৎ কোন কোন চৌকিদার দুখানি গ্রামে গস্ত পেতেন। তখনকার পঞ্চায়েত তাদের মাহিনা যোগাতেন। মহিষাদল থানায় বারটি ইউনিয়ন বা গ্রামসমবায় ছিল। এখন সেই থানা ভেঙ্গে দুটি থানা হয়েছে—অঞ্চল হয়েছে তেইশটি—ব্লক দুটি ভাগ আগেই হয়েছিল। প্রতি ইউনিয়নে একজন প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েত ও চারজন সহকারী পঞ্চায়েত ছিলেন। এই ভদ্রলোকরা সার্কেল অফিসার নামক কর্মচারী দ্বারা মনোনীত হতেন। তিনি তিনটি থানা এলাকার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। সহকারী পঞ্চায়েতের মধ্যে একজন ট্যাক্স আদায় করতেন। তিনি তিনমাস বাদে একদিন থানায় গিয়ে চৌকিদারদের মাহিনা মিটিয়ে দিতেন। জন্ম মৃত্যুর হিসাব দিতেন ও গ্রামে কিভাবে রাত্রে পাহারা দিতে হবে তার ট্রেনিং পেতেন। গভীর রাতে ঘোর নীল রংএর পোষাক পরে একটি বল্লম হাতে চৌকিদার কি রকম ডাক ছাড়বেন তা থানাতেই শিখিয়ে দেওয়া হত। দফাদারের পোষাক ও পাগড়ী অন্য রং-এর ছিল। তিনি হেড চৌকিদার ছিলেন—এক টাকা মাহিনা বেশী পেতেন।

যখন আমাদের জেলায় ইউনিয়ন বোর্ড হবে স্থির হল তখন অন্যান্য বহুজেলায় ষোল বছর ইউ. বোর্ড চলছে। ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইনে ১৩টি সংস্কার হয়। সেইমত ১৯৩৭ সালে মাননীয় শের-এ বঙ্গাল ফজলুল হক সাহেব বঙ্গদেশের আটাশটি জেলা নিয়ে মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করলেন। তাঁর উপাধি ছিল প্রধানমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী শব্দটি পরে আমদানি হয়।

পঞ্চায়েত বুঝতে গেলে আগে ইউনিয়ন বুঝতে হয়। যখন ইউনিয়ন বোর্ড হবে ঠিক হল তখন প্রতি ইউনিয়নকে তিনটি করে ওয়ার্ডে ভাগ করা হল। প্রতি ভাগ থেকে দুজন করে মেম্বার নির্বাচিত হতেন। সরকার ঐ এলাকা থেকেই তিনজন

মনোনীত সদস্য দিতেন। মোট ৯ জন নিয়ে ইউ. বোর্ড হত। গোপন ভোট ছিল না। সকলে ভোট দিতে পারত না। সামনে দাঁড়িয়ে প্রার্থীর নাম বলে ভোট লেখাতে হত। তখনই গণনা শেষে ফল প্রকাশ হত। পরবর্তী সময়ে মনোনয়ন উঠে যায়—নয়জন সদস্যই নির্বাচিত হতেন। ট্যাক্স আদায়ের ভার অন্যলোকের হাতে দেওয়া হয়। তিনি কমিশন পেতেন। চৌকিদাররা বোর্ড অফিসেই প্রতি মাসে মাহিনা পেতেন। বোধহয় পাঁচ টাকার বেশী মাহিনা ছিল না। সাধারণের কাজ অর্থাৎ গ্রামের রাস্তাঘাট সংস্কার, পানীয় জল ব্যবস্থা করা হত ট্যাক্স বৃদ্ধি করে। জিলা বোর্ড কিছু সাহায্য দিতেন। তখন টাকার মূল্য ছিল, সুতরাং মানুষেরও দাম ছিল! ফজলুল হক সাহেব পঞ্চায়েতের বাইরে প্রজাবর্গের ঋণ সালিশের জন্য একটি মনোনীত প্রতিষ্ঠান করেন। সেই সালিশ বোর্ড ১৯৩৮ থেকে ১৯৪৪ পর্যন্ত চলেছিল। প্রজাদের অনেকে ঋণভার থেকে মুক্ত হন। ইউ. বোর্ড আমলের শেষ দশবছর ইউনিয়ন বোর্ড কোর্ট নামে বিচার ব্যবস্থা হলে তার নাম হয় ন্যায় পঞ্চায়েত—যা এপর্যন্ত নামেই আছে। শুধু তাই নয়, জেলা দায়রা আদালতে জুরি প্রথা ও লোপ পেয়েছে। আমরা স্বাধীন ভারতে কেমন আছি তার বর্ণনা অনাবশ্যক। এখন গণতন্ত্রের যুগ। গণনেতাগণ যেমন চালাবেন তেমনই সমাজ চলবে। আমাদের কেবল কর্মে অধিকার, ফলে নাই। সুতরাং আমরা বেশ আছি।

১৮৮৫ সালে জিলাবোর্ড হয়—১৯১৯ সালে ইউ. বোর্ড হয়। [আমাদের দিকে ১৬ বছর পরে]। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হয়। বিদেশী শাসকেরা অনেক বিলম্বে হলেও স্বাধীনতা দিয়েছিল। আইনের আশ্রয় যৎ কিঞ্চিৎ ছিল। স্বাধীনভারতে স্বায়ত্বশাসন কথা অর্থহীন। এখন মাৎস্যন্যায় আমাদের প্রাণ। লিগাল এড বলে একটা কথা শোনা যায়। লঙ্কা গেলে সোনা সস্তা হতে পারে। সকলে সমুদ্র লঙ্ঘন করতে পারে না। আইনের আশ্রয় পেতে পারি যদি টাকা থাকে। গরিবের আবার অধিকার কি? গণবিচার এখন অগত্যা চালু হয়েছে। গঙ্গাসাগরের নৌকা হুগলীমোহনার দিকে যাচ্ছে। কোথায় পৌঁছাবে তা ভবিতব্যই জানেন।

সমবায় ও পঞ্চায়েত

মহাত্মা গান্ধী আমাদিগকে স্বরাজ স্থাপনের জন্য যে সকল উপদেশ সূত্রাকারে দিয়াছিলেন তাহার মধ্যে পঞ্চায়ত ও সমবায়ের স্থান সর্বাগ্রে ছিল এরূপ বিশ্বাস আমাদের ছিল। যে শ্রেণীহীন শোষণহীন সমাজ তাঁহার স্বপ্নের ভারত ছিল তাহার গঠনে এই দুইটি প্রতিষ্ঠানই এখনও তাহার অনুগামীগণের আদর্শ। তবে স্বাধীনতা প্রাপ্তির উন্মাদনা আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। স্বাধীনতা কাহার, কিসের ও কোন্ কোন্ ব্যাপারে তাহার সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশে ইহার ব্যাখ্যাই বা কিরূপ তাহার তেমন সন্ধান না করায় যে যাহার

নিজস্ব মতে সমাজ বিবর্তন চাহিয়াছেন। অনেকে কেবল কারুণ্যবশত দরিদ্র নিঃস্বগণের দিকেই দৃষ্টিপাত করিয়াছেন—পৃথিবীতে অন্যরূপ লোকও আছেন এবং সমাজ সংরক্ষণে তাহাদের প্রয়োজনও আছে এ কথা তাঁহারা ভুলিয়া যান। পঞ্চায়ত ও সমবায় দুইটি শব্দই প্রকাশ করে মানুষ একক প্রচেষ্টায় কিছু করিতে পারে না এবং তাহাকে বাঁচিতে হইলে সমবেত প্রচেষ্টাই আবশ্যক। ইহাতে দুই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়—শোষণের সম্ভাবনা থাকে না—এবং ঈর্ষা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা হ্রাস পায়।

স্বর্গত পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুজী পঞ্চায়ত প্রবর্তনের পূর্বে বলিয়াছিলেন প্রতি গ্রামে তিনটি অত্যাবশ্যক প্রতিষ্ঠান থাকিবে—(১) প্রশাসনের জন্য-পঞ্চায়ত (২) শিক্ষার জন্য একটি স্কুল (৩) আর্থিক ব্যাপারের জন্য একটি ব্যাঙ্ক। এমন আভাস ছিল যে পঞ্চায়ত সরকারের নিম্নতম স্তর হইবে। [Lowest unit of Govt.] সমবায় কৃষির চারিটি ধারা ও তিনি উল্লেখ করেন। স্কুলটি জুনিয়র হাই হইবে এমন কথা ছিল। গ্রাম বলিতে আমরা বুঝিতাম কতকগুলি পল্লীসমষ্টি। সমবায়ের সহিত পঞ্চায়তের সম্পর্ক কিরূপ হইবে তাহা কেহ চিন্তা করেন নাই—সকলেই আশা করিতেছিলেন স্বরাজ বোধহয় সমাগত।

দিন গত হইতে লাগিল—অন্যান্য রাজ্যে পঞ্চায়ত স্থাপিত হইল—সমবায় পূর্ব হইতে ছিল কিন্তু পঞ্চায়তের সহিত তাহার কোন যোগ হইল না। পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়ন ব্লক স্থাপনের পরে ১৯৬৪ সালে ইউনিয়ন বোর্ডের বদলে পঞ্চায়ত বসিল। ব্লক অফিসের দুইটি ঘরে পঞ্চায়ত ও সমবায় বিভাগের দুইজন অফিসার বসিলেন। তাঁহাদের মধ্যে তেমন কোন যোগাযোগ দেখা যায় না। এখন কথা উঠিয়াছে পঞ্চায়ত সাহায্যে সমবায়ের উন্নতি ও প্রসার কিরূপ হইতে পারে।

সমবায়কে প্রসারিত করিলে দেশের উন্নতি হইবে এই ধারণার মূল অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, ব্যক্তিগত মালিকানায় যে সকল বাণিজ্য ব্যাপার চলে তাহাতে ক্রেতা সাধারণের স্বার্থ বজায় থাকে না এবং সর্বদা বঞ্চিত হইবার আশঙ্কা থাকে। কোম্পানী ব্যাপারেও ক্রেতাগণ সর্বদাই মুনাফার শিকার হইবার সম্ভাবনা আছে মনে করেন। অবশ্য কালের পরিবর্তনে এরূপ হইয়াছে। ব্যবসা বানিজ্যে আদিম কাল হইতে ব্যক্তি মালিক রহিয়াছেন এবং তাঁহারা শ্রেষ্ঠী, শেঠজী, বণিক, বেনিয়া, ব্যবসায়ী, ব্যাপারী প্রভৃতি নামে অভিহিত হইতেন। এখন তাঁহাদের নাম দোকানদার হইয়াছে—গদীয়ানও বলে। একদিন যাঁহারা রাজা মহারাজা সম্রাট হইতে দীনতম প্রজারও বিশ্বস্ত আশ্রয় ছিলেন আজ তাঁহারা মুনাফাকারী একটি গোষ্ঠী হইতেছেন। সুযোগ পাইলেই সুকৌশলে দেশের নিরীহ প্রজাগণের লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী টাকা ব্যবসায়ের নামে দিবসে লুণ্ঠন করিতেছেন। সুতরাং বঞ্চিত মানব সমাজ আত্মরক্ষার জন্য সমবায় গঠন করিয়া নিজেদের স্বার্থ ও সুবিধা সংরক্ষণের প্রয়াস পাইতেছেন। যে পঞ্চায়ত সাহায্যে সমবায় প্রসার কল্পিত হইয়াছে তাহা প্রধানত গ্রামপঞ্চায়ত। এখন এই প্রতিষ্ঠান যেভাবে গঠিত হইয়াছে তাহাতে কতকগুলি পল্লী যদিও একটি এলাকা হইয়াছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাদের পৃথক অস্তিত্ব ও গ্রাম কর্তৃত্ব বজায়

রাখিয়া চলিতেছে। পূর্বাপর প্রথা এমন চলিয়া আসিতেছে যে ভৌগোলিক সংস্থান মান্য করিয়া পল্লীগুলি চলে—পৃথকভাব ত্যাগ করিয়া অর্থনীতি বা সমাজনীতিকে একত্র পরিচালনা করে না।

সুতরাং বর্তমান পঞ্চায়ত সদস্যগণ প্রকৃতপক্ষে ভিন্ন ভিন্ন পল্লীর প্রতিনিধি—তাঁহাদের দৌড় ঐ পর্যন্ত। ফলে সমবায় প্রতিষ্ঠান পরিচালন কোনোরূপে চলিতেছে বটে কিন্তু পঞ্চায়তের সহিত তাহার কোনো যোগ নাই। লোকে দায়ে পড়িয়া ঋণের জন্য সমিতিতে আসে—সমবায়ের আদর্শে দেশের উন্নতি সাধনের জন্য আসে না। তাই মনে হয় পঞ্চায়তকে সমবায়ে জড়িত করিয়া কোনো উন্নতি লাভ সহজ হইবে মনে হয় না।

উড়িষ্যার অতিদূর মফঃস্বলে কিন্তু একটি ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। স্থানটি পুরী হইতে প্রায় শত মাইল দূরে নয়াগড় রাজ্যের মধ্যে। সেখানে গ্রামে একটি সমবায় ঋণ দান সমিতি, একটি ধর্মগোলা ও একটি সমবায় গৃহঋণ দান সমিতি আছে। ধর্মগোলার ঘরের মধ্যেই গ্রাম পঞ্চায়ত অফিস করিয়াছেন। যতদূর বুঝিয়াছি পরিচালকগণের অনেকেই এইগুলিতে জড়িত আছেন।

পল্লীর মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টায় যে সকল পারস্পরিক স্বার্থসংঘর্ষ, সুবিধাবাদ, শোষণ প্রতারণা ও বঞ্চনা চলিতেছে, ইহা পূর্বে এতদূর ছিল না। যে স্থলে সকলের মঙ্গলই লক্ষ্যবস্তু তখন সমবায় মাধ্যমে কর্মপ্রয়াস বিস্তার করিতে পঞ্চায়তের কিছু ভূমিকা অবশ্যই আছে। পঞ্চায়ত সদস্যগণ বিভিন্ন পল্লীতে সাপ্তাহিক সান্ধ্যবৈঠক অনুষ্ঠান করিতে পারেন। তাহাতে সমবায়নীতি স্বল্পসঞ্চয়াদি বিষয়ে সাধারণকে জাগ্রত করিতে পারেন এবং সমবায় ভাণ্ডারে যোগ দিতে উৎসাহিত করিতে পারেন। বিশাল জগতের চিন্তাধারা দূর পল্লীর প্রত্যন্ত পর্যন্ত এইরূপে প্রসারিত করা সম্ভব হইবে।

শিক্ষার মাধ্যমে সমবায় পরিকল্পনা

সমবায়ের প্রয়োজন কেন—সেইটেই আসল কথা। মানুষ পৃথিবীতে আসেও একা আর এখান থেকে যায়ও একা। কিন্তু অপরের সাহায্য ভিন্ন বাঁচতে পারে না। ভগবানের বিধানই এমন যে তিনি মানুষকে অনন্য নির্ভর করেননি। মাতা পিতা আত্মীয় প্রভৃতি অনেকের কাছে ঋণ করেই মানুষ বাঁচে। স্বাবলম্বন কথাটাকে আমরা অনেক সময়েই ভুল করে ব্যাখ্যা করি। কেউ যদি চাঁদে গিয়ে বাস করেন বা রবিনসন ক্রুশোর মত একলা নির্জন দ্বীপে থাকেন তারজন্য সমাজের দরকার নাই আর সমবায়ের ত কথাই নাই।

সমাজে বাস করতে গেলেই কতকগুলি নিয়ম মেনে চলতে হয়। আর নিজের মত অপরকে দেখতে হয় [Love thy neighbour] কেবল একটি ধর্মের অনুশাসন

নয়—যীশুখ্রিষ্টের এই বাণী মানবসমাজের প্রধান রক্ষা কবচ। আমি স্বাধীনভাবে চলব আর অন্যে সে অধিকার পাবে না একথা বললে সমাজ বিপন্ন হয় আর স্বাধীনতার দফা রফা।

এই মূলনীতি আছে আমাদের সংবিধানে—সেখানে আরও আছে সংঘবদ্ধ হবার অধিকার। সুতরাং কেউ যদি বলেন সংঘবদ্ধ হলে বা সমবায় করলে যে কোন কাজই আমরা করতে পারি-তাহলে কথার মধ্যে একটু ন্যায়ের ফাঁকি থেকে যায়। সৎ উদ্দেশ্যে পরস্পরের সমবায়ই আদর্শ—সকলে মিলে বাঁচতে হবে—উঠতে হবে।

আমাদের সমিতিগুলি কেবল টাকা লেনদেন কারবার করে—২/৪টি সমিতি কিছু শিল্প বা ব্যবসা করে—ফলে সমবায়ের তত্ত্ব খোঁজেন অতি অল্প সদস্যই—তাঁরা কেবল দেনী সভ্য মাত্র। এজন্যই আমরা রামধনুর রং দেখছি, আর একটু পরেই সব আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে সমবায়ের বিশেষ ভূমিকা থাকবে। গ্রামীণ সমবায় সমিতি গ্রামের সব আর্থিক ব্যাপার দেখবে—সকলকেই এর আওতায় কাজ করতে হবে, এটাই ছিল স্বাধীন ভারতের আদর্শ—সঙ্গে থাকবে পঞ্চায়ত ও স্কুল। কিন্তু আমরা কি দেখছি?

আমাদের গ্রামগুলিকে কেবল কতকগুলি বাড়ীর সমষ্টি বলা যায় সেখানে কতকগুলি দ্বিপদ জীব বাস করে। শোষণ মুক্ত সমাজ গঠন ছিল মহাত্মাজীর আদর্শ—আমরা তার থেকে সরে গিয়ে কেবল প্রতিযোগিতা করছি কে কাকে কতটা ঠকাতে পারি।

সমবায় যে কেন সফল হচ্ছে না এই তার মূল কারণ। সরকার কেবল উপরে উপরে কিছু সংগঠন চালাচ্ছেন। যেদিন গ্রাম সমাজ গ্রাম স্বরাজের আদর্শে স্থাপিত হবে সেদিনই সমবায় সফল হবে। স্বাধীনতার অপব্যাখ্যা সেদিন চলবে না।

অতএব বোঝা গেল শিক্ষার মাধ্যমে সমবায় রূপায়ণের আগে সমবায় কোন লাইন দিয়ে যাবে তা স্থির করতে হবে। তারপর যে শিক্ষার মাধ্যমে সমবায় প্রচার ও প্রসার হবে তার দিক নির্ণয় করতে হবে। প্রধানত দুটি দিক আছে—(১) সরকার থেকে ট্রেনিং দিয়ে উপযুক্ত কর্মীদল প্রস্তুত করা যাঁরা কাগজপত্রহিসাবে দক্ষ হবেন এবং সাধারণকে সাহায্য করতে পারবেন। (২) বিদ্যালয় থেকে আরম্ভ করে সাধারণের মধ্যে লোক-শিক্ষা দেওয়ার জন্য চিত্রও রেকর্ডাদির সাহায্যে সমবায়ের মূলতত্ত্ব ও কর্মধারা বিষয়ে আলোচনা।

কেবলমাত্র ঋণদান সংস্থা না করে সমাজ শিক্ষার মূলক্ষেত্র করেই সমিতিগুলিকে পরিচালনা করতে হবে। গ্রামের সমূহ অর্থনীতিকে সমবায়ের মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠান গঠন করে কেবল পিত্তরক্ষার মত কিছু কাজ হচ্ছে। সরকারী ঋণদান প্রথা সমবায়কে দুর্বল করেছে, নিরুৎসাহ করেছে। এখন সরকার এ বিষয়ে নিরুৎসাহ হয়েছেন—ব্যাঙ্কদিগকে এইভার দিয়েছেন। গ্রামের সমূহ সঞ্চয় গ্রাম্য সমবায় ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখলে এবং গ্রামবাসীর ভালমন্দ যখন সমিতি দেখবেন তখনই বোঝা যাবে স্বরাজের আদর্শ কেমন হয়। স্বর্গত নেহেরু সমবায়ে বড়

উৎসাহী ছিলেন—তাঁর আমলে চার রকমের কৃষি সমবায় করবার প্ল্যান হয় কিন্তু পরে পরে সবই স্তিমিতি হয়ে গেছে।

ভাগের মা গঙ্গা পায় না। দায়িত্ব বিভাগ হলে কাজে সফলতা আসে না। সমবায়ের অবস্থাও তাই। সেজন্য সর্বাগ্রে সরকারের আইন থেকেই স্থির করে নিতে হবে কে করছেন এই কাজ। কে করবেন ভারতবাসীকে তার অর্থনীতিক দাসত্ব থেকে মুক্তিদান—তার প্রতীক্ষাই আমরা করছি।

শোষণের বহুরূপ

বিহার প্রদেশের রাজগৃহ বা রাজগীর ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান—উক্তস্থানে ১৯৬৮ সালে ভারতের সমস্ত প্রান্ত হইতে শতশত মানব হিতৈষী সজ্জন সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য একটি উত্তম মানব সমাজ সংগঠন। বঙ্গদেশ [পশ্চিমবঙ্গ] হইতে আগত প্রায় বিশজন কর্মী একটি শিবিরে একত্র হইয়া কিছু আলোচনা করেন। সেই সময় জনৈক বিজ্ঞ দেশ সেবক বলেন—সমাজে বৈষম্য ও দুঃখ নিবারণ করিতে হইলে শোষণ নিবারণ করা আবশ্যক। তিনি বলেন—সাধারণত যেসকল শোষণ দেখা যায় তাহা ভিন্ন অনেক প্রকার গুপ্ত শোষণ আছে—সেইগুলির প্রতিরোধ করাও আবশ্যক। রোগ নির্ণয় করিয়া ঔষধ দিতে হয়।

সাধারণভাবে আমরা বুঝি একজন আর এক ব্যক্তির ধনসম্পত্তি বিষয়ে যে বঞ্চনা করে তাহারই নাম শোষণ। মানুষের ব্যক্তিগত সুখদুঃখের কারণ অনেক সময় এই শোষণ হইতে আসে। সরল কথায় বলিতে গেলে বলা যায়, একজন লোক অন্য একজনকে নানা রূপ কূটকৌশলে তাহার প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া নিজে লাভবান হয়। মানুষ তাহার বুদ্ধিকে ভালমন্দ দুইদিকেই চালাইতে পারে। যখন লোভ মোহ বা লালসা বশত নিজে সুখী হইবে মনে করে তখন সে অপরকে বঞ্চনা করিতে ইচ্ছা করে এবং উহাই উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহজ পন্থা মনে করে। ঐরূপ পথ নিম্নমুখী—একবার নামিলে ফিরিয়া আসা কঠিন। মানবসভ্যতার প্রথম যুগে এইরূপ ব্যক্তিগত প্রতারণা ও বঞ্চনা ছিল, কিন্তু পরে দেখা যাইতেছে মানুষ গোষ্ঠী ও সমাজবদ্ধ হইয়া বৃহদাকারে শোষণের যন্ত্র নির্মাণ করিয়াছে এবং উহার বিকট রূপ এখন প্রকাশিত। ইহার প্রতিকারার্থে কতই না তন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। চোর জুয়াচোর প্রতারক তাহাদের বৃত্তি ত্যাগ করে নাই। তাহাদের জ্ঞানোদয় একরূপ অসম্ভব কারণ তাহারা যাহার দাস সেই তৃতীয় রিপু তাহাদের এখনও রেহাই দিতে প্রস্তুত নহে।

শয়তানগণ দলবদ্ধ হইলে সাধু বলিয়া পরিচিত হয়। তখন ব্যক্তির ক্ষেত্রে যাহা অপরাধ, সংঘবদ্ধ ব্যাপারীদের বেলায় তাহা কৃতিত্ব হইয়া দাঁড়ায়—ইহাই শোষণের সুস্পষ্ট রূপ। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর আগের একটি ঘটনা উল্লেখ করি :

মহিষাদল রাজ এষ্টেট তখন কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসে ছিল। বাবু ফণিভূষণ মিত্র সরকার নিযুক্ত ম্যানেজার ছিলেন। জনৈক আমলার নিকট আমরা ঘটনাটি শুনি। কমিশনার ও কালেক্টার এষ্টেট পরিদর্শনে আসেন। ম্যানেজার বাবু আপত্তি করিলেন, খাজনা আদায়ে কড়াকড়ি করিলে এষ্টেটে প্রচুর ক্ষতি হয়। কমিশনার সাহেব প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে চাহিলেন। ম্যানেজার বাবু বলিলেন বাকি খাজনার সুদ হইতে বৎসরে প্রায় লক্ষ টাকা আয় হয়—কড়াকড়ি আদায় হইলে এই আয় মারা যায়। কমিশনার বলিলেন—আমরা চাই ঐ লাখ টাকা প্রজাদের ঘরে ঘরে থাকুক। আশা করি শোষণ প্রতিরোধের এই দৃষ্টান্ত স্পষ্ট হইল।

যে সকল বস্তু অত্যাবশ্যক তাহা প্রত্যেকে কিনিতে বাধ্য এবং এমন লোক খুব কম আছেন যাঁহারা চোরের উপর রাগ করিয়া মাটিতে ভাত ঢালিয়া খাইবেন। সুতরাং যথেচ্ছ মূল্যবৃদ্ধি করিয়া অর্থ অপহরণ করার চেষ্টা করা হয়। দুরাত্মার ছলের অভাব কোনদিন হয় না—মুদ্রাবৃদ্ধি, পরিবহনের অসুবিধা, শুল্ক ট্যাক্স প্রভৃতি নানা অজুহাত দেখান হয়। ধনী দরিদ্র সকলেই এই শোষণের ফল ভোগ করেন।

একজন দরিদ্র ব্যক্তি বলিতেছিলেন, আমি যে কেন এত গরীব তাহা বুঝিতে পারিলাম না—কেবল দেখিতেছি অভাব ও সঙ্কট আমার চিরসাথী। তাহাকে বোঝানো খুবই কঠিন যে শত শোষণের জালে তিনি আবদ্ধ—ন্যায়সঙ্গত মূল্যে তিনি কিছুই পাইতে পারেন না। যদি কখনও কম মূল্যে কিছু পান তাহা আহরণের পিছনের ইতিহাস তিনি জানেন না। তাঁহাদের পয়সা পরোক্ষভাবে সংগ্রহ করিয়া ভরতুকি দিয়া মাল আনিয়া তাঁহাকে দেওয়া হইতেছে। তাঁহাকে অন্যান্য জিনিস তিন পয়সার স্থলে তের পয়সা দিয়া কিনিতে হয়।

কোনও তার্কিক বলেন—যেহেতু তিনি স্বাবলম্বী নহেন তাই তাঁহার ঐরূপ দশা। কিন্তু সকলেই জানেন সমাজবদ্ধ জীব সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হইতে পারে না—পরস্পরের উপর নির্ভর করিতেই হয়। সামাজিক ন্যায় বিচার যে আমরা পাই না তাহার কারণ জগৎ জুড়িয়া শোষণের জাল বিস্তৃত পলাইবার পথ নাই।

বর্তমান সমাজে লটারী শোষণের এক প্রকাশ্য ব্যাপার। লক্ষ লোক পরের পয়সায় রাতারাতি লক্ষপতি হইবার লোভে এই বিস্তৃত জালের মধ্যে প্রবেশ করেন। আপনি ত সর্বজ্ঞ নহেন। সুতরাং নিরুপায় বলির পশুর মত আপনার বলি দানের উদ্যোগ চলিতেছে। পলাইবার পথ নাই।

এবারে একটু অন্য দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিতেছি। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা অতি উচ্চ আদর্শ সন্দেহ নাই। ইহার উপরে সুখান্বেষণের অধিকারও স্বীকৃত আছে। কিন্তু কোথাও একথা নাই যে অপরকে দুঃখ কষ্ট দিয়া ইহা চলিবে না। ফলে যত সংগ্রাম হইয়াছে। তাহাতে অগণ্য নিরীহ মানুষ বলিদান হইয়াছে—মানুষ যে সমস্ত প্রাণীর মধ্যে নিষ্ঠুর তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। মানুষের এই মহা ভ্রমের গোড়াতে আছে সেই শোষণ স্পৃহা। মহামানব যীশুখ্রিষ্ট ইহা অবগত ছিলেন; তাই তিনি শ্রেষ্ঠ উপদেশ দিয়াছেন—তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাসিবে। আমরা বুদ্ধিমান মানবজাতি; আমরা

বুঝিলাম প্রতিবেশীকে বাদ দিয়া আর সকলকে ভালবাসিবে। খ্রিষ্টের বাণী সফল হইলে ৪২০ ধারা লোপ পাইত—অধিক ব্যাখ্যা অনাবশ্যক।

১৯৬৮ সালে এক মন্ত্রী আমলাদের মাহিনা বৃদ্ধি বাবদ ৯ কোটি টাকা বাড়াইয়া দিলেন—ইহা এককালীন ব্যয় নহে—প্রতি বৎসরে ৯ কোটি টাকা অতিরিক্ত খরচ লাগিবে। সকলেই ধন্য ধন্য করিলেন—১৯৮০ সালে এক মন্ত্রী বলিয়াছেন প্রজাবৃন্দকে ২০ কোটি টাকা মুকুব করিতে হইবে। চিন্তা করিলে দেখিবেন জনসাধারণের উপর ইহাও এক প্রকার শোষণ। একবার কলিকাতায় মহাকরণের পশ্চিমে রাস্তার পাশে ইংরেজি ভাষায় লিখিত একটি আবেদন দেখিয়াছিলাম, কোন জনদরদী সংস্থা সরকারী কর্মচারীগণকে মিনতি করিয়াছেন—আমরা দেশবাসী বড় গরীব, আপনারা আমাদের অবস্থা বিবেচনায় বেশী দাবি দাওয়া করিবেন না। নিয়তির পরিহাস এখন মাহিনা ভাতা প্রভৃতি বাদে বোনাসের দাবিও উঠিয়াছে। সকলকে খুশি রাখিতে চাহিলে নানা পথে শোষণের মাত্রা বাড়াইতে হয়। পুকুরের মাঝে একটি ঢেলা ফেলিলে ঢেউ শেষপর্যন্ত পাড়ে আসিয়া লাগে।

আমরা নিজেদের খেয়ালে অজ্ঞাতে বহু শোষণের প্রশ্রয় দিয়া থাকি। তাহার মধ্যে নেশা ও ফ্যাশনের জন্য আমরা যে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করি তাহা নিবুর্দ্ধিতা ছাড়া কিছুই নহে। লোকনিন্দা ভয়ে বা লোক চক্ষে নিজের প্রাধান্য প্রকাশের জন্য আমরা শিল্প সংস্কৃতির নামে ধূর্ত লোকদের ব্যবসায়ের উন্নতি করিয়া থাকি।...

বিহারে চম্পারণ জেলায় মহাত্মা গান্ধী যখন এক গ্রামে ছিলেন, তিনি সহধর্মিনী কস্তুরবাকে গ্রামের মেয়েদের নিকট পাঠান—মহাত্মাজী দেখিয়াছিলেন মেয়েদের কাপড় ময়লা, কস্তুরবা তাহাদিগেকে পরিষ্কার কাপড় পরিতে বলিবেন ইহাই নির্দেশ ছিল। তিনি যখন ঐকথা উত্থাপন করিলেন তখন গ্রামবাসিনী মেয়েরা বলেন—মহাত্মাজীকে বলিবেন, আমাদিগকে কিছু কাপড় দিবেন—আমাদের প্রত্যেকের একখানি মাত্র কাপড় আছে। কস্তুরবা ফিরিয়া গিয়া মহাত্মাজীকে ঐ বিষয় জানাইলেন। গ্রামের মেয়েদের দুঃখ তাঁহার মর্মভেদ করিয়াছিল। সেই সময় হইতে মহাত্মাজী কটিবস্ত্র পরিতে আরম্ভ করিলেন।

মহাত্মাজী তলাইয়া গিয়াছেন। এখন শোনা যায় এই দরিদ্র দেশের নেতাগণের অনেকের পোষাকের বাহার নাকি উল্লেখযোগ্য। এখন মনিহারী দোকানের সামনে কিউ দিতে হয়—আমাদের অপব্যয় ও অপচয়কে কেহ গ্রাহ্য করেন না—চার্বাক ঋষি আমাদের দেশেই ছিলেন।

কেবল যে পয়সা কড়ির বেলা শোষণ আছে ইহা মনে করিবেন না। বুদ্ধিহীন ব্যক্তিকে সুকৌশলে শ্রম করাইয়া, সে বিনিময়ে কিছুই পাইল না—ইহা ও শোষণ। বিজ্ঞাপন দাতাগণ খবরের কাগজে, রেডিওতে, পোষ্টারে, দেওয়ালে, গাড়িতে শত সহস্র টাকা খরচ করিয়া বিজ্ঞাপন দিতেছেন—বিজ্ঞাপনের খরচ কোথা হইতে আসিবে? আপনি ক্রেতা আপনার ঘাড়েই উহা পড়িবে। উহা আপনি বুঝিতেও পারিবেন না—সরকারের অনুমোদিত মূল্য, মালের উপর ছাপা আছে। সংক্ষেপে বলি

আপনি সিগারেট সেবন করেন—কোম্পানির মোটরে মাল দোকানে আসে—ঐ মোটরের মূল্য ও চালাইবার খরচ আপনার প্রতিটি সিগারেটের দ্বারাই ওয়াশীল হইবে।

ধর্মানুষ্ঠানেও নানা প্রকার উৎসবে যে প্রকার অনর্থক ব্যয় বাহুল্য করা হয় তাহা সকলেই জানেন। ঐ সকল ব্যাপারে যাঁহারা খরচ কমাইতে বলেন তাঁহারা বোধহয় কাহারও সমর্থন পাইবেন না, অধিকন্তু পাষণ্ড উপাধি প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে।

অনেকে মহা বিপ্লব বাধাইয়া সমাজকো বদল ডালো ঘোষণা করেন। তাঁহাদের আছে জানিতে চাই বিরাট শোষক বাহিনীর কতটা তাঁহারা দেখিয়াছেন। শোষণ প্রতিরোধে কত রকম তন্ত্র বাহির হইয়াছে—প্রত্যেকে বলেন, আমার ঔষধ অব্যর্থ—এমন উপায় বাহির করিয়াছি শোষণের গোড়া কাটিয়া দিব। কেবল মাত্র রাজনীতির সাহায্যে কতটা কাজ হইতে পারে। কেবল দণ্ড ভয়ে শয়তান কতদিন দমিত থাকিবে।

প্রকৃতির বিপর্যয়ে মানুষ সাময়িক কষ্ট পায়, কিন্তু মানুষের দুঃখের প্রধান কারণ মানুষের অসভ্যতা। আমরা সভ্যতার একটি সরল ব্যাখ্যা করি তাহা এইরূপ—আমি অপরের উপকার করিতে যদি সক্ষম না হই, কিন্তু অপরের অনিষ্ট বা অসুবিধা করিব না—এই প্রতিজ্ঞা আমার আছে। মানুষ যেদিন মানুষ হইবে সেদিন শোষণ থাকিবে না। সেদিন কি আসিবে? বর্তমানের ঘোর অন্ধকারের মধ্যে সে দীপ কি জ্বলিবে? যিনি সেই দীপ জ্বালিবেন সেই মহামানবের আগমন কি আসন্ন? কবিদের ধ্যানালোকে তাহার আভাস মিলে। হতাশ মানবাত্মার ক্রন্দন তিনি কি শুনিতে পাইয়াছেন।

শোষণের বহুরূপ আছে বলেই—শোষণের স্বরূপ জানা দরকার। একটা কথা আছে শোষিতকে বুঝতে দাও সে কেমনভাবে শোষিত হচ্ছে। জগতের সব রকম দুর্দশার স্থলে রয়েছে এই শোষণ। শোষণের অনেকরূপ—আমরা ধরতেই পারি না যে আমরা শোষিত হচ্ছি। দেশের জনসাধারণ বেশীর ভাগই সরল লোক, তাঁরা শোষণের প্রকৃতি বুঝি সাবধান হতে পারেন না।

পাগল মানুষদের কথা

পাগল মানুষ কথাটির সঙ্গে আমাদের কম বেশী পরিচয় আছে। কিন্তু পাগলদের চিনতে পারা সহজ নয় এবং আমাদের সে ক্ষমতা বোধ হয় খুব কমই আছে। আমরা কোনো না কোনো পাগলকে ধরে বেঁচে আছি। কিন্তু তাঁদের ঠিক চিনতে পারি না।

যে লোক মনের কথা খুলে বলে তাকেই আমরা পাগল বলি। আমরা সাধারণত কিছু মনের কথা রিজার্ভ করে রাখি—বাকীটা প্রকাশ করি—সমস্ত মনের ভাব খোলসা করে বলতে আমাদের সঙ্কোচ হয়। কিন্তু আমাদের পূজনীয় পাগলেরা মহাসাধক—তাঁরা আমাদের মত নহেন। তাঁরা কঠিন সাধনা করে অর্থাৎ তপস্যা করে জীবন ক্ষয় করে ফেলেন তথাপি পরম সত্য অন্বেষণে বিরত হন না—শত বাধা বিঘ্নকে তুচ্ছ করে জীবন পণ করে থাকেন, উদ্দেশ্য—মানুষের মঙ্গল কোন পথে তা

আবিষ্কার করা। তাঁদের অন্তর এত কোমল— সেখানে আছে করুণার অফুরন্ত ধারা। দুঃখী মানুষদের জন্য তাঁদের প্রাণ কাঁদে—কি করে তাদের রক্ষা করবেন সেই কঠিন ব্রত তাঁরা সর্বদা পালন করেন নিজের ভাল মন্দ তাঁরা চিন্তা করতে চান না। অবশ্য সবার মঙ্গলে তাঁদের মঙ্গল এসে যায়।

তথাগত বুদ্ধদেবের কি অভাব ছিল? তিনি রাজার ছেলে—সুখের সংসার—পত্নীপুত্র ছিলেন—পিতা ছিলেন। নিজের মাতা ছিলেন না কিন্তু এমন মা ছিলেন যাঁর নামের সঙ্গে তাঁর নাম যুক্ত করে সারা বিশ্বের লোক তাঁকে চিনতে পারে। সুখের জীবন ছেড়ে গভীর রাত্রে বিশ্বাসী অনুচর ছন্দককে নিয়ে তিনি যে বেরিয়ে গেলেন—তাঁর সেই মহা নিষ্ক্রমণ—তার মধ্যেও তো সকলের প্রতি অপার দয়া তা বুঝতে কষ্ট হয় না—সুতরাং তিনি একজন পাগল বৈ-কি!

এই ভাবে লক্ষ্য করলে দেখি তাঁরা মনের কথা চেপে রাখেন নি। নিতাই আমার মাতা হাতী (মত্ত হস্তী)—পাগলা হাতীর মতো তাঁর চালচলন—জীবের প্রতি অপার করুণা—বিশ্ব প্লাবিত করে ছুটেছে—সাধারণ মানুষের দলে তাঁকে ফেলা যায় না। তাঁকে পাগল বললে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আমরা নিম্ন স্তরে থাকি। সংসারে লোকের হিত চিন্তা করি কিন্তু তাঁদের সঙ্গে তফাৎ ওখানেই—আমরা পাগল নই। আমাদের এক পা যদি এগোয় তিন পা পিছোয়—তাঁদের সঙ্গে তুলনা আমাদের পক্ষে ঘোর ধৃষ্টতা।

পৃথিবীতে যুগে যুগে এমন কত মহাপুরুষ এলেন—তাঁদের বড় পরিচয় তাঁরা পাগল—ভক্তগণই তাঁদের নামকরণ করেছেন। তাঁদের কাজকর্ম এমন বিচিত্র ও বিশিষ্টতা পূর্ণ যে ভক্তগণ অনেক ভেবে চিন্তেও কোন কূল করতে পারেন নাই। তখন নিজেদের অক্ষমতা স্বীকার করে বলতে বাধ্য হয়েছেন—এই মহাপুরুষ একজন পাগল, তাঁর উপযুক্ত বিশেষণ তাঁদের ভাষার ভান্ডারে পাওয়া গেল না, অগত্যা নিজেদের অক্ষমতাকে স্বীকার করে বিশ্বসমাজে তাঁদের পরিচয় দিলেন ঐ চিরপরিচিত শব্দটি দিয়ে।

এবার দেশে যে সব সাধারণ পাগল ঘুরে বেড়ায় তাদের কথা কিছু আলোচনা করি। এদের মধ্যে নারী পুরুষ দুরকমই আছে। কোন এক সময়ে মাথার গোল হয়ে স্মৃতি লোপ হয়েছে—কারো হয়ত কিছুটা আছে। কেউ নাম বলতে পারে, বাবা মায়ের নামও হয়ত বলে কিন্তু ঠিকানা বলতে পারে না। অনেকের আচরণ অদ্ভুত হয়—কেউ মারমুখী কেউ বা খুব শান্ত হয়, কিন্তু সবারই এক বিষয়ে মিল—সাধারণ লোকের মত ব্যবহার নয়—কথাবার্তার কোন মাথামুণ্ডু পাওয়া যায় না। পাগলা গারদে অনেকে আবদ্ধ থাকে—ঐ রকম করে রাখা ছাড়া উপায় নাই। চিকিৎসা করা হয়—কেউ বা ভাল হয়ে যায়। একটি মেয়ে বয়স প্রায় পঞ্চাশ ঘুরতে ঘুরতে আমাদের গ্রামে এসে পড়েন। তাঁর কথাবার্তা এত মার্জিত এবং ব্যবহার এত ভাল ছিল যে এক গৃহস্থ তাঁকে সমাদরে আশ্রয় দেন। তিনি ভিক্ষা করতেন খুব কমই—কোনোরূপে জীবনধারণ করতেন। বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করায় বললেন—হুগলী জেলার

তারকেশ্বরের ঐ দিকে এক গ্রামে বাড়ী কিন্তু তিনি যাওয়ার পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। ছেলের নামও বললেন। এখানের অঞ্চল প্রধান দুখানা চিঠি সেই দেশে পাঠালেন। একখানি থানার অফিসারের কাছে—আর একখানি পুত্র সন্তোষের কাছে। এক সপ্তাহের মধ্যেই সন্তোষ এসে পঞ্চায়ত প্রধানের কাছে উপস্থিত। সে বললে তার মা তিন বৎসর নিরুদ্দেশ। এমন পাগল হয়ে ছিলেন কোনো লোককে নিকটে আসতে দিতেন না—আঁচড় কামড় দিয়ে সরিয়ে দিতেন। প্রধান মহাশয় সন্তোষকে দূর থেকে ঐ মহিলাকে দেখালেন। সন্তোষ চিনতে পারলেন ও নিকটে গিয়ে বললেন—'মা তুমি এখানে কি কোরছ?' মা দেখেই চিনলেন, বললেন—'খোকা তুই কোথা ছিলি— আমি ঘর যাওয়ার পথ খুঁজে পাচ্ছি না—কচি [নাতি] কেমন আছে?' সন্তোষ সব খবর বললেন। তিনি তার সঙ্গে বাড়ী যেতে রাজি হলেন। তখন দুর্গাপূজার দুচার দিন বাকী ছিল। প্রধান মহাশয় [স্বয়ং রমণীমোহন] পরদিন সকালে তাদের বিদায় দিলেন।

এমন কত ছেলেমেয়ে ঘুরে বেড়ায় কিন্তু এমন আমাদের সমাজ যে তাদের উপযুক্ত সেবা হয় না। আমরা কি সত্যই সমাজসেবী বলে নিজেদের মনে করি?

শোনা যায়, পশ্চিমী জগতে ইউরোপ ও আমেরিকাতেও অনেক মাথা খারাপ লোক আছে। তারা লুনাটিক এসাইলাম বা উন্মাদ আবাসে থাকে বা ঘুরে বেড়ায়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমে এক শহরে আমাদের রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ মহারাজকে এক পাগল এক সভাস্থলে গুলি করে—তাতেই তিনি মারা যান।

আমরা ধরে নিতে পারি, সব দেশেই পাগল আছে এবং তাঁদের উপযুক্ত সেবা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সরকার ও জনসাধারণের কর্তব্য। রাঁচিতে পাগলা গারদ আছে শুনেছি। দেশের হাওয়া ঘুরছে—এখনকার যুব সমাজ নিশ্চয় এই আর্ত মানবতার ক্রন্দনে উদাসীন থাকবে না এমন বিশ্বাস আমরা করি। যারা মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ মাথা হারিয়ে ফেলেছে তাদের চিকিৎসা করা সত্যই বড় কঠিন কাজ, কিন্তু আমাদের ভুললে চলে না তারাও সমাজের একটা অংশ এবং সভ্যতার পরিচয় দিতে গেলে আমাদের সবার আগেই এই সব বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া দরকার।

ভারতের একতা করিতেই হইবে

এই বহুভাষার দেশে বহুবর্ণের লোকদের মধ্যে একতা করিতে হইলে অনেক রকম বাধা পার হইতে হইবে। নানা বর্ণের লোক আছেন, তাঁহাদের মুখের ভাষা এবং লিখিত ভাষাও বহুপ্রকার—ভাবের আদান প্রদান না হইলে একতা কোন পথে আসিবে? তাই এই কাজ সকলের আগে বিবেচ্য। কে এই কাজে আসিবেন তাহা লক্ষ্য করিলে প্রথমে লোকসভার সদস্যগণকে ধরিতে হয়। তাঁহারা শপথ করিয়াছেন তাঁহারা

সংবিধানের প্রতি অনুগত থাকিবেন ও মন্ত্রগুপ্তি মানিবেন। কিন্তু প্রথমেই বলিয়াছি ভাষার বাধা একটি বড় বাধা—অবশ্য ইংরাজি ও হিন্দী আমাদের বড় ভরসা, কিন্তু এখনও শিক্ষার বিস্তার এমন হয় নাই যে শহর ও গ্রামে সাধারণে এই সব বিষয়ে অবগত আছেন।...

যে মূল্যবান সময় স্বাধীন ভারতে নষ্ট হইয়াছে তাহাতে আমরা বিশেষ কিছু করিতে পারি নাই। অবশ্য শিক্ষিত সম্প্রদায় কেহ কেহ ভ্রমণাদির দ্বারা কিছু আভাস পাইয়াছেন। একদল শিক্ষক ও শিক্ষিকা একবার পশ্চিমবঙ্গ ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা আগ্রহ করিয়া বাংলা শিখিয়াছেন ভুবনেশ্বরে, এক কেন্দ্রে। কেন বাংলা শিখিতে চান উত্তরে কোন কোন শিক্ষিকা বলেন আমরা রবীন্দ্রনাথকে জানিব সেই জন্য বাংলা শিখিতে চাই। তাঁহারা মনের কথা খুলিয়া বলিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের মধ্যমণি—তাঁহাকে ধরিতে পারিলে আরও অনেক কিছু মিলিবে—প্রকারান্তরে বাঙ্গালীকে জানা যাইবে। অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় ভাল গল্প লেখক আছেন শোনা যায়—মুন্সী প্রেমচন্দ্র, হরিশচন্দ্র, মুলক্‌রাজ আনন্দ, মহাদেবী ভার্মা, ফকিরমোহন সেনাপতি প্রভৃতি। আরও আছেন, আমরা কতটুকুই বা জানি। তাঁহাদের দ্বারা ভারতের একতা সাধনের কাজ পরোক্ষে হইয়াছে ও হইতেছে। অসমিয়া ভাষা আমাদের কত নিকটের তাহা যাঁহারা একটু খোঁজ রাখেন তাঁহারা জানেন। কিন্তু এমন দূরদৃষ্ট যে উর্দু ভাষায় খবর প্রচার লইয়া দাঙ্গা বাধিয়া গেল কর্ণাটকে।

সিনেমার আবেদন সর্বজনীন, ঐ মাধ্যমে অনেক কাজ হইতে পারে, কিন্তু সর্বভারতীয় একতার লক্ষ্যে কেহ আসিতেছে না। এতদর্থে পল্লী ও শহরে ক্লাব স্থাপন করিতে সরকার যদি উৎসাহ দেন ও অর্থব্যয় করেন, আশা করি তাহাতে ফল হইতে পারে। খেলাধূলার মধ্য দিয়া কত সুন্দর পরিচয় হয় তাহা সুনীল গাওস্কর, মিলখা সিং, কুস্তিগীর গামা প্রভৃতি প্রমাণ আছেন। সরকারের পক্ষে অনেক সীমাবদ্ধতা আছে, কিন্তু দেশের ঐক্য সুদৃঢ় করার জন্য পয়সা খরচ করিতে যদি তাঁহারা কুণ্ঠিত হন, তবে নিশ্চয়ই তাহা প্রশংসার কথা নয়।...

অনেক রকম মিশন হয়—এক ভারতের কি মিশন হয় না? রাজনীতির যে প্রকার উৎপাত তাহাতে গরম গরম ভাষণ খাবার ছাড়িয়া কে আমাদের ক্ষুধার ডাল ভাতের সন্মান করিবে? ...দেশকে এক ভারত বন্ধনে আনিতে পারিলে ভবিষ্যতের মঙ্গল সাধন হইবে—ভবিষ্যৎ ভারতীয় সমাজও বলবান হইবে—এইরূপ বিশ্বাস কি আমাদের রাজনীতির কোলাহলের মধ্যে কখনও স্থান পাইবে? গ্রাম জেলা নগর ছাড়াইয়া কখন আমরা ভারত সন্তান বলিয়া আনন্দ লাভ করিব। তাহা প্রথম স্বদেশী আমলে যেমন শুনিতাম—সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র প্রভৃতির যুগে যে রূপ উন্মাদনা জাগিয়াছিল তাহাদের সাক্ষী এখনও আমরা আছি। আমাদের আশা, এক ভারতের সাধনা করিতে পারিলে ভারত মহাসাগরের উচ্ছ্বাস গর্জন করিবে—ভারত সন্তান কি তাহা করিতে পারিবে?

নীচের দিকে তাকান

এখনকার দিনে কলম ধরতে ভয় হয়। চারদিকে এত গোলমাল এবং এত বড় বড় লেখা প্রকাশ হচ্ছে যে তার কাছে আমাদের ছোট ছোট চিন্তার স্থান পাওয়া কঠিন। পৃথিবী নামে গোলাকার বস্তুটির এপিঠে ও সেপিঠে এত চঞ্চলতা আসছে যে আমরাও টলমল করছি। অনেক দুর্বোধ্য তত্ত্ব আরও কঠিন ভাষায় পরিবেশিত হচ্ছে— তা আমাদের মাথায় ঢুকছে না। আমরা মোটা ভাত কাপড়ে মানুষ—সে দিনের চাল চলন এখন অচল। রেডিও, টিভি, নাটক, প্রবন্ধ মায় ছেলেমেয়েদের মুখের ভাষা আমাদের যেন রিপ ভ্যান উইঙ্কলের যুগে ফেলে দিচ্ছে। তিনি বিশ বছর নিদ্রার শেষে জেগে উঠে স্বাধীন আমেরিকাকে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। আমরাও দিকে দিকে উন্নয়ন পরিকল্পনার সোরগোল শুনছি। গরিবি হঠানোর জন্য কোটি কোটি টাকা ঋণদান, অনুদান হচ্ছে। জনগণের কর্মপ্রবাহকে সচল করা চাই— উৎপাদন বাড়বে, শিল্পের প্রসার হবে। গরিবেরা সুখের মুখ দেখবেন। গত তিরিশ বছরে আমরা ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছি। আবার যখন দেখি কোটি কোটি টাকা ঋণের বোঝা তখন মনটা দমে যায়। বিশ কোটি কণ্ঠে মায়ের আবাহন এখন আশি কোটি কণ্ঠের কাতর প্রার্থনায় পরিণত হয়েছে। কবি, মনীষী, সজ্জনগণ উৎসাহ দিচ্ছেন এগিয়ে যাও—রথ থামিও না—চলমান রাখ জাতীয় রথের চাকা। সামনের আলো স্পষ্ট হচ্ছে না তবু আমরা বলি যারা সবার পিছে আছে সেই নিরক্ষর মূঢ় জনগণের দিকে আগে দৃষ্টি দিন। দূর পল্লীর প্রত্যন্ত কুটীরে যারা বাস করতে বাধ্য হয়েছেন তাদের দিকে লক্ষ্য রাখুন। সাক্ষরতার অভিযান—বয়স্ক শিক্ষার প্রসার করতে গেলে আগে সেদিকেই নজর দিতে হবে। বনবাসী আদিম জাতি মণ্ডলের কথা আমরা যেন না ভুলি। আরও বেশী করে মন দিতে হবে নারীজাতির শিক্ষার দিকে— কুটিরে কুটিরে নূতন হাওয়া দিতে হবে।

উন্নয়ন যাতে সর্বাঙ্গে হয় সেজন্য কতক মানুষকে পৃথক একটা শ্রেণীভুক্ত করে তাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা আইনে আছে। এই প্রথাটা চালু করে আমরা কি বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছি? পিছনে পড়ে থাকা শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসর মানুষদের আলাদা করে সুবিধা দান করে টেনে তোলার চেষ্টায় জাতির সংহতি সাধনের পক্ষে কি ভাল হয়েছে? নানা স্থানে এ বিষয়ে নানা মত প্রকাশ পেয়েছে—বিরোধও হয়েছে। আমরাও একটা ধারণা পেয়েছি যে মানুষ যখন এক, বর্ণ বা চেহারা ভিন্ন হলেও মানবসন্তান হিসাবে এক সাথে মার্চ করাই ভাল। বিদেশী শাসকরা নিজেদের সুবিধার জন্য নানাবিধ ভেদ তৈয়ার করত—আমরা তা পছন্দ করিনি। আমরা সাধারণভাবে বুঝি যাকে পিছনে রাখ সে পিছনে টানে। জীবন যাত্রার মান বিবেচনায় আমরা বঞ্চিত দরিদ্রদের দিকেই দৃষ্টি দিতে পারি।

মানুষের লুকোচুরি

মানুষ অনেক জিনিস লুকাতে পারে। কিন্তু নিজেকে লুকাতে পারে না। সে ধরা পড়ে যায়। গোপন করার চেষ্টা আছে, কিন্তু তা সম্ভব নয়। অবশ্য মানুষের চেষ্টায় কমতি নাই, কিন্তু আত্মগোপন করে থাকা যে কত কঠিন তা ফেরারী আসামী ছাড়া অন্য লোকে জানতে পারে না।

আমাদের প্রসঙ্গ এত হালকা ব্যাপার নয়। খুনী আসামী গ্রেপ্তারের গল্পও নয়। মানুষ কাজ হাসিল করার জন্য কতরকম বেশ-ই ধারণ করে। আমরা দৃশ্য বা অদৃশ্য কতক নাটক দেখি ও শুনি—এই চরিত্র অভিনয়ের প্রশংসা করি। কিন্তু চারপাশে যে নাটক দিনরাত চলছে তার দিকে লক্ষ্য করতে সময় পাই না। নিজ নিজ ধান্দায় যুগের প্রয়োজনে নিজেকে ব্যস্ত থাকতে হয়। অপরের চর্চা করার সময় কোথায়? তাই অহরহ ঘরেবাইরে যে আত্মগোপন নাটক অভিনয় হচ্ছে তা আমাদের নজরে আসে না।

ধরুন একজন লোক—মঙ্গলবাবু কিছুটা লেখাপড়া শিখেছেন, তাঁর মনে হল আমাকে এমন কিছু একটা হতে হবে যাতে লোকের চোখ আমার উপরে পড়ে। সুতরাং প্রথমেই আমাকে নিজের বেশভূষার কিছু পরিবর্তন করতেই হবে। নূতন কত ফ্যাশন আসছে তাঁর খোঁজখবর রাখতে হবে, মাথার চুল কেমনভাবে কাটা হবে তার উপযুক্ত সেলুন সন্ধান করতে হবে—পোষাক ও এমন চাই যেন দাদাদের নজরে পড়তে পারি। সভা সমিতিতে যেতে হবে—শ্লোগান অভ্যাস করতে হবে। একটু একটু করে ক্রমে ভোটের মেলার মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। লোকেদের মন কেমন করে টানতে হয়—বক্তৃতার ভাষা কেমন করলে তাদের মনোরঞ্জন হবে আমাদের মঙ্গলবাবু সেই ফিকিরে রইলেন। অসীম ধৈর্য ও চাতুর্যের সঙ্গে কয়েক বছর সাধনার পরে দেখা গেল বাবু মহাশয় একজন ছোটখাট নেতা হয়ে গেছেন। জনগণের মঙ্গল চিন্তা ছাড়া তার অন্য কাজ নাই, সেটা জাহির করতে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি কারণ ঐ পথ দিয়ে তাঁকে উঠতে হবে। ঋষি কবি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর মুচিরামকে কোথায় পেয়েছিলেন তা আমাদের জানা নেই। কিন্তু তাঁর ঋষির দৃষ্টিকে এড়াতে পারেনি মুচিরাম। যাত্রাদলের ছেলে শেষ পর্যন্ত রায় বাহাদুর হাকিম হয়েছিল। একজন প্রখ্যাত লেখক দিল্লীর মসনদ নামে গল্পে দেখিয়েছেন কি করে হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকের ছেলে শেষে মন্ত্রী পর্যন্ত হয়েছিল। তথাপি বলি নিজেকে খরগোসের মত গোপন করার চেষ্টা করলেও লুকাতে পারে না, শিকারীর হাতে মারা পড়ে, কেননা সে জঙ্গলে মুখ লুকিয়ে রাখে বটে কিন্তু তার শরীর বাইরে দেখা যায়। পরচর্চা সাধারণত মুখরোচক হয় কিন্তু তা বেশী করতে গেলে তিক্ত হয়ে পড়ে। তাই নিজের চরকায় তেল দেওয়া ভাল। আমরা সত্যই কি নিজেকে চিনি? আমরা কি সর্বদা নিজের স্বরূপ গোপন করে রাখছি না? আমাদের শরীর একটি ক্ষুদ্র যন্ত্র হলেও এরমধ্যেই একজন বাস করেন যাঁর রহস্য খুঁজে বার করতে বড় বড় মাথাওয়ালা লোক হিমসিম খেয়ে যান। আমি

যে কে তা নির্ণয় করতে পেঁয়াজের খোসা ছাড়াতে হয়—শেষপর্যন্ত খোসাই মিলে, আসল কিছু মিলে না। আচার্য শঙ্কর বলেন—সো অহং। মহাপ্রভু বলেন, কৃষ্ণের নিত্যদাস। অতএব সিদ্ধান্ত হল আমরা যা তা বাজে জিনিস নই। আমাদের প্রিয় কাজীদাদা তমলুকে স্বকণ্ঠে আবৃত্তি করে বলেছেন—বল বীর, বল উন্নত মম শির, শির নেহারি আমার নতশির ঐ শিখর হিমাদ্রির। আবৃত্তির আগে তিনি বলেছিলেন, এই কবিতার মর্ম বেদান্তে মিলবে। আমাদের 'আমি' জাগাবার জন্য—যাঁরা কেঁচোর মত হয়ে আছে, তাদের স্বরূপ দেখাবার জন্য এই বীর সাধক এখানে এসেছিলেন। তমলুক আলোকময় হয়েছিল।

মানুষের লুকোচুরি খেলায় আমরা যে যেখানে পারি লুকিয়ে আছি—মাঝে মাঝে সাড়া দিচ্ছি কিন্তু সহজে ধরা দিচ্ছি না। তথাপি একথা মানতে হয়—পুলিশ পিছনে আছে—আসামীকে সে একদিন ধরবেই। তবে যদি আগাম জামিন নিতে পারি বা বিচারকের বিচারে খালাস পাই তাহলে জীবন্মুক্ত হব—চিন্তা নাই। এখন তো প্যারোলে ছাড় পেয়ে কিছুদিন ঘোরা ফিরা করছি। কিন্তু যখন ডাক পড়বে তখন লুকোচুরি চলবে না—হাজিরা দিতেই হবে। যাওয়ার রাস্তাটা ঠিকই আছে—এজন্য চিন্তা নাই। কথাটা আরও বিস্তার করার দরকার আছে কি?

যেদিকে তাকাই কেবল শত্রু

যেদিকে তাকাই কেবল শত্রু-শত্রু, পথিকের স্বর্গ মর্ত পাতাল ভ্রমণের সমস্ত পথই বন্ধ, কোথায় যাই—কেবল দেখি অরি, অরাতি, শত্রু, বৈরী, হোস্টাইল, এনিমি, ফো, দুশমন। যে কোনো পুরাণ দেখি—গীতা, চণ্ডী যা কিছু দেখি সব এই শত্রুর কথা। সাহেবদের বাইবেল—মোল্লাভাইদের কেতাব পড়ি—কেবল শত্রুর আর মিত্রের কথা। আউল বাউল, কর্তাভজা প্রভৃতি বাইরের বৈরীদের কথা না বললেও দেহের মধ্যে গণ্ডা গণ্ডা শত্রুর কথা নিয়ে মেতে আছেন। ইহলোক ছেড়ে পরলোকেও নাকি শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ এমন কথা পাওয়া যায়। কোনান ডয়েল সাহেব ওয়াটারলু যুদ্ধের একজন বৃদ্ধ সৈনিকের শেষ জীবন নিয়ে একটি চমৎকার গল্প লিখে গেছেন। তাতে আছে বুড়ো ক্রুষ্টার বলছে—আমার সঙ্গের সব চলে গেছে—আমি গেলেই তাদের প্যারেড পূর্ণ হবে। বুড়োর ভাইঝি নোরা বলছে—পরলোকে কেবল শান্তি। একথা শুনে বুড়ো চটে গেছে—না, না, সেখানে যুদ্ধ আছে।

বাইবেলে কত যুদ্ধের কথা আছে—ইস্‌রেলীরা ছিল সব পাকা সোলজার। সুতরাং পালাবার পথ নাই। রাম রাবণের যুদ্ধ নিয়ে রামায়ণ—কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ নিয়ে মহাভারত—আর তার মাঝেই গীতা—তাতে শ্রীকৃষ্ণ বিষাদগ্রস্ত অর্জুনকে বলছেন—জিত্বা শত্রূণ ভুংক্ষ রাজ্যং সংবৃদ্ধং—উত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ং। চণ্ডীতে মহামায়ার সঙ্গে অসুরদের বারবার যুদ্ধ। মা বলছেন—ইত্থ যদা যদা বাধা দানবোত্থা

ভবিষ্যতি ইত্যাদি। কত আর বোলবো? বাইবেলে দেখি—মিশর থেকে বেরিয়ে ইস্‌রেলীরা কনান দেশে যাওয়ার সময় কেবল সংহার সংহার, মহাসংহার, ম্যাসাকার। কোন্‌ দেশের এমন ইতিহাস আছে যাতে যুদ্ধ নাই? যদি থাকে তাহলে সে ইতিহাস নয় বা সে দেশ এই জগতের মধ্যে অবস্থিত নয়।

মানুষ জন্মায় নির্দোষ হয়ে—ক্রমে পরিবেশ ও সংসর্গগুণে তার মধ্যে ঈর্ষা দ্বেষ জন্মায়। কেন এমন হল? আদিম গুহাবাসী মানব কেবল নিজেদের ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রশমন নিয়েই থাকত। যখন তারা সংখ্যায় বাড়ল, আহারাদির অসুবিধা হলেই সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি হল। অন্যেরা তাকে লক্ষ্য করল এবং প্রতিরোধের জন্য সোজা পথ না পেলে গোপনপথ ধরল। ক্রমে মানুষ হল চোর ডাকাত, লুটেরা প্রতারক প্রভৃতি। কেননা যে কেউ নিজের বা নিজেদের সুখের জন্য সঞ্চয় করছে, সে তার সঞ্চয়কে সম্পত্তিতে পরিণত করেছে যাতে তার ভবিষ্যৎ নিরাপদ হয়। ক্রমে লোকে বুঝল একা একা সুবিধা হবে না—দলবদ্ধ হয়ে আত্মরক্ষা বা আক্রমণ করতে হবে। পরিবার, গোষ্ঠী, জাতি, উপজাতি গঠন হল—ভূমি, জল, আকাশ পর্যন্ত ভাগ করা হল। দেশ, রাষ্ট্র, সেনাদল গঠন হল। কেউ ভেবে দেখল না আমিও যেমন একজন পৃথিবীতে এসেছি আমার ভাই বা জ্ঞাতি বা অন্যেও কোন না কোন মায়ের কোলে এসেছে—আমরা কেনই বা অপরকে ঈর্ষা করব বা শত্রু বলে মনে করব? আমাদের শাস্ত্রকারেরা ধরেই নিয়েছেন জ্ঞাতিদের মধ্যে শত্রুতা হবেই। যাতে এরূপ না হয় তার জন্য উচ্চ আদর্শ নিয়ে মহাজ্ঞানী মহাজনেরা কত পুরাণ, কাব্য, গাথা তৈয়ার করে গিয়েছেন। ঈশা পয়গম্বর বলেছেন প্রতিবেশীকে ভালবাস, হজরত মহম্মদ বলেছেন—আমরা সবাই আল্লার বান্দা—তাঁর পথ ধরে চল।

যুগযুগ চলে গেল, মানুষ আজ কোথায় সরে এসেছে—এখন দিনরাত তার চিন্তা কি করে অপরের থেকে পৃথক একটা সম্পত্তি করবে—কি করে নিজের দল সুখী হবে—প্রবল হবে।

পথিকের আবেদন, মানুষ ভাই—অনেক দূরে এসে পড়েছ; পুরাতন দিনে ধর্মযুদ্ধের দিনেও ত ফিরতে পারবে না। অন্তত এইটুকু কর—লোকের উপকার করতে না পার তার অনিষ্ট কোরো না—আজকার দিনটা শান্তিতে কাটিয়ে নাও।

ছোট ছোট দুটি কথা

জগতে যতরকম শক্তির খেলা দেখা যায় তার মধ্যে শব্দের শক্তি প্রধান এবিষয়ে সন্দেহ নাই। আমাদের ধর্ম শাস্ত্রে বলে শব্দ ব্রহ্ম, খ্রিষ্টানদের গ্রন্থেও আছে সৃষ্টির আদিতে শব্দ ছিলেন এবং এই শব্দই ঈশ্বর ছিলেন। কিন্তু এ সব গুরুতর বিচার করার যোগ্যতা আমাদের নাই। আমরা দেখেছি কোনো কোনো সময়ে দু একটি ছোট শব্দের অদ্ভুত ক্ষমতা। অনেকেই জানেন লালাবাবুর 'বেলা যায়' এর কাহিনী। তিনি রাজা,

একদিন বিকালে জনৈক রজকের মেয়ের দুটি কথা তাঁর কানে গেল '—উঠ বাবা বেলা যায়—কখন বাস্‌নায় আগুন দিবে?' লালাবাবু তখন পাল্কীতে করে সেখানকার রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। কথাগুলি তাঁর কানে যেতেই তিনি ভাবলেন, সত্যিই জীবনের বেলা যায়, কখন বাসনায় আগুন দিবেন। পাল্কী থামাতে বললেন, বাহকদের বলেন, তোমরা ফিরে যাও—আমি আমার পথে যাব। তিনি বৃন্দাবনে গিয়ে ঠাকুরের চরণ আশ্রয় করলেন। কলকাতার পশ্চিমে অপর পারে যেখানে লালাবাবু সংসার ত্যাগ করে পরমার্থের পথে যাত্রা করেছিলেন আমাদের সৌভাগ্য আমরা সেই স্থানটি দর্শন করেছি।

এই রকম আরও ঘটনার উল্লেখ করে শেষে আমাদের কথা পেশ করব। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর আনন্দমঠে লিখেছেন—মহেন্দ্র সিংহ সম্পন্ন গৃহস্থ, দুর্ভিক্ষকালে গৃহত্যাগ করে আনন্দ মঠের সন্ন্যাসী ভবানন্দের হাতে পড়লেন, উভয়ে মাঠের মধ্য দিয়ে চলছেন—জ্যোৎস্না প্লাবিত রজনী সহসা ভবানন্দ গাইলেন—বন্দেমাতরম্। মহেন্দ্র চমকিত হইলেন, শুনিতে লাগিলেন—সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং শস্য শ্যামলাং মাতরম্। গান শেষ হইলে মহেন্দ্র দেখিলেন দস্যু কাঁদিতেছে। মহেন্দ্র ভবানন্দকে একজন দস্যু মনে করেছিলেন। বলিলেন—এ'ত দেশ—মা নয়। ভবানন্দ বলিলেন— আমরা অন্য মা মানিনা, এই আমাদের দেশ জননী, আমরা তাঁর সন্তান। এ সুজলা সুফলা মলয়জ-সমীরণ-শীতলা জন্মভূমি এঁকে বন্দনা কর। মহেন্দ্র সব ভুলিলেন সন্তানদলে যোগ দিয়া মহাব্রত উদ্‌যাপন করিলেন। সঙ্গী পাইলেন জীবানন্দ ধীরানন্দ প্রভৃতি আরও ভাই এবং গুরু সত্যানন্দকে। তিনি মহেন্দ্রকে মঠে লইয়া দেখাইলেন মা যা ছিলেন, যা হয়েছেন এবং যা হবেন। সেই মায়ের বন্দনা গান বন্দে-মাতরম্ বঙ্গবাসীর কর্ণে ধ্বনিত হল, বঙ্গ সন্তানের অন্তর মথিত হল, শত বীর সন্তান গৃহকোণ ছেড়ে বেরিয়ে এল দেশমাতার মুক্তি যুদ্ধে জীবন বলি দিল। লক্ষ্মণসেনের আমলে যে মাতা ডুবে ছিলেন তিনি উঠিলেন, বাঙ্গালী গাহিল সেই অমর মন্ত্র—বন্দে মাতরম্।

ঐ রকম আর একটি ঘটনা বলি, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে আমাদের বীর সুভাষচন্দ্র ছত্রপতি শিবাজীর মত শাসকদের শ্যেন দৃষ্টি এড়িয়ে ইউরোপে গেলেন, সেখান থেকে সমুদ্রের তলে দীর্ঘ যাত্রা করে সিঙ্গাপুর এলেন। সেখানে যে সকল দেশ প্রেমিক সৈনিক ইংরেজের দাসত্ব ছেড়ে সমবেত হয়েছিলেন তিনি তাদের প্রিয় নেতাজী হলেন। তিনি আওয়াজ দিলেন চলো দিল্লী—দিল্লী চলো। এই রণহুঙ্কারে আজাদ হিন্দ বাহিনী মহা উৎসাহে মালয় ব্রহ্মদেশের পাহাড় বন কাঁপিয়ে চলল, তাঁরা ভারতে মনিপুরে স্বাধীনতার পতাকা উড়াল। নেতাজী বলেছিলেন—দিল্লী চলো, যদি পথে পড়ে যাও, সেই ভারতের মাটিতে লুণ্ঠিত হয়ে বোলো জয় হিন্দ্—দিল্লীর পথ স্বাধীনতার পথ।

আরও একটি পুরাতন কথা মনে পড়ল। মৃত্যুভয় মানবের মহাভয়। সেই ভীত মানবের কানে উপনিষদের ঋষি শোনালেন—শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ—হে

অমৃতের পুত্রগণ শ্রবণ কর। ভীত হতাশ মানুষ শুনিল-উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ্ নিবোধত।

এবার আমাদের প্রসঙ্গ পরিবেশন করি। সম্প্রতি একদিন ভোরে গ্রামের পথের পাশে এক গরীবের কুটীরে একটি ছোট ছেলে বলছে শোনা গেল—মা আমাদের ঘরে কবে পিঠে হবে? আমাদের কানে এই কথার মধ্য দিয়েই বিশ্বের দরিদ্রদের, বঞ্চিতদের চিরন্তন আশা প্রকাশিত হয়েছে। দরিদ্র মানুষ চায় বর্ত্তমান হীন অবস্থা থেকে একটু স্বচ্ছল অবস্থা, যখন তারা ভাল আহার, পরিচ্ছদ ও বাসস্থান পাবে, যখন তাদের রুক্ষ মাথায় একটু তেল পড়বে। শীতের সময়ে একটা মোটা কাঁথা তারা চায়। তারা চায় তাদের ছেলে মেয়েরা যেন একটা স্কুল পায়, সেখানে স্নেহময় শিক্ষক পায়, তারা হেঁটে যেতে রাজী আছে, তারা রাজা হতে চায় না, সামান্য একটু চাষের জমি পেলেই তারা খুশি। একটু সামান্য কর্মখালি থাকলে সেখানে তাদের স্থান নাই কেননা তারা পয়সা খরচ করতে পারে না। স্বাধীন ভারতে প্রকৃত সমাজতন্ত্র স্থাপনের উদ্দেশ্য সফল না হলে, প্রতিষ্ঠানের ময়লা সাফ না হলে গরীবের আশা আকাশ কুসুমের মতই থেকে যাবে।

ছোট মুখে বড় কথা

আমাদের মত ক্ষুদ্রের পক্ষে গীতার মত বড় জিনিসের কথা বলা খুবই কঠিন; কেননা এতে অনেক দুরূহ তত্ত্বের কথা আছে। কিন্তু সামান্য কিছু খবর রাখা বড় দরকার। জগতের কাছে দেখাবার মত এই একটা জিনিস আমাদের আছে।

মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে শ্রীভগবানের মুখে এই গীতা গীত হয়েছিল। তাই এর নাম ভগবদগীতা। প্রথম বর্ণনা এইরূপ : কৌরব পাণ্ডব দুই পক্ষ সেনা সাজিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে দুপাশে দাড়িয়েছেন। অর্জুনের সারথি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। অর্জুন যুদ্ধার্থ উপস্থিত প্রিয় জ্ঞাতি বন্ধু বান্ধব সকলকে দেখে ঘোর বিষাদে মগ্ন হলেন। তিনি বললেন—আমি যুদ্ধ করবনা। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান যে সকল কথা বলে অর্জুনের মোহ দূর করলেন সেই সব কথাই এই গীতা। সর্বশাস্ত্রের সার এতে আছে।

শ্রীভগবান প্রথমে বললেন—আত্মার বিনাশ নাই। সুতরাং হে অর্জুন তুমি বৃথা মৃত্যুর কথা ভাবছ। তুমি স্থিত প্রজ্ঞ হও। অর্জুন বললেন কর্মের থেকে বুদ্ধি যদি বড় হয় তবে কর্ম করতে বলছ কেন? তখন ভগবান কর্মের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করলেন। পরে জ্ঞানযোগ বললেন আরও অনেক যোগ সাধনের ও ভগবৎ কথা বললেন। নিজের অনেক বিভূতির কথা বললেন। অর্জুন বললেন, তোমার রূপ দেখতে চাই। তখন ভগবান অর্জুনকে দিব্য চক্ষু দিলেন—অর্জুন তাঁর বিরাট বিশ্বরূপ দেখে ভয়ে কম্পিত হলেন—অনেক স্তুতি করে তাঁকে প্রসন্ন করে তার শান্ত মূর্ত্তি দেখলেন। ভগবান বললেন—আমার ভক্ত হও—যে ভগবানের ভক্ত হবে তার কি কি গুণ থাকা

আবশ্যক তা ভগবান বর্ণনা করলেন। তার পর ঈশ্বর তত্ত্ব—কুড়ি প্রকার জ্ঞান এবং জ্ঞেয় বর্ণনা করলেন। আরও অনেক দরকারী কথা বলে শেষে বললেন—তুমি সব ধর্ম ছেড়ে আমার শরণ লও আমি তোমাকে সব পাপ থেকে মুক্ত করব। গীতা মানুষের প্রাণে বল দেয়—মৃত্যুভয় দুর করে। আমাদের বীর সন্তানেরা ফাঁসির আদেশ পেয়েও বিচলিত হয়নি—মৃত্যুকে তুচ্ছ করেছে। আমরা যদি ভাগ্যবান হই তবে গীতার আশ্রয় পেয়ে ধন্য হব।

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে এই কাহিনী বলেছেন—শ্রীভগবানের অপার মহিমা দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। ভগবান বলেছেন—যাকে তাকে এসকল কথা বোলোনা— অভক্তের কাছে গীতার কথা বোলোনা। আমরা দারুণ দুঃসাহস করছি—তিনি বিচারক—তিনিই বিচার করে আমাদের শাস্তি দিবেন—তিনি অন্তর্যামি। রামানুজ আমাদের পথ দেখিয়েছেন।

নূতন দিগন্ত

সংবাদপত্র সমূহকে ধন্যবাদ; তাঁহারা আমাদিগকে কত বিচিত্র সংবাদ পরিবেশন করিয়া থাকেন। অগণ্য সংবাদের মধ্যে সমস্তই আমাদের আগ্রহ সৃষ্টি করে না ইহা সত্য, কিন্তু মধ্যে মধ্যে দুই একটি সংবাদ আমাদের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। সেই রকম একটি সংবাদ আমাদের দৃষ্টি গোচর হইয়াছে। স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন বিভাগে মহিলাগণকে অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। একটি পরিচিত প্রবাদ আছে—পাখী এক ডানায় উড়ে না—সেইরূপ সমাজের পরিচালন ভার কেবল পুরুষগণের উপর থাকিবে ইহা সঙ্গত নহে। বিশেষত যাহা গৃহস্থালীর মধ্যে সত্য—সমাজরূপ বিরাট গৃহের পক্ষেও তাহা সত্য—ইহা আমরা বিশ্বাস করি। দেশের শাসন কার্যের মধ্যে পূর্বে মহিলাদের প্রবেশ খুব কম ছিল একথা সত্য, কিন্তু তখন ইহাও সত্য ছিল যে তখন মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারও খুব কম ছিল। স্ত্রীলোকদের শিক্ষা বিষয়ে আমাদের পরমপূজ্য বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কিরূপ উৎসাহী ছিলেন তাহা সকলেই জানেন। তাঁহার মাতা ভগবতী দেবীর নাম আমাদের নিকট অতি বাল্যকাল হইতে প্রচারিত আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অর্থাৎ বালক ঈশ্বরচন্দ্রকে বাল্যকালে তাঁহার পিতা কলিকাতা লইয়া গিয়াছিলেন এবং সেখানে কোনো ভদ্রলোকের বাড়ী তাঁহারা আশ্রয় পাইয়া ছিলেন। সেখানে তাঁহার ন্যায় ক্ষুদ্র বালকের যত্ন লইবার অভাব হয় নাই। তাঁহাদের আশ্রয় দাতার বাড়ীর এক দুহিতা তাঁহাকে যেরূপ আদর যত্ন করিয়াছিলেন তাহা ভুলিবার নহে। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কিরূপ কোমল প্রাণ ছিলেন তাহা তাঁহার জীবনীকারগণ সবিস্তারে লিখিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আমি বাল্যে প্রবাসে মহানগরীতে সেই গৃহস্থ কন্যার আদর যত্ন পাইয়া ঘরের কথা ভুলিয়ছিলাম। আমাকে লোকে মেয়েদের প্রতি পক্ষপাতী বলে। বাল্যে প্রবাসে যে

সেই গৃহস্থ কন্যার যত্ন পাইয়াছে সে যদি স্ত্রীলোকদের পক্ষপাতী না হয় তাহা হইলে তাহার ন্যায় অধম মনুষ্য আর কেহ নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে শিক্ষা বিভাগে পরিদর্শক ছিলেন ইহা আমরা অবগত আছি। আমরা আরও শুনিয়াছি মহিষাদলে বিদ্যালয় পরিদর্শনে তিনি আসিতেন। সেই সময়ে তিনি এখানে স্ব-পাকে ভোজন করিতেন। এইরূপ খবর আমি মহিষাদলের কুমার দেবপ্রসাদ গর্গ বাহাদুরের নিকটে শ্রবণ করিয়াছি। আমরা স্বনামধন্য বেথুন সাহেবের নামের সঙ্গে পরিচিত আছি। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সেই বিদ্যালয় এখনও কলিকাতা মহানগরীর গৌরব।

এদেশে খুব সহজে পাশচাত্য শিক্ষা বিস্তার হয় নাই। অবশ্য আমাদের সৌভাগ্য সেই সময়ে এদেশে অনেক মহাপুরুষ দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা তথা মহিলাগণের জন্যে বিদ্যালয় স্থাপনাদি পুণ্য কার্য করিয়া যশস্বী হইয়াছেন।

কেবল শিক্ষা বিস্তার বিষয়ে নহে—ক্রমে জনসেবার ক্ষেত্রে ও রাজনীতিতে স্ত্রীলোকগণের প্রবেশ ঘটিয়াছে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস যখন হইতে স্বাধীনতা লাভের জন্য সংগ্রাম আরম্ভ করেন তখন হইতে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে মহিলাগণও সেই সংগ্রামে যোগদান করেন। বঙ্গদুহিতা সরোজিনী নাইডুর নাম কে না জানেন? স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় আমরা তাঁহার কথা এবং আরও অনেক মহিলার কথা শুনিতে পাইতাম। ভারতবর্ষের জাগরণে এবং পরবর্ত্তী স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁহাদের অবদান ভুলিতে পারি না। এখন তাঁহারা এত বেশী সংখ্যায় আসিতেছেন যে সকলের নাম স্মরণ করাও কষ্টকর হইতেছে।

স্ত্রীলোক সর্বদা গৃহকোণে থাকিবেন ইহা কেহ আশা করে না। তবে যুদ্ধ পরিচালন সময়ে তাঁহাদিগকে আমরা সম্মুখে যাইতে দিই নাই। আমরা থাকিতে মেয়েরা কেন আগে যাইবেন এই মনোভাব সম্ভ্রম সূচনা করে। কেবল ছেলেরাই যুদ্ধে যাইবে—কারাগারে, দ্বীপান্তরে, যুদ্ধক্ষেত্রে তাহারাই যাইবে ইহা আমাদের অভিপ্রেত নহে। মেয়েরাও যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন এবং দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন ইহাই আমরা আশা করি। আমরা আরও আশা করি কঠিন শ্রমসাধ্য কর্মে আমরা আগে যাইব—তাঁহারা পশ্চাতে আমাদিগকে নানা প্রকারে সাহায্য করিবেন। যে কোনো রকম যুদ্ধে অনেক রকমের লোক আবশ্যক হয়। কেবল অস্ত্রধারী সৈনিকেই যুদ্ধ করে না। পিছনে যারা রসদ যোগায়, ভার বহন করে তাহারাও সৈনিক —যুদ্ধ জয়ের গৌরব তাহাদের প্রাপ্য। সুতরাং দেশের নারী শক্তিকে কোন কারণেই পশ্চাতে রাখা আমাদের পক্ষে গৌরবের নহে।

কেবল একটি কথা মনে রাখিতে হয়। সংসার রূপ যুদ্ধক্ষেত্রে যার যেথা স্থান তাহাকে সেখানে থাকিয়া কর্তব্য সাধন করিতে হইবে। নারীশক্তি পশ্চাতে উৎসাহ যোগান দিলে আমাদের পক্ষে কঠিন সংগ্রামের সময়ে বিশেষ উপকার হইবে। সংসারে সকলেই নিজ নিজ স্থানে কর্তব্য করিলে তবেই জাতির উন্নতি ও সমৃদ্ধি আসিবে। দেশ সেবকগণের পক্ষে ইহা ভুলিলে চলে না।

আমরা খুবই আনন্দের সহিত লক্ষ্য করি যে শতাব্দীর শেষ হইতে যদিও বিলম্ব

নাই কিন্তু জ্ঞান বিজ্ঞানের কোন সীমা নাই। ইহা সর্বকালের অনুশীলনযোগ্য কর্মপ্রবাহ—যাঁহারা মানুষের হিতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহাদের একথা মনে রাখিলে যথেষ্ট হইবে যে সমাজের হিতে তথা দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য আমাদের উদ্যমের যেন কমতি না পড়ে—কখনও যেন মনে না করি যে আমাদের কাজ শেষ হইয়াছে। সম্মুখে অপার কর্ম সাগর—আমাদের বিশ্রামের সময় নাই।

মান উন্নয়ন না মন উন্নয়ন

প্রথমেই জিজ্ঞাসা করি আপনারা কি চান?—দিকে দিকে রব উঠেছে আমাদের মান উন্নয়ন করতে হবে অর্থাৎ বর্তমানে আমরা যেভাবে জীবন যাপন করি তার চেয়ে উন্নত জীবন চাই। আমাদের ধারণা আমরা বড় মন্দ অবস্থায় আছি, আমাদের মত দুঃখী আর কেহ নাই। পৃথিবীর অন্য দেশের লোকে আমাদের থেকে অনেক আরামে আছে। আমাদের দুঃখের সংসার কোনো রকমে আমরা দিন কাটাচ্ছি।

গরম ও ঠাণ্ডা দুটা অবস্থাই রিলেটিভ, তুলনায় ব্যতিক্রম হয়। সুখ এবং দুঃখও তাই; এমন কি আমরা একজন যে অবস্থায় বড় কষ্টে আছি মনে করি, এমন লোক আছে যে ঐ অবস্থায় থাকতে পেলে নিজেকে ধন্য মনে করত। সুতরাং সেদিক দিয়ে বিচার করতে যাওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র হবে। অতএব আমরা সাধারণ ভাবে পাঁচজনে কোন্ অবস্থায় বেঁচে থাকতে চাই তাই আলোচনা করি।

ধরুন স্বাধীনতা যখন হল তখন আমরা কেমন ছিলাম, আমাদের খাওয়া পরা, বাসস্থান, আমোদ উৎসব কেমন ছিল? আর চল্লিশ বছর পরে আমরা কেমন আছি? যাঁদের বয়স অন্তত পঞ্চাশ তাদের ভেবে দেখতে বলি আর জিজ্ঞাসা করি—বলুন, আপনি নিজের জীবনে কিরকম পরিবর্তন দেখছেন? দেশের ঘর বাড়ী, রাস্তাঘাট, লোকজন, হাটবাজার কেমন ছিল? এখনই বা কেমন হয়েছে—আপনার জীবনে সুখ দুঃখের, বিশ্রাম, আরামের মাত্রা কম বা বেশী হয়েছে? উত্তর পাঁচ জনের নিশ্চয় পাঁচ রকম হবে। মান উন্নয়ন অর্থে যাদের জীবন যাত্রার মান খুব নীচু তাদের উন্নতির দিক লক্ষ্য করা হয়েছে। আরও সোজা করে বলতে হয় যাদের আয় উপায় বড় কম, খাওয়া পরার খুব কষ্ট তাদের জন্য এমন কিছু উপায় করে দেওয়া যাতে তাদের আয় বৃদ্ধি হয়—তাদের সংসার চালাতে সাহায্য হয়। এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত, কিন্তু সরকারকে যা হোক একটা উপায় নিতেই হয়—তাই তারা ঐ রকম নিরুপায় লোকেদের টাকা ঋণ দিয়ে সাহায্য করে মান উন্নয়নের চেষ্টা করছেন। কতক লোককে রিকশা ভ্যান দিয়েছেন—কেউ হয়ত দরজী দোকান করছে, কেউ নাপিতের কেবিন করছে, কেউ ধান থেকে চাউল মুড়ি করছে। সরকারী টাকার সুদ কম তাই এমন লোকদের কিছু সুবিধা হচ্ছে। কোথাও বিপরীত পরিণামও দেখা যায়। যারা বিশ পঞ্চাশ টাকার জন্য মহাজনের কাছে ধর্ণা দিত তারা সহসা হাজার টাকা পেয়ে মাথা

ঠিক রাখতে না পেরে দেনার কিস্তি দিতে পারছে না—দেউলিয়া হতে বসেছে, জনগণের অর্থ বরবাদ হওয়ার সম্ভাবনা। দান খয়রাত যা করা হচ্ছে তার প্রচার মিথ্যা নয়, কিন্তু বিরাট সমাজের মধ্যে তা অতি নগণ্য ব্যাপার। তবে বলা যায় খোস খবরের ঝুটাও ভাল। দশ হাজার লোকের বাস একটা এলাকায় একটা ছেলে মাসিক সামান্য বৃত্তি পায় বা একটা বিধবা সামান্য মাসিক ভাতা পায় বা কয়েক জন বৃদ্ধ লোক সাহায্য পায় বা কোনো দরিদ্র দশ বিশ শতক চাষের জমি পায়, এ সব একত্র করে একটা জেলার প্রচার মুখর হতে পারে, কিন্তু কাজের কাজ অর্থাৎ সামগ্রিক উন্নয়ন আশাপ্রদ নয়। তথাপি বলতে পারি একটা ঘটনা যাতে সার্থকতা কিছু দেখা যায়। জনৈক গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য কোন গরীব ভূমিহীন লোককে মাত্র দশ শতক জমি দিয়েছিলেন। তিনি বলেন যার ঘরে পৌষ মাসে একমুঠা ধান আসতনা এখন তার ছেলে নিজেদের উঠানে কয়েক পন খড় দেখতে পাবে। এটা তাদের পরম সন্তোষ।

মাদার টেরেসা সত্যই বলছেন—আমাদের চেষ্টা—সমুদ্রে জলবিন্দুর তুল্য—কিন্তু ঐ এক বিন্দু জলের অভাবে সমুদ্রের একটু হলেও কমতি থাকে। যারা সেবার কাজ করবে তাদের জন্য এই রকম আদর্শই চাই। মা আরও বলছেন—মানুষ যেন এমন না ভাবে যে আমাকে দেখার কেউ নাই—আমাকে নির্বান্ধব হয়ে পৃথিবী থেকে চলে যেতে হচ্ছে।

এই আলোচনার গোড়ার দিকে কথায় ফিরে যাই। জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন নিশ্চয় কাম্য কিন্তু তার আগে দরকার মন উন্নয়ন। আমরা যে কঠিন সমস্যায় পড়েছি, শতশত ক্ষুধিত প্রাণীকে বাঁচাতে চাইছি তার জন্য মনকে উন্নত করে লাগতে হবে। কেবল মান যশ বা লোকপ্রিয়তার দিকে লোভ করলে চলবে না।

অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে নিবেদন করি যে, একটি জাগ্রত মানবপ্রেমিক ভারতীয় জাতির সেবায় যারা নিয়োজিত হতে চান তাঁদের মধ্যে উন্নত মনের নিশ্চয় অভাব হবে না।

রাস্তার শ্রমিক

বেলা তখন প্রায় একটা—মাথার উপরে খর রৌদ্র, জাতীয় সড়কের উপরে পিচ গালিয়ে রাস্তা মেরামত করছেন শ্রমিকের দল—আমরা গাড়ীর ভিতরে আরামে বসে লক্ষ্য করছি। শ্রমিকদের মধ্যে মেয়েরাও আছেন। তাঁরা মাথায় করে পাথরকুচি বহন করে দিচ্ছেন। এ দৃশ্য আমাদের চোখের সামনে দেখছি—আশ্চর্যের কিছু নাই।

সন্ধ্যার পর ইটখোলার পাশ দিয়ে যাচ্ছি—সেখানে অন্ধকারের মধ্যে শব্দ হচ্ছে, শ্রমিকেরা ইট বহন ও সাজান কাজ করছেন। শ্রমিকগণ তিনদফায় কারখানায় কাজ করছেন দলে দলে—কেহ রাত্রে, কেহ দিনে একথাও আমরা জানি। কিন্তু তাঁদের কথা

আমরা কতটুকু চিন্তা করি? আমরা দেখছি রাস্তার পাশে নীচে ছোট একখণ্ড হোগলার নীচে তাঁদের বাসা। কত দূরের সবুজ বনাঞ্চল ছেড়ে শত শত মাইল দূরে তাঁরা এসেছেন। তাঁদের মাথায় উপর দিয়ে দিনরাত রোদ বর্ষা যাচ্ছে। আমরা জনগণ তাঁদের কথা চিন্তা করে দেখব—তাঁরা যে আমাদের জন্য পরিশ্রম করছেন—শ্রদ্ধার সঙ্গে কোনদিন আমরা স্মরণ করেছি কি?

উত্তরে বলা যায়, হাজার হাজার মানুষ শতশত কর্মক্ষেত্রে স্থলে জলে আমাদের জন্যে খাটছেন—তাঁরা পারিশ্রমিক পাচ্ছেন, তাঁদের কথা ভাবব কেন?

মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ প্রাণী। তারা মনে করে মূল্য দিয়ে আমরা ঋণ শোধ করছি, আর আমাদের কর্তব্য নাই।...

পশ্চিম জগতে একটা ধারণা ছিল যে মালিকেরা শ্রমিকদের বঞ্চিত করে বড়লোক হয়ে যায়। শ্রমিকের জন্য শুধু দারিদ্র্য ও হীনতা থাকে।

সুতরাং দুনিয়ার শ্রমিক সংঘবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম কর। দাসপ্রথাও ঐ রকমের ব্যাপার ছিল। স্বাধীনভারতে বেগার মোচনের কাজ এখনও চলছে। উদ্দেশ্য মানুষের সম্মান চাই—মর্যাদা চাই।

স্বাধীনতা প্রাপ্তি খুব বেশী দিন হয়নি। তথাপি আমাদের দেশে প্রথম থেকেই সরকারের লক্ষ্য এই দিকে আছে। সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে নয়—আইনের মাধ্যমে শোষণের ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করে ভারতের জাতীয় মহাসভা সংবিধান মারফতে একে একে নিরাকরণ করতে যত্নবান আছেন। যারা বেশী সম্পত্তি রেখেছিল তাদের হাত থেকে ছাড়িয়ে দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করা চলছে। ফল অবশ্য এখনও আশানুরূপ হয় নাই।

কলকারখানার আয় থেকে মজুরীর অতিরিক্ত লভ্যাংশ শ্রমিকদের মধ্যে বণ্টন করা হয়ে থাকে। তবু যেন মনে হয় মহাত্মা গান্ধীর কথিত শ্রেণীহীন শোষণহীন সমাজ আজও বহুদূরে আছে। মানুষকে আমরা কতটা মর্যাদা দিচ্ছি সেখানেই এর পরীক্ষা হবে।

আরম্ভ করেছিলাম রাস্তার শ্রমিক দিয়ে। এমন মানুষ কে আছেন তিনি মায়ের কোলে পালিত হন নাই? আজ আমাদের সেই মায়েরা রাস্তার শ্রমিক—মাথায় করে পাথর বইছেন—রাস্তার সেই মায়েরা ময়লার গাড়ী ঠেলছেন, কোথাও মাথায় করে বহন করছেন। আমাদের আজ মানব সন্তানরূপে মুখ দেখাবার কি যোগ্যতা আছে? এককালে মায়েরা মাথার চুল কেটে ছেলেদের ধনুকের ছিলা বানাতেন—সেই মায়েদের মর্যাদা আমরা কতটা রাখছি? পয়সা দিয়ে কতটা সম্মান রাখা যায়?

সভ্যতার বড়াই আমাদের সাজে না। বেতার দূরদর্শনের কল্যাণে অনেক কিছু শুনেছি, দেখেছি কিন্তু এ সমস্তই বাইরের ব্যাপার। অন্তরের মানবিকতাকে জাগাতে আমাদের যে জ্ঞান দরকার তা হল মানুষের প্রতি সম্মান ও মমত্ববোধ। আসুন এই আলোকের পথে, সংঘর্ষের পথে নয়—মায়েরা আমাদের আশীর্বাদ করবেন। আমরা যথার্থ মানব সন্তান হব।

আমি ও শিশু ছিলাম

এই লেখার শিরোনাম অন্যরকম হতে পারে। যেমন-আপনিও একদিন শিশু ছিলেন। আমরা সংসারে যখন আসি তখনকার অবস্থা নিয়ে কেউ কেউ বলেছেন, মানুষের সব জ্ঞান ছিল, কিন্তু জন্ম মাত্র মহামায়া জ্ঞান হরি লয়—তাই মানুষ পঞ্চভূতের ফাঁদে পড়ে এমন অবস্থা হয় যে এই জীবনে কি করতে হবে তার নিশানাও ঠিক থাকে না। শৈশবে মানুষের খেলাধূলায় মন, ক্রমে ঠোকাঠুকি লেগে জ্ঞান বাড়তে থাকে, সংসার চক্রে জড়িয়ে পড়ে। বিশাল মানব সমাজে ব্যক্তির অস্তিত্ব নগণ্য হয়ে যায়। মানুষ দেবতা হতে পারে, অসুরও হতে পারে।

একবার ইংরাজি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে অনুবাদ করার জন্য একটি লেখা দেখেছিলাম : এক চিত্রকর মনে করেন তিনি নিষ্পাপ মানুষের ছবি আঁকবেন—তিনি খুঁজতে লাগলেন। একদিন দেখলেন সমুদ্রতীরে একটি ছোট ছেলে খেলা করছে। তাঁর মনে হয় এই শিশু আদর্শ হতে পারে। তিনি তাঁর ছবি আঁকলেন। সকলে দেখে প্রশংসা করতে লাগলেন। তারপর অনেককাল গত হয়ে গেল। চিত্রকর বৃদ্ধ হয়ে কর্মে অপটু হয়ে পড়লেন, তথাপি মনে করলেন তাঁর সেই অপূর্ব শিল্পকর্মের বিপরীত একটা ছবি করবেন। চিত্রকর খোঁজ করতে করতে দেশের কারাগারে সাক্ষাৎ পাপের মূর্তি এমন একটি মানুষ দেখতে পেলেন। সে শরীরেও মনে সাক্ষাৎ পাপের মূর্তি ছিল—অন্ধ ও জীর্ণদেহ তার কদাকার হয়েছিল। চিত্রকর তাকেই মনোনীত করলেন ও তার ছবি আঁকলেন। এই ছবি দেখেও লোকে পূর্বের মতই চিত্রকরকে প্রশংসা করতে লাগল। তিনি পরে জানতে পারলেন ঐ শয়তান লোকটি তাঁর প্রথমজীবনের ছবির সেই নিষ্পাপ শিশু ছিল। সঙ্গদোষে ও নানা পাপকর্মে সে অধঃপতিত হয়েছিল।

এই কাহিনী ইঙ্গিত করে যে মানুষ বাল্যে ঠিকই থাকে পরে কুসংসর্গে পড়লে তার মন মন্দের দিকে যায়, প্রকৃত জ্ঞান লোপ পেয়ে যায়। যদি সে নিজের ও অপরের বাল্যজীবন স্মরণ করে চলতে পারে তাহলে পাপের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা সকলের শোনা আছে। মহামুনি ব্যাসদেব তাঁর শেষ জীবনে এই লীলা বিস্তার করে লিখেছেন। বিরাট সব শাস্ত্র লিখেও তাঁর তৃপ্তি হয়নি, এমন কি তিনি ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। ব্যাসদেব বলেছেন তাঁর তিনটি দোষ হয়েছে। তিনি বলেছেন—হে ভগবান, তুমি রূপবিবর্জিত অথচ আমি তোমার রূপ ধ্যানে কল্পনা করেছি, তুমি অনির্বচনীয় অথচ আমি তোমার রূপ ধ্যানে কল্পনা করেছি। তুমি অনির্বচনীয় অথচ আমি স্তবস্তুতি করে তোমার অনির্বচনীয়তাকে দূরীকৃত করেছি—তুমি সর্বব্যাপী অথচ আমি তীর্থযাত্রাদির বিধান দিয়ে তোমার ব্যাপিত্ব খণ্ডন করেছি। তুমি আমার তিনটি দোষ ক্ষমা কর। শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করতে গিয়ে ব্যাসদেব তাঁর বাল্যলীলা কেন দিলেন আমরা তা একটু চিন্তা করি। তাঁর সেই বাল্যলীলা কেমন ছিল! সেই শ্যামলী ধবলী গাই—সেই শ্রীদাম সুদাম দাম

বসুদাম প্রভৃতি সখা তাদের নিয়ে গোচারণ—মানুষকে ভগবানের কাছে এনে ফেলেছে, বোধহয় মানুষ ভগবানকে এতদূর দিয়ে দেখতে পারেনি।

এতে লাভ আছে ষোল আনা—জীবন যুদ্ধের সৈনিকের পোষাক এই বাল্যভাব—শ্রদ্ধা ভক্তি করে আমরা যদি এই কৃষ্ণলীলাকে বুঝতে চেষ্টা করি আমাদের লাভ আছে। শয়তানকে ঠেকাতে এমন মহা অস্ত্রে আমাদের লাভ হয়, আমরা নিরাপদে থাকি।

সেকালে পাঠশালার পুস্তকে ছোট ছোট কবিতা থাকত— বালকদের সেগুলি পাঠ করলে লাভ হোত। দর্পণের উপরটা যদি পরিষ্কার হয় তাহলে তাতে ভাল দেখা যায়। ছেলেমানুষেরা ভগবানের বেশী কাছে যেতে পারে। ইংরেজ কবি টমাস হুড তাঁর কবিতায় বলেছেন—আমি স্মরণ করি—যখন ছোট ছিলাম তখন মনে করতাম ফার গাছগুলি যেন আকাশের গায়ে লেগেছে। এটা বালকের অজ্ঞতা বটে কিন্তু একথা ভেবে খুশী হইনা যে এখন আমি ভগবানের থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছি। আগে আমি অনেক নিকটে ছিলাম।

এখন এই ছেলেমানুষী লোকের চোখে ভাল লাগে না। বয়সে বালক বচনে নয়, সে ছেলেকে মন্দ সকলে কয়। আমাদের একটু ভেবে দেখতে হবে আমরা ছেলেমানুষ হব ঠিক, কিন্তু ছেলেমানুষী কোরব না। সংসার বড় কঠিন জায়গা—আমাদের চশমার রং যেমন হবে—দৃশ্য তেমন রঙীন হয়ে যাবে। লোক যদি পাগল বলে কর্ম্মজীবন মাটি হয়ে যাবে। তাই একটু বুদ্ধি খরচ করতে হবে। নিতান্ত ভাবাবেগে চলবে না। আবার আমিই সব বুঝি আর সকলে কিছু বোঝে না এই মতুয়া বুদ্ধি ছাড়তে হবে। হাজার বছর যে প্রথা চলে আসছে তা বিবেচনা করে দেখতে হবে। বিশেষত আমরা পশ্চিমের সভ্যতার যে সকল সুবিধা ভোগ করছি তা ছাড়তে পারা যাবে না। আবার যে যার তহবিলের দিকেও নজর রাখতে হবে। দশে মিলে করি কাজ এই হবে আমাদের মন্ত্র—শ্রদ্ধাই হবে প্রধান কাজ।

উলট পুরাণ

ভগবানবাবু অনেক দিন টিকে আছেন। আরও বহুদিন কেন বহু বছর থাকতেও ইচ্ছা ছিল, কিন্তু যে রকম দিনকাল পড়েছে তাতে তাঁর এখন বৈরাগ্য এসে গেছে। বিশেষত তাঁর অগণ্য ছেলে মেয়েদের এখন আর তাঁকে মান্য করার ইচ্ছাই নাই। একদল বলে ওঁকে না মানলেও চলবে, আমাদের ভাল মন্দের বন্দোবস্ত আমরা নিজেরাই করে নেব। অপর দল বলে, বাপের নামটা রাখতে হবে নইলে বংশের মর্যাদা থাকবে কেন? তবে সেজন্য যে বাপকে মান্য করে চলতে হবে তার কোন কারণ নাই। নাম ও নামী অভেদ অতএব নামটা ভাঙ্গিয়ে যতদূর চলে চালিয়ে যাব।

ভগবানবাবু নিতান্ত বিরক্ত হয়ে ঠিক করলেন, তাঁর যা সম্পত্তি আছে সব

ছেলেকে বাঁটোয়ারা করে দিবেন। ভাগ করতে গেলে কম বেশী কিছু না কিছু হবেই, তা সেটা ভাবতে গেলে আর ভাগ করা যায় না তাই তিনি সে বিষয়ে লেখকের পরামর্শ চাইলেন [লেখকরা যে সর্বজ্ঞ একথা কে না জানে]? লেখক অনেক দিক দেখেশুনে যেরূপ বললেন তা তাঁর মনে কিছু কিছু লাগল। কিন্তু সবটা সমান করার মত বুদ্ধি বা যুক্তি তাঁর ছিল না, তাই তিনি তাঁর এষ্টেটের এক একটা দিক এক এক জনকে দিলেন। বড় ছোট বিচার না করে যেটা যখন সামনে পড়ল সেটাই একজনকে দিলেন। ছেলেরা ইতিমধ্যে তাঁর সম্পত্তির মধ্যে নানাস্থানে নানারকম বুদ্ধি খাটিয়ে কত কিছু বানিয়েছে সেগুলো তিনি গ্রাহ্য না করে তাঁর জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে যা কিছু ছিল তাই প্রথম থেকে ভাগ করে দিতে লাগলেন। এক ছেলেকে বললেন—মাটির নীচে যে কালোমাণিক আছে সেগুলো তোমাকে দিলুম। আর জনকে বললেন মাটির আরও গভীরে যে গ্যাস বা তেল মিলবে তা তুমি নিও—ওতেই তুমি অনেক ফলাতে পারবে। তৃতীয় জনকে বললেন—বড় বড় মাঠগুলো তোমাকে দিলাম তুমি ও তোমার ছেলেরা ওখানে খেটে নিজেদের ভাত কাপড়ের যোগাড় করে নিও। চতুর্থকে বললেন—তোমাকে জলভাগটা দিয়ে দিলুম এর মাঝখানে ত ভাগ করা যায় না। সুবিধার জন্য ডাঙ্গা ভাগের মাঝে মাঝে একটা করে নাম দিয়ে দিও আর যা পার করে খেও। এক জনকে পাহাড়, আরেক জনকে নদী, আর এক জনকে বন, এইভাবে সব ভাগ করে দিতে লাগলেন। শেষে পড়ল মরুভূমি, কোনো ছেলেই নিতে চায় না। ভগবানবাবু বললেন—আচ্ছা, ওর মাঝে মাঝে কিছু খেজুর বাগান করে দিচ্ছি সেখানে কিছু জলও দিচ্ছি আর চারিদিকে বালু আছে গোটা কয় উট আর ঘোড়া নিয়ে বেশ মজাসে দিন কাটাও বাপু।

এখনও অনেক ছেলে দাঁড়িয়ে আছে ভাগের আশায়—কর্ত্তা নিরুপায় হয়ে বললেন—বাপু সকল, তোমাদের দেওয়ায় মত এদিকে ত তেমন কিছু নাই, তবে আমার তহবিলে সামান্য যা কিছু আছে তাই ভাগ করে দিচ্ছি—যদি চালিয়ে খেতে পার এতে তোমরা আর সকলের মত বা তাদের থেকেও সুখী হতে পারবে। এ জিনিসটা হচ্ছে বুদ্ধি—চালাতে পারলে এর থেকে অনেক বিদ্যাও এসে যাবে আর আমার গুপ্ত শক্তিগুলোও তোমরা পেয়ে যাবে। আমার বিজলী বলে যে মেয়েটা আছে তাকে যদি একটু পটিয়ে নিতে পার তবে তোমাদের চোখ খুলে যাবে, দেখতে পাবে অনন্ত সুখের ভাণ্ডার তোমাদের সামনেই এসে গেছে। তোমাদের অনেকে গবেষণা করে যে বড় বিদ্যাটা বার করেছ তার দ্বারা অনেকের পোষণ হবে। আর মোদ্দা কথা কি জান, জন কয়েক যদি গরীব ও দুঃখী না হও তাহলে আর দশজনের দয়া ও পরোপকার ধর্ম পালন হবে কিরূপে? তারা যে আমার বাগানে আসবার জন্য কত রকম ফিকির করছে তাদের কি হবে? তাই তোমাদের অনেকে দুঃখী হবে বলে দুঃখ কোরো না। আমাকে সব দিক চেয়ে কাজ করতে হয়।

শেষের দিকের কয়েক জন বললে, বাবা, যে রকম ভাগ করে দিলেন তাতে আপনার ছেলেরা ত সব সময়ই কম বেশী পেয়েছি বলে পরস্পরকে ঠকাতে চাইবে,

আর তা নিয়ে বার বার লড়াই দাঙ্গা ফেরেববাজী চলতেই থাকবে, যাতে সাম্য হয় এমন একটা কিছু উপায় করে দেন না! ভগবান বাবু বললেন—বাপু সব, আমি ত বুদ্ধি দিয়েছি—সেটা খাটিয়ে নিজেরাই সাম্য করে নিও—আমাকে আর কষ্ট দিও না।

ছেলেরা এ ওর মুখের দিকে চায়—ইঙ্গিতটা যে ঠিক কি রকম কারো মাথায় আসছে না। শেষে কয়েকজন বলল—এস, গবেষণা করি কি উপায়ে অপরকে সহজে ধ্বংস করতে পারি। এই মাটির ভিতর থেকেই মাল মশলা সব যোগাড় করে লাগিয়ে দেব যুদ্ধ, যারা জিতবে তারা থাকবে, অপর দল লোপ পাবে। এখন লোপ পেয়ে মহাশূন্যে মিলিয়ে যেতে কেউ চায় না। ফলে ভগবান্ বাবুর ছেলেরা নানা জায়গায় আস্তানা বানিয়ে লড়াইয়ের ফিকিরে লেগে গেল। মানুষের সুখ হবে কি দুঃখ হবে তা কেউ ভাবলে না—সকলেই প্রভাস যজ্ঞে মত্ত হয়ে পড়ল।

আস্তানাগুলো নাম জানতে পাঠকের নিশ্চয় আগ্রহ হবে। সবগুলোর সন্ধান পাওয়া কঠিন। তবে কয়েকটার নাম যোগাড় করা গেছে যথা—ফাঁকিস্তান, উজবুকীস্তান, বেল্লিকবাজার, উল্লুকনগর, আহাম্মকপুর, বেকুবাবাদ, বেহায়াপাড়া ইত্যাদি।

যাঁরা ঐ সব জায়গা পরিদর্শনের ইচ্ছা করবেন তাঁরা ডাক খরচসহ লেখকের নিকট চিঠি দিতে পারেন, কিন্তু উত্তর পাবেন কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে আর পাশপোর্ট মিললেও ফিরে আসার ভিসা পাওয়া যাবে না। সুতরাং সাবধান!

সংসারে এত দুঃখ কেন

সকলেই বলেন ভগবান দয়াময়, করুণাময় ও মঙ্গলময় অর্থাৎ তিনি দুঃখীর দুঃখ দূর করতে চান। তাঁর অন্তরে ব্যাথিতের প্রতি সমবেদনা আছে এবং তিনি যা করেন তা জীবের মঙ্গলের জন্য করেন। [অবশ্য যাঁরা তাঁকে মানেন না বা তাঁর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না তাঁদের কথা স্বতন্ত্র] তথাপি সংসারে কেন এত দুঃখ কষ্ট তা নিয়ে বড় বড় মহাপুরুষ গবেষণা করেছেন। ঠিক কথা বলতে গেলে এ নিয়ে যত পুস্তক লেখা হয়েছে তা পড়া সম্ভব নয়। হিমালয়ের সঙ্গে তুলনা দেওয়া যায়।

সম্প্রতি কলিকাতার একটি খবরের কাগজে একজন মনীষীর লেখার কিছু অংশ ছাপা হয়েছে। তাঁর সিদ্ধান্ত—ভগবানের মধ্যে মঙ্গল ও অমঙ্গল দুইই আছে। তার্কিকেরা কথাকে দুই দিকেই ঘোরাতে পারেন। আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধি বেশীদূর যেতে পারি না, তবু সর্বদা যা দেখেছি তাতে সংসারে যে নানা রকমের দুঃখ কষ্ট আছে একথা অস্বীকার করা যায় না। ভগবান জীবদের সংসারে আনালেন—তাদের সুখদুঃখের মধ্যে ফেলে দিয়ে তাঁর কি লাভ আছে? তিনি তো কেবল সুখ দিতে পারতেন। সত্যিই আমরা বড় গোলে পড়ে গেলাম।

তাঁর লীলার কুলকিনারা করা আমাদের সাধ্য নয়। অন্ধ লোকদের হস্তীদর্শনের মত আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি কিছুদূর গিয়ে থেমে যায়। যখন শুনি তিনি ভয়ানাং ভয়ং, ভীষণং ভীষণানাং তখন ভয়ে কম্পিত হই। আবার যখন কবিকণ্ঠে শুনি তিনি কত ভাবময়, কত প্রেমময়, কত দয়াময়, তখন মনে ভরসা আসে। সংসারে চারদিকে ক্ষণে ক্ষণে যে সব দুর্যোগ দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে, এবং অনিবার্য ক্ষয় ক্ষতি স্বীকার করতে হচ্ছে, তখন চিন্তা হয়, কেন তিনি এত দুঃখ কেবল মানুষ নয় অন্য সকল জীবগণকেও দিলেন। পাপ, পুণ্য স্বর্গ নরকাদি সব ধর্মের লোকদের মধ্যেই আছে।

আমাদের সংসারটা কি নিয়ে চলছে তা লক্ষ্য করলে দেখি একটা মায়ার খেলা চলছে এবং তার প্রতাপ দেখে কেউ বলেন যোগমায়া, কেউ বলেন দৈবী মায়া, কেউ বলেন মহামায়া। এই মায়া যদি একটু সরে যায় সংসার তাসের কেল্লার মত খসে পড়ে যাবে। মানুষ ত দূরের কথা অতি হীন সামান্য জীবের মধ্যেও এই মায়ার খেলা কাজ করছে। বাঘের মত হিংস্র প্রাণী জগতে নাই—কিন্তু বাঘিনীর তার সন্তানদের প্রতি মায়া কত বেশী দেখা যায়। পাছে বাঘ তার লোভী স্বভাবের জন্য বাচ্চা খেয়ে ফেলে, বাঘিনী-মা তার ছোট বাচ্চাদের নিয়ে লুকিয়ে থাকে কয়েক মাস, তারপর বেরিয়ে আসে। পাখীর ছানাদের বাসায় তাদের বাপ-মা ঠোঁটে করে খাবার এনে তাদের খাওয়ায় আমরা দেখেছি। মানুষের ঘরেও মায়ার কি নিদারুণ প্রভাব। ভিখারিনি শীর্ণ শরীরে ক্ষীণ কণ্ঠে গৃহস্থদের দুয়ারে এসে বলে মা, আমার ছেলেটা ক্ষুধায় বড় কাতর হয়েছে, একে এক মুঠা কিছু দাও। বিশ্ববন্দিতা মা টেরেসা স্টেশনে যাত্রীদের কাছে আবেদন করেন—খাবার বেশী হলে ফেলে দেবেন না—আমাকে দিন। প্রাপ্ত খাবার তাঁর ঝুলিতে নিয়ে রাস্তার ক্ষুধিতদের তিনি দেন—এই স্বর্গের দৃশ্য আমরা দেখেছি। মৃত্যুপথযাত্রী অভাগাদের কাছে মা মহামায়া কত না রূপে প্রকাশিত।

এই মহামায়ার বন্ধনে জগৎ বাঁধা পড়েছে, একে ছাড়িয়ে যাবার উপায় নাই। সকলের পরিচিত সেই গান—কে না জানেন—'বিল করে ঘূনীপাতে/মীন প্রবেশ করে তাতে—যাতায়াতের পথ খোলা / তবু মীন পালাতে নারে।' গুটিপোকা ইচ্ছা করলে কেটে বেরিয়ে যেতে পারে, কিছু মহামায়ায় বদ্ধ গুটি আপনার জালে আপনি মরে। এই সংসার বন্ধন কেউ কাটতে চায় না—সুখের হোক বা দুঃখের হোক একটা বন্ধন ত বটে। মানুষের বড় যন্ত্রণাকে আমরা মরণ যন্ত্রণা বলি। তার উপর যদি সুখে স্বচ্ছন্দে কাল কাটে, সংসার ছেড়ে যেতে বড় কষ্ট হয়। মানুষকে নানারকম আপদবিপদের মধ্যে ফেলে দয়াময় ভগবান সংসার বন্ধন ছেড়ে যেতে জীবকে সাহায্য করার জন্য বোধহয় এত দুঃখ কষ্ট দিয়েছেন। তাঁর সন্তানেরা স্বর্গ থেকে চ্যুত হয়ে পড়ে গেছে, আবার যাতে তারা স্বর্গে যেতে পারে তাই তাঁর নূতন রূপে আবির্ভাব। যাকে ছাড়তে হবে তার কিছু দোষ দর্শন করতে হয়—এমন শাস্ত্র বাক্য আছে, মহাজনের উপদেশও আছে। সংসারে দুঃখ কষ্টের জন্য ভগবানের উপর অভিমান করবেন না। তাঁকে সব দিক দেখতে হয়—তিনি যে সবার ঠাকুর।

ভয়ের গোড়াটা কোথায়?

দিন দুবেলা আপনাদের কানে আসছে—বিশ্বের কত দেশে আনবিক বোমা বিস্ফোরণ হচ্ছে—কেমিক্যাল, জীবাণু বোমা নিয়ে যুদ্ধ চলছে—কত রকম গ্যাস আবিষ্কার হচ্ছে। আপনাদের মনে নিশ্চয় ভাবনা হচ্ছে—হয়ত ভূমিকম্পের মত ব্যাপার ঘটে মানবজাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সকলেই উদ্বিগ্ন এবং এটা খুবই স্বাভাবিক।

হিতোপদেশ গ্রন্থে বলেছে সাতরকমে মানুষের বিনাশ হতে পারে—জল, অগ্নি, বিষ, শস্ত্র, ক্ষুধা, ব্যাধি এবং পর্বতাদি থেকে পতন। সুতরাং মানুষের বিপদের শেষ নাই। মানুষের হাতে ঘরে ঘরে কত রকমের অস্ত্রশস্ত্র আছে। কোনো কোনো গ্রামে বহু লোকের বাড়ী বন্দুক পিস্তল আছে—সমাজবিরোধী লোকেরা কত বোমা বানিয়ে ঝোলায় নিয়ে ঘুরছে। তবু আমরা দিন রাত কাটিয়ে বেঁচে আছি এবং অনেকে মনে করেন এটাই বোধ হয় সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার। কখনও মনে হয় আমাদের বুঝি দাঁড়াবার স্থান নাই। যাঁরা ভগবান মানেন না তাঁদের একটা সুবিধা আছে। যে কোনো অবস্থাতে তাঁরা নিজেদের উপর নির্ভর করেন। অন্যেরা ভগবানের দোহাই দিয়ে তাঁর কাছে দয়া ভিক্ষা করেন এবং মনে করেন তিনি রাখতে হয় রাখবেন, আর যদি তা না করেন কার সাধ্য আছে এই পতিত মানবসন্তানকে রক্ষা করে!

একটু ভেবে দেখতে বলি—আমাদের সকলের কাছেই ছোট বড় কোনো না কোনো রকমের অস্ত্র আছে, এবং আমরা ইচ্ছা করলেই তাদের ব্যবহার করতে পারি। পুরাণকারগণ বলরামের লাঙ্গলকেও অস্ত্র বলে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি চক্রধারী কৃষ্ণের দাদা। কিন্তু আমরা অস্ত্র থাকলেই তা ব্যবহার করব, অপরকে আঘাতের জন্য এমন তো হয় না। আমাদের মধ্যে একটা মানুষ আছে সে সংযত হয়ে চলে এবং তার বিবেক আছে। তাই ক্ষণে ক্ষণে বিবাদ ও শস্ত্রের সঞ্চালন হয় না। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় গাড়োয়ালী সেনারা নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি চালাতে অস্বীকার করে দণ্ড গ্রহণ করেছিল। মানুষ না হলে অস্ত্র চলে না এবং আণবিক বোমা আপনি এসে কোথাও পড়েনি। কেহ না কেহ কোন স্থানে বোমা স্থাপন করে—তা যথা সময়ে বা ধাক্কা পেয়ে ফেটে যায় ও ধ্বংসের কাজ করে। আঘাতের প্রবৃত্তি আসে হিংসা থেকে এবং মানুষের মনের মধ্যে সে বাসা করে আছে। মানুষ তাকে নানা পথে দমন করে রেখে তবে সংসারে জীবনযাপন করে। মানুষকে এই বিষয়ে সাহায্য করার জন্য মহাপুরুষগণ সর্বদা সচেষ্ট আছেন এবং যারা তাঁদের মান্য করে চলে তারা ঠিক পথেই থাকে। কোনো কোনো নরদানব তাঁদের অবজ্ঞা করে দম্ভ ভরে পৃথিবীর লোকদের দমিত রাখতে চেয়েছিল—আবার এই বিশ্বের ছোটবড় অনেক শক্তি একত্র হয়ে তাদের যুগে যুগে দমন করেছে। সেই উপলক্ষে বড় বড় বিশ্বযুদ্ধ হয়েছে—এখনও কোনো কোনো দেশে যুদ্ধ চলছে—দুই পক্ষ একে অপরের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে মানুষ ও সম্পত্তি ধ্বংস করে চলেছে। তারা কারো মানা মানছে না। একথা ভাবা বোধহয় যুক্তিসঙ্গত যে আগুন যেমন পোড়াবার মত পদার্থ আর না পেলে

আপনিই নিবে যায় তেমনি তাদেরও একপক্ষ বা দুইপক্ষ একদিন নিরস্ত হতে বাধ্য হবে। হয়ত তখন উভয়পক্ষ কেউ থাকবে না।

অতএব আসুন আমরা নিজেদের অন্তরকে হিংসাশূন্য করি ও অপরের অন্তরকে কোমল করতে চেষ্টা করি। ভয়ের উৎস মানুষের মনেই আছে—প্রার্থনা করি মানুষ সকলে আর একটু বুদ্ধিমান হউন। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে মানুষ যে বুদ্ধি প্রকাশ করে আজ বিশ্বজয়ী সেই বুদ্ধিকে ঐ অভিনব পথে, মহাত্মাদের পথে চালিত করে বিশ্বকে রক্ষা করুন।

আমরা ভগবানের আশ্রিত

আমাদের একজন মনীষী বলেছেন—বাঙালী একটি আত্মবিস্মৃত জাতি। এই কথার প্রতিধ্বনি করে আমরা বলতে পারি—কেবল বাঙালী নয় আজকালকার মানুষ ভুলে আছেন তাঁরা ভগবানের আশ্রিত। আমাদের দৈনন্দিন আচারবিচার যে রকমই হোক্ না কেন, বিচার করে দেখলে বোঝা যায় আমাদের পূর্বপুরুষগণ বর্তমান সময়ের মত বাহ্যত সুবেশ ও সুসভ্য না হলেও ভগবৎ চিন্তায় বিরূপ ছিলেন না। মানুষের দুর্বলতা তাঁরা জানতেন, তাই অতি প্রাচীনকাল থেকে যে সব আচার বিচার করে তাঁরা চলতেন তার কিঞ্চিৎ এখনও আছে এবং আমাদের সৌভাগ্য যে সেই সমাজের মধ্যে থেকেই এই বিজ্ঞানালোকিত ভোগ সর্বস্ব সমাজের মধ্যেও প্রকৃত সন্ধানী লোক মাঝে মাঝে আবির্ভূত হয়েছেন।

আমরা গভীর অধ্যাত্মতত্ত্বের আলোচনার মত ক্ষমতা ধরি না—সেজন্য বাহ্য আচারবিচারাদির কথাই বলতে চেষ্টা করি। আমাদের গ্রামের হিন্দু অধিবাসীগণের যেখানে সঙ্ঘবদ্ধ বসবাস আছে, সেখানে দৈনন্দিন কিছু আচারের দিকে লক্ষ্য করি। ঐ রকম যে কোনো একটি গ্রামের দিকে লক্ষ্য করুন। গ্রামের প্রতি বাড়ী লক্ষ্য করুন। যে কোনো বাড়ীতে গেলেই আপনার সামনে পড়বে বাড়ীর সদরে দক্ষিণ দিকে [বাম দিকে কোথাও দেখবেন না] একটি তুলসীমঞ্চ আছে এবং প্রতিদিন তা সংস্কার করা হয় তার প্রমাণ পাবেন। প্রতিদিন ভোরে অনেক বাড়ীতে শঙ্খধ্বনি করা হয়, উদ্দেশ্য সকলকে জানান যে আর একটি দিনের আগমন হল—হে মানব, তোমার কর্তব্য কর্মের জন্য প্রস্তুত হও—মনে রাখ, ভগবান আর একটি দিন তোমাকে দিলেন। তুমি যে কতদিন এই জগতে থাকবে তার কোনো খবর তোমাকে দেওয়া হয় নাই—যে কোনো সময়ে তোমার ডাক আসতে পারে। সুতরাং তুমি স্মরণ করে নাও অন্তত একটা দিন তুমি পেয়েছ—এর পরে হয়ত কর্ম কোলাহলে সব ভুলে যাবে, তাই এখন প্রস্তুত হয়ে সংসারের কাজে ঝাঁপ দাও।

আরও লক্ষ্য করবেন প্রতি গ্রামে বা পল্লীতে একটি দেবালয় আছে—দরিদ্র পল্লী হলেও দেখবেন ঠাকুর ঘর ইষ্টক নির্মিত। স্থাপন কর্তাগণ বিবেচক ছিলেন, ভবিষ্যতে

যারা আসবে তারা আমাদের মত শ্রদ্ধাশীল নাও হতে পারে তাই ঠাকুরঘর পাকা করে দিয়ে যাই, স্থায়ী হবে—এই ছিল তাঁদের ধারণা।

তারপর দেখবেন, প্রতি গ্রামে ব্যাধির দেবতা শীতলাদেবী আছেন। [শোনা যায় কেরল দেশেও তিনি আছেন।] কেননা মানুষ রোগ ব্যাধির কবলে সর্বদাই পড়তে পারে। কোথাও কালী আছেন। রাঢ় দেশে স্থানে স্থানে তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন নাম—ঐ নামেই তাঁরা শত শত বছর পূজিত। মানুষের এমন আত্মবোধ যে তাঁরা তাঁদের ঠাকুরকে কোথাও নাম দিয়েছেন—সর্বমঙ্গলা, কোথাও মুক্তেশ্বরী, বিশালাক্ষী, সিংহবাহিনী, ভীমা—কোথাও কঙ্কালী, শ্যামা প্রভৃতি। সর্পসঙ্কুল এই দেশে অনেক গ্রামে মনসা মন্দির আছে। অগণ্য গ্রামে মহাদেবের মন্দির আছে। অধিকন্তু বাৎসরিক পূজাপার্বণ হয় এমন দেবদেবী আছেন অগণিত। আমাদের গ্রামে বাঘের দেবতা দক্ষিণ রায়, তাঁর সেনাপতি কুমীরের দেবতা কানু রায় আছেন, কোথাও বনের দেবী বিশালাক্ষী আছেন। এছাড়া পীরের থান আছে প্রায় প্রতি গ্রামে। পাঁচশত বৎসর আগে যখন থেকে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারিত হতে লাগল তখন থেকে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের মন্দির ও অনেক গ্রামে গৃহস্থের ঘরে প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রতি বৎসর প্রতি গ্রামে যে বার্ষিক শয়াল উৎসবানুষ্ঠান হয় তার বর্ণনা করতে গেলে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখতে হয়। কালীপূজাসহ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেবাদি পঞ্চ দেবতার পূজা অনেক গ্রামেই হয়। দেশবাসীর এই সকল উৎসব প্রকাশ করে যে আমাদের পূর্বপুরুষগণ ঈশ্বর প্রেমিক ছিলেন এবং যাতে আমরা ঠাকুরদেবতাকে ভুলে না যাই তার জন্য তাঁরা উৎসবাদির ব্যবস্থা করে গেছেন। আরও লক্ষ্য করি অনেকে দেবসেবার্থে বিপুল সম্পত্তি উৎসর্গ করে গেছেন। কেবল অবস্থাপন্নরাই নহেন, গরীব লোকেরাও ঠাকুরের নামে অল্প পরিমাণে ভূসম্পত্তি দান করেছেন এমন শত শত দৃষ্টান্ত আছে।

এরপরে যে দিকে লক্ষ্য করি বা লৌকিক ব্যবহার দেখি, তাতে বুঝতে পারি, সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করতে গেলে নানারকম ভব্যতা সম্মান প্রদর্শনাদি আছে। প্রাচীনা মহিলারা কোন আত্মীয় কুটুম্বাদির বাড়ি থেকে বিদায় গ্রহণের সময় বলেতেন—বাড়ী যাচ্ছি গো, দুটো গালি দাও। এই যে ভব্যতা, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা পাশ্চাত্য সভ্যতাতে তা দুর্লভ। কুটুম্বাদি নিয়ে থাকতে গেলে—দদাদি প্রতিগৃহ্যাতি আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে। একেও ধর্মকার্য মনে করি। যদিও সকলে এত গভীরভাবে চিন্তা করেন না যে এই সমাজ সেই মহামায়ার ছায়া—তিনি আমাদের এই রকম কতভাবে যুক্ত রেখে গৌরবের মধ্যে দিনযাপন করে যেতে দিয়েছেন। সজ্ঞানে মন্ত্র তপর্ণাদি করে গঙ্গাস্নান করাও যেমন—সেই রকম আমাদের মত জ্ঞানহীনের পুষ্করিণী ও জলাশয়ে স্নান ও প্রচলিত আছে। [২৪ পরগণার বারুইপুর অঞ্চলে আদি গঙ্গার অংশ ঘোষের গঙ্গা—বোসের গঙ্গা নামে আছে] সবার উদ্দেশ্য সেই এক—ঈশ্বর অভিমুখী জীবন যাপন। মানুষের মন প্রায়ই নিজেকে ভুলে যায়। যাঁরা মানুষের দৈবী সত্তাকে জাগিয়ে দিয়ে থাকেন তাঁরা পরম গুরু সন্দেহ নাই। আমরা মনে করি আমরা নিতান্ত দুর্ভাগা নই—ভগবান আমাদের সঙ্গে আছেন—আমরা ভগবানের আশ্রিত।

এই জ্ঞানদানের জন্য আমরা পূর্বপুরুষদের গৌরব বোধ করি—তাঁরা আমাদের আশীর্বাদ করুন।

মানুষের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার—ঈশ্বর

মানব সভ্যতার ইতিহাসে অগণ্য আবিষ্কারের কথা আছে। আমরা তার ফল ভোগ করছি। কোথা থেকে মানুষ এল তার খোঁজ করতে গিয়ে এক পণ্ডিত বলেন—বানর থেকে নর হয়েছে। কথাটা সত্য কিনা জানিনা, কিন্তু সেই বানর কোথা থেকে এল তখন কি উত্তর মিলবে? তাই ঐ চর্চা ছেড়ে আমরা গত কয়েক হাজার বছরের মধ্যে মানুষ কত রকম আবিষ্কার ও উদ্ভাবন করে বর্ত্তমান অবস্থায় এসেছে তার সামান্য কিছু আভাস দিই। প্রথমেই ধরি, আগুনের, জলের, বাতাসের ও মাটির ব্যবহার করে মানুষ বাঁচতে চেয়েছে। তার পরে দল বেঁধে সমাজ গঠন করতে বাধ্য হয়েছে। পরিণামে নেতা নির্বাচন করতে হয়েছে—তার থেকে রাজা ও সামন্ত এসেছে আর নানা রকমের আইন করতে হয়েছে। ঐ সঙ্গে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন অংশে কেমন দেশ আছে—সেখানে কেমন মানুষ আছে, জীবজন্তু আছে তা আবিষ্কার করেছে। মানুষের জ্ঞান বাড়তে লাগল—সে বিজ্ঞানের দিকে এগিয়ে গেল। সংসারে কি করে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে—নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে সহ্য করতে পারে এ সবও ভাবতে হল।

মানুষের মধ্যে একটা অহং বুদ্ধি আছে তাকে বাদ দিয়ে কেউ চলে না। সে সর্বদা চেষ্টা করে একটা কিছু করবে যাতে নিজের ও অপরের কিছু কাজ হয়। কেউ দেখে শিখে আবার কেউ ঠকে শিখতে বাধ্য হয়। মানুষ আত্মচিন্তা আগে করেছে বা সমাজের চিন্তা আগে করেছে তা নির্ণয় করা আমাদের বুদ্ধির বাইরে। তবে একটা অনুমান করতে পারি, সে যেমন নিজের কথা ভেবেছ তেমনই অপরের ভাবনাও ভেবেছে। এখানেই পশুদের থেকে সে তফাৎ। আবার গবেষণা করে কিছু আত্মচিন্তা করেছে এমন অনুমানও বোধহয় ঠিকই হয়। যাঁরা ঐ রকম চিন্তা করতে লাগলেন বা তপস্যা করতে লাগলেন তাঁদের জ্ঞান জগতে একটা আলো ফুটে উঠল। তাঁদের আমরা নাম দিয়েছি ঋষি। তাদের একজন বললেন—বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসো পরস্তাৎ—এই রকম আরো কথা আছে।

এক দেশে সূর্যকে প্রধান দেবতা বলে মনে করা হত। আর এক দেশে প্রতি নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ছিলেন। তাঁদের পূজা হোম বলি হত। কাল যত গত হতে লাগল মানুষের মন বদলে গেল। কেহ বললেন অগ্নিই দেবতা। আমাদের দেশে বলে অগ্নির মুখ দিয়ে দেবতারা আহার করেন। সুতরাং হোম যজ্ঞ কর। বুদ্ধদেব আসার আগে হাজার হাজার পশুর রক্তে মেদিনী প্লাবিত হত। তাই যজ্ঞ বিধির নিন্দা করে সদয় হৃদয় দর্শিত পশুঘাতং। একজন মাত্র ঈশ্বর আছেন—দেবতারা তাঁর শক্তি সুতরাং তাঁদের পূজা কর। অপরে বললেন ওসবে দরকার নাই—এক ভগবানের

অনেক নাম—নাম জপ কর—তাঁকে ভক্তি কর, আপনার জন মনে কর। জ্ঞানবাদীরা বলেন, আগে তাঁকে জান তার পর ভক্তি করতে পার না করতেও পার। এমন অবস্থা এসে দাঁড়াল যে এক ভগবানকে মান্য করে উপাসনা কর অর্থাৎ তাঁর নিকটে থাক।

খ্রিষ্টান ও মুসলমানগণ এক ঈশ্বরকে জানেন, তাঁর কোনো আকার নাই তবে তিনি এঞ্জেল বা ফেরেস্তাদের মারফত তাঁর নির্দেশ জারি করেন। একদল বলেন রোজ কেয়ামত আছেন অপরে বলেন পুনর্জন্ম আছে। যাই হোক মানুষ মহাশূন্যে না থেকে ঈশ্বর নামে একটি আশ্রয় আবিষ্কার করল এবং এইটিই মানুষের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার।

মানুষ নিজেদের জন্য অগণ্য ভৌতিক আবিষ্কার করেছে কিন্তু সকলে হয়ত তার ফল ভোগ পায়না। যারা যত বেশী ফল ভোগ করে—তারা স্থলে জলে আকাশে প্রভুত্ব করে, তাদের বলি সভ্য মানুষ। আবার অনেকে মনে করেন প্রকৃত মানুষ তারাই যারা হৃদয়ে উন্নত অর্থাৎ যাদের মনে দয়া আছে—অপরের জন্য করুণা ও ভালবাসা আছে। তারা সভ্য না হতে পারে কিন্তু তারাই মানুষ নামের যোগ্য।

ঈশ্বরকে আবিষ্কার করে মানুষ কত বিপদে পড়েছে তাঁর বর্ণনা করা যায় না। তন্ত্র মন্ত্র কত কি শাস্ত্র তৈয়ার করে একজন বলেন উপাস্য ঠাকুর কৃষ্ণবর্ণ আর একজন বলেন শ্বেতবর্ণ বা রক্তবর্ণ। তর্ক করে যখন কিনারা হয় না তখন হাতাহাতিতে গড়ায়। লড়াই করে যারা মারা পড়ে তারা জানতে পারল না তারা কোন লোকে যাবে। তাদের জন্ম বৃথা হল বা সার্থক হল তা তারা বুঝতে সময় পেল না। ঈশ্বরের নাম করে মানুষ মানুষকে হত্যা করেছে, পুড়িয়ে মেরেছে, জলে ডুবিয়েছে, এককথায় বলা যায় মানুষ কি না করেছে! আমরা তাদের নৃশংসতার, নিদর্য়তার কাহিনী লিখে বিরাট সাহিত্য সৃষ্টি করছি—দু পয়সা আয় করে খাচ্ছি।

অগাধ কাল সমুদ্রে ভাসমান মানুষ ঈশ্বর নামে ভগবানকে অর্থাৎ যাঁর যশ, শ্রী, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য ও বীর্য আছে, এমন এক সত্তাকে আশ্রয় করে একটু শান্তি পেয়েছে একথা স্বীকার করতেই হয়। আমার কেউ নাই—আমার কোনো আশ্রয় নাই, একথা চিন্তা না করে পরম বিশ্বাসের সঙ্গে যদি আমি একজন সর্বশক্তিমান পরম দয়াল ঈশ্বরের আশ্রয়ে আছি মনে করতে পারি, তাহলে নিশ্চয় শান্তি লাভ করি। একথা যতই কাল্পনিক হোক এটাই আমরা চাই, অনন্ত নরকের ভয় নিয়ে যেমন সংসার ছেড়ে যেতে চাই না। হাজার হাজার বছর ইডেন বা স্বর্গোদ্যানে বিহার করতে পারব এমন আশাও করি না। কারণ ব্যাখ্যা করতে গেলে অনেক অপ্রিয় কথা এসে পড়তে পারে। আমরা আশা করি মানুষের এই মহা আবিষ্কার যেন মানুষকে প্রকৃত মহত্ব দিতে পারে—মানুষের প্রতি বিশ্বাস ও দয়া নিয়ে যেন সব কাজ করি। তুলসী দাসজীর মত বলতে পারি—তুমি এমন কাজ করে চল যেন মৃত্যুকালে সকলে কাঁদে আর তুমি হেসে চলে যাও। ঈশ্বর বিশ্বাসে আমাদের লাভ আছে। যদি এরূপ ভাবনা আদিম কাল থেকে না থাকত তাহলে মানুষ বিবেকবর্জিত অপরাধপ্রবণ একটি প্রাণী হয়ে পড়ত।

ঈশ্বর করুণাময়

কয়েকবছর আগে আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ 'বেতার জগৎ' পত্রিকার এক বিশেষ সংখ্যায় কয়েকটি গল্পের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। গল্পগুলি বিভিন্ন ভাষার ছিল। তাহার মধ্যে 'মূল্যহীন' নামে একটি গল্প ছিল। গল্পটি ওড়িয়া ভাষায় লিখিত গল্পের অনুবাদ। গল্পটি করুণ রসের। এক গৃহস্থ তাহার একটি গাভীকে এক কসাইয়ের কাছে বিক্রয় করিয়াছিল। কয়েকদিন পরে ক্রেতা গাভী ফেরৎ আনিল এবং বলিল আমি উহা লইব না। মূল্য যাহা দিয়াছিলাম তাহা যদি ফেরৎ না দেন তাহাতেও আমার আপত্তি নাই। এই গাভীর কোন মূল্য নাই। কেননা উহার কোন চাহিদা নাই। আমি যতবার ইহার নিকটে ছুরি হস্তে গিয়াছি সে আমার দিকে চাহিয়া আমার মাথার উপর তাহার গলা তুলিয়া দেয়—আমার হাতের ছুরি পড়িয়া যায়। আমি উহা তুলিয়া লইতে পারি না।

জগদীশ্বর আমাদের হৃদয়ে দয়ারূপে বিরাজ করেন, আমরা তাহাতেই ধন্য। সংসারে যাহার মূল্য সকলের চেয়ে বেশী তাহা অমূল্য। যাহা আছে বলিয়া মানুষকে মানুষ বলা যায় সেই অমূল্য বস্তু যে পাইয়াছে তাহার আর অভাব কি আছে?

আড়াই হাজার বছর আগে আগত বুদ্ধদেব অহিংসা ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। সেই করুণার স্রোত শুকাইয়া যায় নাই, আবার তাহার প্রকাশ হইতেছে। বর্তমান যুগে মহাত্মা গান্ধী যখন অহিংস অসহযোগ মন্ত্র প্রচার করিয়া বৃটিশ রাজশক্তির সহিত সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলেন, তখন অনেক লোক এই নীতির বিরোধীতা করিয়াছিলেন। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় টলষ্টয়ের নামে ফারম্‌ও করিয়াছিলেন। এক খ্রিষ্টান মিশনারি গান্ধীজীকে পত্র দিয়া জানিতে চাহেন যে ননভায়লেন্স বা অহিংসা তাঁহার পলিসি না ক্রীড [আমরা ইয়ং ইন্ডিয়া পত্রিকায় ঐ চিঠি ও তাহার উত্তর দেখিয়াছি]। মহাত্মাজী বলিয়াছিলেন অহিংসা পলিসি বা কার্যোদ্ধারের নীতি নহে—উহা জীবনের মূলনীতি। বুদ্ধদেব আগে অহিংসা প্রচার করিয়াছিলেন—তাঁহার বাণী দিকে দিকে প্রচারিত হইয়াছিল। হাজার হাজার ভিক্ষু ভিক্ষুণী জগৎ আলো করিয়া এই ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। আড়াই হাজার বছর পরে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে মহাত্মাজী যখন অসহযোগ প্রচার করিলেন তখনও অনুরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। চম্পারণ সত্যাগ্রহের সময়ে মহাত্মাজী যখন ঐ স্থানে গিয়াছিলেন তখন পত্নী কস্তুরবাঈ মারফতে অবগত হইলেন সেখানকার স্ত্রীলোকগণ বলিয়াছেন তাঁহাদের একখানি মাত্র বস্ত্রে কালযাপন করিতে হয়—মহাত্মাজী যেন তাঁহাদিগকে একখানি বস্ত্র প্রদান করেন। মহাত্মাজী মেয়েদের এইরূপ অবস্থা বুঝিয়া সেই সময় হইতে কটিবস্ত্র পরিধান আরম্ভ করেন।

বিশ্বসৃষ্টির মূলেও আছে করুণার এই প্রভাব। এই করুণা আছে বলিয়াই সূর্য কিরণ দেয়—মেঘ বর্ষা দেয়—শস্য উৎপাদন হয়। মহামতি টলষ্টয় তাঁর ঋষির দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন সংসার টিকিয়া আছে মানুষের হৃদয়ে দয়া ও প্রেম আছে বলিয়া। একটি রূপক দিয়া তিনি বিধাতার বিধান বুঝাইতে চাহিয়াছেন : এক সময়ে বিশ্ব প্রভু

তাঁর দূত মাইকেলকে বলিলেন—ধরাধামে অমুক গ্রামে যাও, দেখিবে একটি স্ত্রীলোকের শেষ সময়—তার আত্মা নিয়া আসিবে। মাইকেল গিয়া দেখিলেন স্ত্রীলোকটি দুটি কন্যা সন্তান জন্ম দিয়া অচেতনে পড়িয়া আছে। শিশু দুটির একজনের একটি পা খোঁড়া—মায়ের শরীরের চাপে অমন হইয়া গেছে। এঞ্জেল বা দেবদূতেরা মায়ার অতীত কিন্তু এই দৃশ্য দেখিয়া মাইকেলের মনে করুণা হইল। তিনি ভাবিলেন যদি মায়ের আত্মা নিয়া যাই তখন অবোধ শিশু দুটির কি হইবে? তিনি ফিরিয়া গিয়া প্রভুর কাছে বলিলেন—আমি সেই মায়ের আত্মা নিতে পারিলাম না প্রভু। বিধাতা বলিলেন—মাইকেল, তোমার কিছু দেখিতে বাকী আছে। মর্ত্যে গিয়া দেখিয়া আইস মানুষ কিসে বাঁচে।

মাইকেল ধরাধামে আসিলেন ও এক অচেতন যুবকের বেশে এক গ্রামের বাহিরে পড়িয়া রহিলেন। ভোরের বেলা এক গরীব মুচি তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া দয়া করিয়া নিজের বাড়ীতে নিয়া গেল ও যত্ন করিয়া তাহাকে চেতন করিয়া তুলিল। দেবদূত বোবার মত রহিলেন। মুচি ও তাঁহার পত্নী তাঁহাকে অসহায় পুত্রবৎ পালন করিতে লাগিলেন। মাইকেল শীঘ্রই জুতা তৈরির কাজে অসাধারণ দক্ষতা দেখাইলেন, মুচির অবস্থা ফিরিয়া গেল। কয়েক বছর কাটিয়া গেল। একদিন এক বৃদ্ধা মুচির দোকানে আসিলেন, সঙ্গে দুইটি বালিকা। তাহাদের জুতা তৈয়ার করিয়া দিতে হইবে। মাইকেল দেখিলেন একটি বালিকা খোঁড়া—বুড়ীর বেশী লক্ষ্য তার দিকে। মাইকেল মৃদু হাসিলেন এবং তাহাদের খুব ভাল জুতা করিয়া দিবেন এমন ভাব প্রকাশ করিলেন। আরও কিছু কাল পরে একদিন তিনি মুচিকে নিজের পরিচয় দিলেন ও সব কথা বলিয়া বিদায় লইলেন। প্রভুর কাছে ফিরিয়া দেবদূত বলিলেন—প্রভু আমি বুঝিতে পারিয়াছি মানুষের হৃদয়ে দয়া ও প্রেম আছে—তার দ্বারাই মানুষ বাঁচে।

সংসারে অশান্তির মূলে হিংসা আছে। তাহার বিরুদ্ধে ঈশ্বরের করুণাই আমাদের পথ দেখাইতে পারে।

শাস্ত্র ও ভাষ্য—কোন্‌টি মানব?

শাস্ত্র বলতে আমরা সাধারণত ধর্ম্মশাস্ত্র বুঝি। অধার্মিকদেরও শাস্ত্র আছে। তারাও কতকগুলি নিয়ম তাদের মনের মত করে নিয়ে চলা ফেরা করে। সোজা কথায় বলি—চোরদেরও স্কুল আছে যদিও তা প্রকাশ্যে চলে না। আমরা ভাল মানুষ, যে কোনো এক রকম ধর্ম্ম শাস্ত্রের বিধান মেনে জীবন যাত্রা নির্বাহ করি। যেখানে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে একটি নিয়মের রাজত্ব চলছে, চন্দ্র সূর্যাদি যার সাক্ষী—সেখানে সকাল থেকে পরদিন সকাল পর্যন্ত আমাদের কতকগুলি নিয়ম নীতি মেনে চলতে হয়। সৌভাগ্যক্রমে মানব জাতির মধ্যে এমন বহু চিন্তাশীল মহাপুরুষ জন্মেছেন যাঁরা আমাদের পথ চিনে চলতে সাহায্য করে আসছেন। আমরা সবাই শাস্ত্র পড়িনা বা

পড়তে পারি না। কিন্তু মহাত্মাদের প্রণীত শাস্ত্র লোকমুখে বা গ্রন্থাকারে আমাদের নিকট আসে।

এখন আলোচ্য বিষয় শাস্ত্রার্থ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা। আমাদের বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি, পুরাণাদি শাস্ত্র আছে—আমরা হিন্দু। যাঁরা মুসলিম তাঁদের কোরান আছে। খ্রিষ্টানদের বাইবেল পুঁথি আছে। বৌদ্ধদের ত্রিপিটক আছে, জাতক আছে। আমাদের চিনতে হবে আমরা কোনটি অনুসারে চলব। প্রতি শাস্ত্রের টীকা ও ভাষ্য আছে—নজির হাদিস আছে। এছাড়া অনেক কাহিনী, ইতিহাসও পাওয়া যায়। কোন্ টীকা বা ভাষ্য অনুসরণ করব তা ভাববার বিষয়। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বকরূপী ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করায় যুধিষ্ঠির বলেছিলেন—মহাজনের পথ ধরতে হবে। উত্তরটি সরল মনে হলেও প্রকৃত পক্ষে পথটি তত সহজ নয়।

যে সব ধর্মগুরু বা বিদ্বান্ ব্যক্তি ধর্ম পুস্তকের টীকা বা ভাষ্য করেছেন তাঁদের সংখ্যা কম নয়। ভাষ্য টীকা না ধরে মূল শাস্ত্রের অর্থবোধও সহজ নয়। আবার নিজের এমন জ্ঞান নাই যে নিজেরাই বুঝে নিতে পারি। উদাহরণস্বরূপ বলি ভগবদ্গীতা নামক প্রসিদ্ধ পুস্তকের ভিন্ন ভিন্ন টীকা ও ভাষ্য আছে। কোথাও একটি শ্লোকের ব্যাখ্যা দুজনে দু রকম করেছেন। আমরা এখন কোন্টি গ্রহণ করব তা এক সমস্যা। মুসলিম ভাইদের হাদিস নামক পুস্তকের সাহায্য নিতে হয়। বৌদ্ধদের মহাযান ও হীনযান নামক দুই রকম মত আছে। খ্রিষ্টানদের আছেন—প্রোটেষ্টান্ট ও ক্যাথলিক। সকলেই যে যার ধর্ম্মগুরুকে মেনে চলেন—এ বিষয়ে দুই মত নাই। কিন্তু পথের বিচারে এসে মানুষ ঠেকে যায়। তখন তাকে কোনো না কোনো মতকে আশ্রয় করতে হয়। সব ধর্মেই গুরুবাদ এই পথে এসে গেছে। শাস্ত্র বাক্যের কঠিনতা দেখে অনেকে বলেছেন—গুরু না ধরলে কিছু করতে পারবে না সংসার পথে তুমি ভ্রমে পড়ে যাবে।

মানবজাতি যত কম বুদ্ধি ধারণ করুক্ না কেন তাদের মতো ভাগ্যবান কেউ না, তাদের মঙ্গলের জন্য আকাশের গ্রহ, উপগ্রহ তারকার মত শত শত আলো জ্বলছে—তাদের জ্যোতিতে মানুষ পথ দেখতে পাচ্ছে। তাঁদের দয়ার সীমা নাই। বহুবিধ টীকা ভাষ্য ছাড়া তাঁরা নিজেদের জীবন দিয়ে সরল করে বুঝিয়েছেন আমরা কোন্ পথে যাব—কোন্ ব্যাখ্যা গ্রহণ করব। আমাদের বিশ্বাস ঠিক রাখা দরকার। তর্কজালের মধ্যে জড়িয়ে পড়লে আমাদের সামনে থাকবে শুধু সন্দেহ ও সংশয়ের প্রাচীর। মানুষের মধ্যে একটা অহং আছে। সে মনে করে আমি যা দেখি তাই ঠিক, যা দেখিনা তার অস্তিত্ব নাই। তর্ক শাস্ত্র বলে এটাও হয়। একটা দৃষ্টান্ত দিই—'সলিলে প্লাবিত হয় বসুধা যখন, ক্ষুদ্র জলাশয়ে আর কি বা প্রয়োজন? অর্থাৎ প্রয়োজন নাই।' এ কথাই অপর মতে বলা হয়েছে—'বসুধা প্লাবিত হলে যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় ক্ষুদ্র জলাশয় দ্বারা সেই অর্থ সিদ্ধ হয় অর্থাৎ প্রয়োজন আছে।' আমাদের দুটি চোখই একদিক দেখে ফলে মীমাংসা কঠিন হয়। অনেক লড়াই বেধে যায়। আমরা পথ পাই না। কিন্তু একটা লাভ হয়েছে। অনেক ধারায় চিন্তা করে মানুষ নতুন জ্ঞান পেয়েছে। অন্ধকারের মধ্যে আলো মিলেছে।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সমাজে এত শ্রেণী হয়েছে ঐ রকম বিচার বিভ্রাট থেকে। একদল বলেন মূল কথা—আহার শুদ্ধ হওয়া দরকার অর্থে খাদ্যদ্রব্য ভাল হওয়া দরকার, অপরে বলেন আহার অর্থ যা আহরণ করা হয় অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকাদি দ্বারা যা সংগ্রহ হয় সমস্তই শুদ্ধ হওয়া দরকার। ফলে একদল নিরামিষ ভক্ষণ করেন অপরদল ঐ রকম বাছবিচার করেন না। অন্য একজন বলেন—ঠিক কথা বলতে গেলে আপনার খাবার জিনিস কেমন হবে তা আপনার ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করুন। তিনি আপনার পক্ষে কোন্‌টা ক্ষতিকর তা ঠিক বলে দেবেন।

অতএব আসুন, আমরা ভাষ্য ও টীকাকারগণকে যথেষ্ট সম্মান করে নিজেদের ও বিজ্ঞজনের জ্ঞানবুদ্ধি মত আচরণ করি। কেবল একটি পরীক্ষায় পাশ করতে হবে—যা করবেন তা যেন আন্তরিক হয়। আমাদের বিচারের ওখানেই শেষ আর এগিয়ে যাওয়ার পথ নাই।

নাম ধাম কথা

নাম থাকলে তার ধাম থাকে কিন্তু আমরা তাহাদিগকে ধাম বলি না। আমরা তীর্থস্থানকে ধাম আখ্যা দিয়া থাকি, যেমন পুরীধাম, কাশীধাম, গয়াধাম, শ্রীধাম বৃন্দাবন। আমরা মনে করি ঐ সকল স্থানে সর্ব্বব্যাপী ভগবান বিশেষ প্রকাশিত। সেইজন্য সকল স্থানের কিছু মহিমা আছে। ভগবান ভক্তের হৃদয়ে বাস করেন এমন কথা শোনা যায়। আমরা এক এক ধামে তাঁহার বিশেষরূপ মহিমার প্রকাশ দেখি। এজন্য শত শত হাজার হাজার লোক রীতিমত কষ্ট স্বীকার করিয়াও দর্শন করেন—অনেকে ঐ সব স্থান পরিক্রমাও করেন।

আমাদের ধারণা তিনি ঐ সব স্থানে বিশেষভাবে প্রকাশিত সেইজন্য তীর্থ স্থানে হাজার হাজার লোক যখন তখন সমবেত হন। তাঁহারা ঐ সব ভ্রমণের স্থান হইতে চিহ্ন স্বরূপ নানা প্রকার দ্রব্যও আনেন। অনেকে নূতন বাসন পত্রাদিতে করিয়া সেই তীর্থের ঠাকুরের প্রসাদ বিতরণ করেন। আমরা দেখিয়াছি ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে বিচিত্র রকমের মিষ্টান্ন পাওয়া যায়। তীর্থযাত্রীগণ সাধ্যমত বিতরণ করেন। তাঁহারা নিজেদের সৌভাগ্যের অংশ বিতরণ করেন। কেন তাঁহারা অত কষ্ট করিয়া তীর্থ ভ্রমণ করেন ভালই জানেন। প্রাণ বিপন্ন করিয়াও অনেক দূর তীর্থে যান—অবধূত মহাশয় মরুতীর্থ হিংলাজেও পাড়ি দিয়েছিলেন। সাধারণত পথের দুর্গমতা তীর্থস্থানের আকর্ষণকে বেশী করিয়া দেখায়।

আমরা ধাম সমূহের এই যে পরিচয় পাই তাহাদের মাহাত্ম্য লইয়া গ্রন্থাদিও রচিত হয়। গ্রন্থকারগণের মনের বাসনা যাঁহারা ভ্রমণ কাহিনী পড়িবেন তাঁহারা নিশ্চয় ঐ সকল স্থানে যাইতে আগ্রহী হইবেন। ঐ সকল স্থান দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল হইলেও তাঁহারা পশ্চাৎপদ হন না। শ্রীভগবান সর্ব্বব্যাপী তথাপি মানুষে কোথাও তাঁহার

বিশেষ প্রকাশ দেখেন এবং পুনঃ পুনঃ যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তীর্থস্থানের নিশ্চয় কোনো আকর্ষণ আছে। সুরধুনি গঙ্গা হিমালয় হইতে নির্গত হইয়া প্রয়াগ ধামে যমুনার সহিত মিলিত হইয়াছেন তাহার পর তিনি উত্তর বাহিনী হইলেন আর সেখানেই মহান তীর্থ কাশীধাম। তাহার পশ্চিম কুলে গঙ্গার স্রোত উত্তর মুখে বহিতেছে ইহা সেখানে গেলে বোঝা যায়। আমরা প্রথমে ইহা এক অভাবনীয় ব্যাপার মনে করিয়াছিলাম—পরে দেখিলাম সত্যই গঙ্গার স্রোত উত্তর মুখে যাইতেছে, এই কারণে বারাণসী ধাম ভারতের অতি প্রাচীন তীর্থ। ঐরূপ গয়াধাম ফল্‌গু নদীর তীরে সুপরিচিত তীর্থ—এখানেও নদীর স্রোত উত্তর মুখে প্রবাহিত। ঐ স্থানে বিষ্ণুপদ মন্দিরে পূর্ব পুরুষগণের উদ্দেশ্যে পিণ্ড প্রদান করা হয়। পঞ্চক্রোশং গয়াশিরং ওখানেই শুনিয়াছি। ঐ স্থানেই শুনিয়াছি বঙ্গদেশের কোনো কোনো পণ্ডিত মন্দির প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হইলে তাঁহারা বলিলেন—ভাল কথা আমরা মন্দির মধ্যে যাইব না—বাহিরেই শ্রাদ্ধ করিব।

তখন কোনো বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি গয়ালীদিগকে বলিলেন—উহারা বঙ্গদেশের শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত—পঞ্চক্রোশং গয়াশিরং বলিয়া আজ যদি বাহিরে শ্রাদ্ধ করিয়া চলিয়া যায়, অন্যেরাও সেইমত করিবে মন্দিরের গৌরব থাকিবে না। তখন গয়ালীগণ বাংলার পণ্ডিতগণকে সম্মান করিয়া বলিলেন—আপনাদের কোনো প্রবেশ দক্ষিণা দিতে হইবে না। আপনারা আসুন—মন্দির মধ্যে বিষ্ণু পাদপদ্মে পিণ্ড দান করুন। সেই হইতে এখন পর্যন্ত সকলে পূর্ব পুরুষের উদ্দেশ্যে পিণ্ড মন্দিরের মধ্যেই নিবেদন করেন। তীর্থ যাত্রীগণ তীর্থ গুরুর পায়ে ধরিয়া প্রার্থনা করেন—আপনি নিজ মুখে বলুন আমার পূর্ব পুরুষগণ মুক্তি পাইলেন নচেৎ ছাড়িব না। মানুষের এই বিশ্বাস কে দিল? গয়াতীর্থের দেবতা ইহা আমাদের মনে দিয়াছেন। আমরা যাঁহাদের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি তাঁহাদের জন্য এই আন্তরিক প্রার্থনা নিশ্চয় ফলপ্রদ হইবে। তাই তীর্থগুরুর আশীর্বাদ না লইয়া কেহ ফিরবেন না।

কাশীধামে বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা এবং পুরীধামে জগন্নাথ মহাপ্রভু আছেন—তাঁহাদের নিকটেও আর্তি নিবেদন করিয়া মানুষ শান্তি পায়। বাবা বিশ্বনাথ ও জগন্নাথ তাহাদের হৃদয়ে শান্তি দান করেন। এই কলিযুগেও লোকের বিশ্বাস তাঁহারা আমাদের দেখিতেছেন। শত সহস্র দান করিয়াও মানুষের তৃপ্তি হয় না। যুগ যুগ চলিত পিণ্ড দান প্রথার উপর লোকের দৃঢ় বিশ্বাস আছে। প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে একটু বর্ণনা করি : প্রেত শিলা হইতে ফিরিয়া রামশিলার নীচে বসিয়া আছি—জনৈক ধনী ব্যক্তি তাঁহার দলবল সহ নীচে চাতালে পিণ্ড দানের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। আমি দর্শক ও শ্রোতা। শুনিলাম—যজমান পুরোহিতকে বলিতেছেন—মহারাজ আপলোগ পুরি উরি অচ্ছা খাতা হ্যায়—পিতৃয়োকো কাহে ভূষি দেতা হ্যায়?—[গমের ভূষি দ্বারা পিণ্ড প্রস্তুত করা হয়]—পুরোহিত বলিলেন—ইসসে পিতৃলোক খুশি রহতা হ্যায়। যজমান বলিলেন—ঠিক হ্যায়।

ভগবান্ তিরুপতি লক্ষীহারা হইয়া ওখানে যখন ছিলেন তখন বরাহদেব তাঁহাকে

দেখিয়া বলিলেন—আপনি এখানে বাস করিতেছেন আমার জায়গার খাজনা দিতে হইবে। ভগবান বলিলেন আমি লক্ষীহারা—খাজনা দিতে পারি না তখন বরাহদেব বলিলেন—তবে নিয়ম করুন যাহারা আপনার কাছে পূজা দিতে আসিবে আগে আমাকে পূজা দিবে। সেইমত ব্যবস্থা চলিতেছে, বাবা শ্রীনিবাস বড় ক্ষমাবান্—তিনি বলেন মানুষ বড় দুর্বল—তাকে দয়া কর—ক্ষমা কর, তাই সারা বৎসর ধরিয়া সেখানে ভক্তবৃন্দের আগমনের বিরাম নাই।

তীর্থ মহিমা সম্যক্ বর্ণনা করা আমাদের সাধ্যাতীত। তীর্থ ভ্রমণকারীর দুই রকম লাভ হয়—এক দেশ ভ্রমণ আশা পুরণ হয় এবং কিছু আধ্যাত্মিক পুণ্য লাভ হয়।

তিনটি কাহিনী

[১৯৭৫ সালে নাটশালে একটি ধর্মসভায় কিছু বলার জন্য আমন্ত্রিত হয়ে প্রারম্ভিক ভূমিকার পরে রমণীমোহন তিনটি কাহিনী বলেছিলেন। নিম্নে তা মুদ্রিত হল]

হজরত মহম্মদ ও আবুবকর

...আপনাদের আশা আকাঙ্ক্ষা সবই ভগবানে নির্ভর করে চলে, আমি আর বেশি কি শোনাব? আপনারা যতই তাঁর কাছে থাকবেন ততই কষ্ট পাবেন কম। ধান ঝাড়ার পর যখন পল মাড়াই হয় তখন লক্ষ্য করুন—একটি খোঁটার চারদিকে গরুগুলি ঘুরতে থাকে। খুঁটি থেকে যে গরুটি যত দূরে থাকে তাকে চলতে হয় বেশি, সে খড় খেতে পায় কম। আর যে গরুটি খুঁটির কাছে থাকে তাকে চলতে হয় কম— সে বেশ খেতে পায়। আমি তিনটি কাহিনী মাত্র বলব—আর বেশি বলার সময় পাব না।

হজরত মহম্মদ যখন প্রথম তাঁর একেশ্বর ধর্ম প্রচার আরম্ভ করেন তখন মক্কার লোকে তাঁর এমন বিরোধ আরম্ভ করে যে তাঁকে মক্কা ছেড়ে পালাতে হয়। সঙ্গে একমাত্র সঙ্গী ও শিষ্য আবুবকর। তাঁরা যখন বুঝতে পারেন পিছনে শত্রুরা কয়েকজন পিছু নিয়েছে ধরতে পারলে তাঁদের মেরে ফেলবে, তখন তাঁরা একটা পাহাড়ের গুহার ভিতরে আশ্রয় নিলেন। তখন আবুবকর বলছেন—হজরত, আমরা মোটে দুজন, ওরা অনেকে, ওদের সঙ্গে আমরা কি যুদ্ধ করতে পারব? হজরত নবী বললেন—তোমার হিসাবে ভুল হচ্ছে বন্ধু, আমরা দুজন নই, আমরা তিনজন—তুমি, আমি আর আল্লা—সুতরাং ভয় নাই। আল্লার এমন মহিমা, যে তাঁদের আশ্রয় গুহার মুখে এক মাকড়সা জাল বুনেছিল তখনই এবং শত্রুরা খোঁজ করতে এসে যখন মাকড়সার জাল দেখল, তখন মনে করল হজরত ও তাঁর সঙ্গী নিশ্চয় এদিকে আসেন নাই। পরে তাঁরা নিরাপদে মদিনা পৌঁছেছিলেন এবং মদিনাবাসীরা তাঁদের সাহায্য করেছিলেন।

বাজীকর

ফরাসী দেশের আর একটি কাহিনী বলি :

একজন বাজীকর ছিল—সে নানারকম কসরত খেলা দেখিয়ে কিছু উপার্জন করত। তার আর কেউ ছিল না—সুতরাং ঐ সামান্য আয়ে তার বেশ চলে যেত। একবছর দেশে বড় দুর্ভিক্ষ হল—লোকে আর খেলা দেখতে চায়না—বাজীকর ভারী মুস্কিলে পড়ল। তখন সে ঠিক করল একটা সাধুদের আশ্রমে আশ্রয় নিয়ে মেরীমাতার আরাধনা করবে, তাতে তার আহারাদির জন্য আর কষ্ট করতে হবে না। ঐরূপ এক মঠে সে গেল এবং মঠাধ্যক্ষ তাকে আশ্রয় দিলেন। সে সাধুদের সেবা ও মেরী মাতার উপাসনা করতে লাগল। খ্রিষ্টমাতা মেরীকে সকলেই খুব ভক্তিসহকারে পূজা করে থাকেন। কিছুদিন পরে মঠের সাধুরা লক্ষ্য করলেন বাজীকর প্রতিদিন কিছু সময় ঠাকুরঘরের মধ্যে থাকে। তখন দরজা ভিতর থেকে বন্ধ থাকে। পরে সে বেরিয়ে আসে। এইরকম দিনের পর দিন তাকে মন্দিরে যেতে দেখে মঠের ছোকরা সাধুরা কৌতূহলী হলেন—তাঁরা জানতেন যে লোকটার বিদ্যাবুদ্ধি তেমন কিছু নাই—সে এতক্ষণ মন্দিরে কি রকম উপাসনা করে দেখতে তাঁদের ইচ্ছা হল। কপাটের মধ্যের ফাঁক দিয়ে একদিন সাধুরা দেখলেন যে লোকটি ঘরের মধ্যে অনেক রকম বাজী খেলছে—দৈহিক কসরত করছে। তাঁরা মঠাধ্যক্ষকে জানালেন যে নবাগত লোকটি ঐরকম খেলা মেরীমাতার সামনে করছে—তাঁদের মতে ওটা ভারী অসভ্যতা হচ্ছে। অধ্যক্ষ তখন তাকে ডেকে পাঠালেন—সব সাধুরাও হাজির হলেন। মোহান্ত বললেন—ওহে, তুমি এত সময় মন্দিরে কি কর? তোমার ধর্মভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে ত? তুমি এখানে শান্তি পাচ্ছ ত? লোকটি তার কাজের জন্য খুব লজ্জিত হয়ে চুপ করে রইল। মোহান্ত তাকে অভয় দিয়ে বললেন—কোন ভয় নাই তুমি নিঃসঙ্কোচে তোমার কথা বল। তখন বাজীকর উত্তর দিল—প্রভু, আপনাদের বিদ্যাবুদ্ধি, শাস্ত্রজ্ঞান, ভাবভক্তি অনেক কিছু আছে। আমার ত কিছুই নাই যা দিয়ে মেরী মাতাকে তুষ্ট করতে পারি। আমার ঐ এক বাজী কসরত বিদ্যাটুকু আছে, যা দেখে লোকে খুশী হত। আমি তাই মেরী মাতাকে খুশী করবার জন্য ঐরূপ খেলা করি—তিনি নিশ্চয়ই আমার মন বুঝে খুশী হবেন ও দয়া করবেন। অধ্যক্ষ তখন অন্য সাধুদের বললেন—দেখলে? এ কেমন ভক্ত। সকলে তাকে ধন্য ধন্য করতে লাগলেন। যার যা আছে তাই দিয়ে প্রভুর সেবা করা উচিত—তাতেই তার ফল লাভ হবে।

সন্ত খৃষ্টোফার

অন্য একজন খ্রিষ্টান সন্তের কথা বলি :

অফারো বলে একটি লোক ছিল। তার শরীরে এমন বল ছিল যে তাকে একটি দৈত্যের মত মনে হত। সে এক সময় মনে করল যদি কোথাও কাজ করতে হয় তাহলে যে সকলের থেকে বেশী শক্তিমান আমি তারই সেবা করব। অনেক দিন ঘুরে

ফিরেও সে নিজের থেকে বেশী বলবান কোনো প্রভু পেল না।

একদিন সে দেখল একদল বীরপুরুষ ঘোড়ায় চড়ে কোথায় যাচ্ছে। সামনের লোকটি তাদের দলপতি বোঝা গেল। সে একজন অশ্বারোহীকে জিজ্ঞাসা করল তোমাদের নেতা উনি কি খুব শক্তিমান? লোকটি উত্তর দিল—উনি পৃথিবীর সকলের থেকে শক্তিমান—ওঁর থেকে বড় কেউ নাই। তখন অফারো তাদের দলে যোগ দিতে চাইলে তারা তাকে গ্রহণ করলে। নানা স্থানে লুণ্ঠন ও দস্যুতা করে তারা ফিরতে লাগল। একদিন এক রাস্তায় আসতে আসতে তারা সহসা মাঠে নেমে পড়ল। সে তখন বলল— কেন আমরা ওদিক ছেড়ে এদিকে যাচ্ছি? একসঙ্গী বলল—আমরা ও দিক দিয়ে যেতে ভয় করি—ওদিকে যাব না। তখন সে বলল, তাহলে তোমাদের থেকেও বড় একজন আছে—আমি তোমাদের দলে আর থাকব না। দস্যুরা চলে গেল—সে রাস্তার উপরে রইল। যখন একলা হল তখন সে অদূরে রাস্তার ধারে যে বাড়ী দেখা যাচ্ছিল, সেই দিকে গেল। সেটি একটি গীর্জা ঘর—সে গিয়ে তার বদ্ধ দরজার সামনে বসে রইল। দরজায় একটু আঘাত করতে একজন পাদরী বেরিয়ে এলেন। অফারো তাকে জিজ্ঞাসা করলে—এ ঘরটা কার? পাদরী উত্তর দিলেন—প্রভু যীশুখ্রিষ্টের। অফারো—তিনি কি খুব শক্তিমান? উত্তর—নিশ্চয়, তাঁর থেকে বড় কেউ নাই—তিনি ঈশ্বর পুত্র। অফারো—তাহলে আমি তাঁর কাজ করব। আপনি আমাকে তাঁর কাজ দেখিয়ে দিন। ধর্মযাজক অফারোকে বললেন—দেখ, নিকটেই একটি ছোট নদী আছে, তার স্রোত বড় প্রবল—লোকে পার হতে গেলে বিপদে পড়ে। তুমি তাদের সাহায্য করে পার করে দাও—তাহলেই যীশু তোমার উপর খুশি হবেন।

অফারো তাঁর উপদেশ মত নদীর ঘাটে এক কুটীর নির্মাণ করে বাস করতে লাগল—একটা গজারি গাছ উপড়ে নিয়ে সেইটাকে সে লাঠি করল। দিনের পর দিন সে ঐ লাঠি ধরে দুরন্ত স্রোতের মধ্য দিয়ে লোকদের পার করতে লাগল। লোকে নির্ভয় হল।

একদিন তার মনে হল, আমি যাঁর কাজ করছি তাঁকে ত দেখতে পেলাম না। তিনি আমার কাজে খুশী কিনা তা জানতে পারলাম না। তার মন চিন্তিত হয়ে পড়ল। সেই সময়ে একদিন গভীর রাতে যখন বাইরে ঘোর দুর্যোগ চলছে তখন অফারো নিজের কুটীরে ঘুমিয়ে আছে—বাইরের একটা শব্দে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল—অফারো, অফারো আমাকে পার করে দাও। অফারো উঠে দেখল, একটি শিশু গাছতলায়। শিশু বললে, অফারো আমায় পার করে দাও। অফারো তার কর্তব্যবোধে সেই শিশুকে কাঁধে নিল। তারপর তার দণ্ড হাতে নিয়ে নদীতে নামল। যত সে এগিয়ে যেতে লাগল তার মনে হল শিশুটি যেন ক্রমে বেশী ভারী হচ্ছে—বহু কষ্টে দণ্ডের সাহায্যে সে অপরপারে উঠে ছেলেটিকে নামিয়ে দিয়ে বলল, তুমি কাদের ছেলে হে? তুমি ও বড় মজার লোক! শিশু বললে—অফারো, তুমি যার কাজ করছ আমি সেই। তুমি কি আমাকে চিনতে পারনি? অফারো আনন্দে মগ্ন হয়ে বললে—প্রভু, আপনি কি এই সেবকের কাজে খুশি হয়েছেন? যদি তাই হয়, তাহলে আমাকে কিছু প্রমাণ দেখান।

প্রভু যীশু বললেন—তোমার ঐ শুষ্ক লাঠি মাটিতে পুঁতে দাও, ও এখনি জীবন্ত গাছ হবে, ওতে পাতা ফুল, ফল হবে। তোমার নাম হল খ্রিষ্টোফার। সেই থেকে তিনি সন্ত খ্রিষ্টোফার নামে প্রসিদ্ধ হয়েছেন। জুলাই মাসের ৯ তারিখে তাঁর উৎসব হয়ে থাকে।

করুণাময় শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীশ্রীঠাকুরের পরমভক্ত কবি দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার তাঁর অপূর্ব স্তোত্রগানের মধ্যে বলেছেন যে-ঠাকুর জীবের দুঃখে কাতর হয়েই নরকলেবর ধারণ করেছিলেন। এবার তাঁর মাধুর্য ঘন মূরতি— ঐশ্বর্য-বিহীন লীলা। তাঁর অহেতুক করুণাই তাঁর অবতরণের মূল উদ্দেশ্য এবং যুগে যুগে বুদ্ধ, যীশু, চৈতন্য অবতারের মধ্যেও ভগবানের এই করুণা প্রকাশিত।

আমাদের ঠাকুরের করুণার প্রকাশ বাল্যকালে তাঁর ধাত্রীমাতার প্রতি দেখা যায়। ঠাকুর ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে সর্বপ্রথমে তাঁর ভস্মবিভূষিত অঙ্গ কোলে করে যিনি সৌভাগ্যবতী সেই ধনী মাতার মনে বাসনা ছিল তিনি ঠাকুরের ভিক্ষামাতা হবেন এবং ঠাকুর গদাধরও তাঁকে কথা দিয়েছিলেন। উপনয়নের পূর্বে বড় ভাই রামকুমার এই কথা শুনে বিস্মিত হন এবং এরূপ অনাচারের জন্য আপত্তি করেন। কারণ ধনীমাতা শূদ্রজাতীয়া ছিলেন। গদাধর বলেন সত্য-ই যদি যায় তবে সূত্রধারণে কি লাভ হবে? পরমজ্ঞানী রামকুমার এ কথার মর্ম উপলব্ধি করে সম্মতি দিলেন এবং ধনী কামারণী ভিক্ষাদানে ধন্যা হলেন।

তাঁর করুণার কত রূপ! বিবাহের সময়ে বালিকা সারদা মা-কে লাহাবাড়ী থেকে গহনা এনে সাজান হয়। দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের গহনা ছিল না। কয়েকদিন পরে যখন গহনা ফেরত দেওয়ার কথা হয় ঠাকুরের মা চন্দ্রামণি কেঁদে আকুল হলেন। গদাধর মাতাকে প্রবোধ দিয়ে নিদ্রিতা সারদার গা থেকে গহনাগুলি খুলে নিয়েছিলেন। বালিকা সারদা জেগে উঠে গহনা না দেখে কাঁদতে রইলেন। তখন চন্দ্রামণি বললেন,—মা, কেঁদোনা—এর পরে গদাই তোমাকে ভাল গহনা দিবে। শ্রীশ্রীমা তখন শান্ত হয়েছিলেন, কিন্তু ঠাকুর ভুলেন নাই। পরবর্তী জীবনে পরমহংস হয়ে টাকা মাটি, মাটি টাকা যিনি বলেছিলেন সেই ঠাকুরই মা সারদাকে সোনার বালা গড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং তিনি আজীবন তা ধারণ করে গেছেন। তাঁর আদরের সন্তান স্বামী সারদানন্দ মায়ের ধ্যানমূর্তির কথা লিখেছেন : আলুলায়িত কেশার্ধ বক্ষস্থলাভি মণ্ডিতাং—শ্বেতবস্ত্রাবৃতার্ধাঙ্গাংহেমলঙ্কার ভূষিতাং''।

দক্ষিনেশ্বরে অবস্থানের সময় একদিন গঙ্গার ঘাটে নৌকায় দুজন মাঝি ঝগড়া করার সময় একজন আর একজনকে প্রহার করে। তখনই ঠাকুর নিজের উপরে আঘাত ভেবে চীৎকার করে কেঁদেছিলেন। এখানেও সেই সর্বজীবে অভেদভাব এবং তাদের প্রতি করুণা। আমরা সাধারণত নির্মম অর্থে নিষ্ঠুর বুঝি, কিন্তু জ্ঞানী যোগীগণ

সেরূপ মনে করেন না। যখন তিনি মথুরবাবুর সঙ্গে তীর্থে গিয়েছিলেন তখন পথে দরিদ্রলোকদের অবস্থা দেখে বিচলিত হয়ে তাদের অন্নবস্ত্র দান করতে বলেন। মথুর বাবু আপত্তি করলে ঠাকুর আর যাবেন না বললেন। অগত্যা তাঁর মন বুঝে মথুরবাবু দরিদ্রদের জন্য ভোজ্য ও পরিধানের বস্ত্র যোগাড় করলেন ও দান করলেন—করুণার ঠাকুর তুষ্ট হলেন।

একবার শ্রীশ্রীমাকে চিনতে না পেরে অন্য লোক মনে করে বলেছিলেন—দরজাটা বন্ধ করে যা। পরে যখন বুঝতে পারলেন বার বার দুঃখপ্রকাশ করে বললেন—তুমি কিছু মনে কোরো না। শ্রীশ্রীমা বলেছেন তাঁর এক ভ্রাতৃজায়াকে— দেখ, ঠাকুর কখনও আমাকে একটা রূঢ় কথা বলেননি—এমন করুণা তাঁর ছিল।

এক সময়ে তিনি ও হৃদয়রাম [তাঁর সেবক ভাগিনেয়] কামারপুকুরে কয়দিন ছিলেন। বর্ষাকালে ঠাকুর একদিন খুব সকালে মাঠের দিক থেকে হালদার পুকুরের পাড় দিয়ে বাড়ী আসছেন, দেখলেন একটা বড় মাগুর মাছ রাস্তায় পড়ে আছে। 'যা যা পালিয়ে যা—কেউ দেখে ফেলবে'—এই বলে পা দিয়ে মাছটাকে পুকুরের দিকে ঠেলে দিলেন। বাড়ীতে এসে কিছু রঙ্গ করে হৃদয়কে বললেন—এত বড় মাছটা রাস্তায় পড়েছিল। হৃদয় তখনই ছুটে যেতে চায়—ধরলে না কেন মামা? ঠাকুর বললেন—না, ধরলাম না, মাছটা এখন পুকুরে। এখানেও অন্তরে—সেই করুণা কাজ করছে।

কথামৃতে একস্থানে আছে—ঠাকুর মন্দির থেকে বেরিয়ে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন। ছাগবলির যোগাড় হচ্ছিল—বলিদান দেখবেন না। এখানেও তাঁর করুণা ভরা অন্তর।

জনৈক ভক্ত পুত্র বিয়োগে কাতর হয়ে ঠাকুরের কাছে এসে কাঁদছেন। ঠাকুর সান্ত্বনা দিয়ে বললেন পুত্রশোক কি সামান্য, স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ যাঁকে গীতা শুনিয়েছিলেন সেই অর্জুন ও পুত্রশোকে আকুল হয়েছিলেন। তারপরেই তাল ঠুকে গান ধরলেন—জীব, সাজ সমরে—ঐ দেখ রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে। ... আর্তের মন শান্ত হয়ে এল। নিজের মায়ের মৃত্যু সময়েও ঠাকুর শোক করে কত কথা বলছেন—পরমজ্ঞানী পরমহংস তবু সামান্য জীবের মত আর্ত হয়েছেন—নিজমুখে বলেছেন—অবতার যখন আসেন মানুষের মতই তাঁর আচরণ দেখা যায়—লোকে চিনতে পারে না।

ভক্তপ্রবর গিরিশচন্দ্র ঠাকুরকে কতবার কতভাবে উপেক্ষা ও অসম্মান করেছেন, কিন্তু এই পতিত আত্মাকে উদ্ধার করার জন্য তাঁর অদ্ভূত কারুণ্যের প্রকাশ—সহনশীলতা বিস্ময়কর। তিনি গিরিশচন্দ্রের বকলমা নিয়েছেন, তাই মহাকবি বলেছেন—তুমি আমার জন্যেই এসেছ—তুমি করুণার সিন্ধু ভগবান।

দক্ষিনেশ্বর কালীবাড়ীর মেথর রসিকও তাঁর করুণায় বঞ্চিত হয়নি। দৃঢ়বিশ্বাসী এই ভক্ত তার শেষ সময়ে ঠাকুরের দিব্যদর্শন লাভ করে পরমগতি লাভ করেছেন।

তখনকার দিনে থিয়েটারের অভিনেত্রীগণ লোকচক্ষে হীন বলে গণ্য হতেন কিন্তু

সেই আনন্দময়ী মায়েদের প্রতি ঠাকুরের করুণার শেষ ছিল না—চৈতন্যলীলা অভিনয় দর্শন উপলক্ষ মাত্র—নটী বিনোদিনী প্রমুখ মেয়েদের প্রতি আশীর্বাদ বর্ষণই মুখ্য উদ্দেশ্য।

দক্ষিনেশ্বরে থাকবার সময় হৃদয়রাম একবার এক বাছুর কিনে আনেন! ঠাকুর দেখে জিজ্ঞাসা করেন, ওটা কি হবে? হৃদয় বললেন, দেশে নিয়ে যাব—সেখানে বড় হয়ে লাঙ্গল টানবে।

কোথায় কলিকাতা আর কোথায় সেই বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটীর ওদিকে শিহড়গ্রাম—বাছুরটীর ভবিষ্যৎ জীবনের কথা ভেবে বেদনায় ঠাকুরের জ্ঞান লোপ হল। সামান্য গো বৎসের জন্যও তাঁর করুণাবশত এই অবস্থা হয়েছিল।

ভক্ত নবগোপাল ঘোষ ঠাকুরের কাছে এসে বললেন, নানাবিধ সাংসারিক কর্মের ব্যস্ততার জন্য তাঁর ইষ্টচিন্তা হচ্ছে না। ঠাকুর বললেন, কিছু না পার যখনই ফাঁক আসবে আমাকে স্মরণ করবে। নবগোপালের মুখে জয় রামকৃষ্ণ নাম লেগে গেল—ছেলেরা তাঁকে দেখলেই বলত—ঐ জয় রামকৃষ্ণ আসছে—তিনি ছেলেদের মধ্যে বাতাসা বিলি করতেন আর বলতেন—জয় রামকৃষ্ণ। করুণাময় তাঁকে ঐ সরল সাধন দিয়ে শান্তি দিলেন।

সকলের শেষে একটি অবান্তর কথা বলি। এটীও তাঁর অপার করুণার প্রকাশ। এই দীন লেখক এক সময়ে প্রথম জীবনে রামকৃষ্ণ মিশনের কোন প্রতিষ্ঠানে স্বেচ্ছাসেবক কর্মী ছিলেন। বহু সাধু সজ্জনের সঙ্গ তিনি পেয়েছিলেন, কিন্তু সম্ভবত নৈকট্যবশত তাঁর উপযুক্ত শ্রদ্ধা আসেনি। তাই তিনি গুরুলাভে বঞ্চিত ছিলেন। ঠাকুরের অবিরাম বহমান করুণার জন্যই তিনি তাঁর এক সন্তানকে সুদূর দক্ষিণভারত থেকে বাংলায় পাঠালেন। এই মহাপুরুষ বঙ্গদেশেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন পরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশে শ্রীরামকৃষ্ণ বাণী প্রচারের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি দক্ষিণ ভারতে অনেক আশ্রম স্থাপন করেন। তাঁর এক পীড়িত সতীর্থকে দেখবার জন্য তিনি বাংলায় আসেন এবং এক দৈব সংযোগে এই লেখক তাঁর চরণে আশ্রয় লাভ করেন। কেরল দেশে গুরুদেবের স্মৃতি মন্দির দর্শনের সৌভাগ্যও ঠাকুর দিয়েছেন। ইহাও করুণাময়ের এক অপূর্ব লীলা বলে গণ্য হতে পারে। জয় রামকৃষ্ণ।

মদীয় গুরুদেব

সকলে বলেন গুরুবলের থেকে বল নেই, তাই প্রথমেই পরম পূজ্যপাদ শ্রীগুরু স্মরণ করি। তাঁর স্মৃতি আনন্দময়।

উনবিংশ শতাব্দীতে আবির্ভূত অবতার বরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম শিষ্য ছিলেন আমার গুরুদেব শ্রীমৎ স্বামী নির্মলানন্দ মহারাজ [ইনি তুলসী মহারাজ নামে সুবিখ্যাত]। কেরল দেশবাসী তাঁহার ভক্ত সন্তানদল গাহিয়া থাকেন :

নির্মলং হৃদয়ং যস্য গুরোরাজ্ঞানুবর্ত্তিনে
নির্মলানন্দ পাদায় তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।।

মদীয় গুরুদেব স্বামী বিবেকানন্দের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ছিলেন। তিনি দক্ষিণ ভারতে শ্রীরামকৃষ্ণ বাণী প্রচারের জন্য প্রায় ২৫ বৎসর ছিলেন। সেখানে এক শহরে তাঁকে একবার এক অভিনন্দনপত্র দেওয়া হয়। উত্তরে তিনি বলেন, আমি আমেরিকা গিয়েছি, সেখানকার লোকে এক প্রবাদ বাক্য বলেন—If you love me, love my dog. আপনারা যে আজ আমাকে সম্মান দেখাতে চাইছেন তার কারণ আপনারা শ্রীরামকষ্ণকে ভালবাসেন—আমি তাঁর কুকুর। তাই আমায় খাতির করছেন। স্বামীজীর পাচক বলেও তিনি নিজের পরিচয় দিতেন। সত্যই তিনি রন্ধনে পটু ছিলেন এবং স্বামী বিবেকানন্দকে রন্ধন করে খাওয়াতে ভালবাসতেন। স্বামীজী তাঁর রান্নার প্রশংসা করতেন। তাঁরা এক হুকায় তামাক খেতেন—এতটা অন্তরঙ্গ আর কেউ হতে পারেননি। সকলেই শ্রদ্ধাবশত দূরত্ব রেখে চলতেন। সভাতে বা তর্কযুদ্ধে উত্তর তাঁর মুখে মুখে ছিল।

অদ্ভূত আমার ভাগ্য—কল্পনাতীত এই ব্যাপার। আমি থাকি বেলুড়ে, তিনি থাকেন মহীশূর ও কেরালায়। ১৯২৭ সালে গুরুভ্রাতা সারদানন্দ মহারাজের কঠিন অসুখের খবর পেয়ে দর্শন করতে এলেন—কলিকাতায় উদ্বোধন বাড়ীতে মহাপ্রয়াণের আগে তিনি পরমপ্রিয় গুরুভ্রাতার সাক্ষাৎ পেলেন। স্বামী সারদানন্দের মহাপ্রয়াণের পর তাঁর মরদেহ নিয়ে বেলুড় মঠে গেলেন। সেখানে মঠের দক্ষিণপূর্ব কোণে চিতাশয্যা রচনা করা হোল, আমি তখন সেখানে দাঁড়িয়ে।

বেলুড় থেকে কয়েকদিন পরে তুলসী মহারাজ বিশেষ আমন্ত্রণে তমলুক এলেন। আমারও দৈব নির্বন্ধ, আমি ও তাঁর দলের সঙ্গে হোর মিলার কোম্পানি স্টীমারে তমলুকে এলাম। তমলুক সেবাশ্রম স্থাপন সময় থেকেই আমার সঙ্গে যোগ ছিল। আমি তমলুকে যখন পড়ি সেই সময়েই আশ্রম স্থাপিত হয়। তমলুকে তাঁর অপূর্ব ধর্মালোচনা বক্তৃতা শুনলাম। কে আমাকে প্রেরণা দিল জানি না—আমি তাঁর কৃপাপ্রার্থী হলাম। তিনি এখানে কাউকে মন্ত্র দেন নাই। আমার কথা শুনে বললেন—তুমি ত বেলুড়ে থাক, ওখানে মহাপুরুষ মহারাজ আছেন, আমাকে ধরছ কেন? আমি আপনারই শরণাগত একথা বলায় তিনি বললেন—দেখা যাবে। দেড় বৎসর পরে আবার বাংলায় ফিরে এলেন। আমাকে উদ্বোধন অফিসে ডেকে পাঠালেন—সেখানে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরে আমাকে কৃপা করলেন।

ত্যাগ ও সেবা

কতক ব্যাপার এমন আছে যেখানে জোড়া না হলে চলে না। ভগবান আমাদের দুটো হাত, দুটো পা, দুটো চোখ, দুটো কান দিয়েছেন। জোড়া চাকা না হলে গাড়ী চলে না। এমন বহু উপমা দেওয়া যায়।

ত্যাগ ও সেবা ভারতীয় আদর্শ এবং এই দুইটিই অত্যাবশ্যক— একটি দিয়ে কাজ সফল হয় না। উপনিষদের প্রথমে আছে—সবই ঈশ্বরের—যা কিছু জগতে আছে—সুতরাং ত্যাগ কর ও ভোগ কর—অপরের ধনে লোভ কোরো না। শাস্ত্র সকলের জন্য—যাঁরা সংসারকে অসার ভেবে ত্যাগ করে সাধু হয়ে যান এবং যাঁরা সংসারে থেকে ধন উপার্জন করে জীবন যাপন করেন—দুই রকমের মানুষদেরই শাস্ত্র বচন মানতে হয়। যদি কেউ ভগবানকে না মানেন তাতে ভগবানের কোন ক্ষতি নেই, মানলে কিন্তু লাভ আছে। সংসারে যত দিন থাকতে হয় অনেক রকম দায়ধাক্কা সামলাতে হয়—দুঃখকষ্ট পেতে হয়, তার মধ্যেই যাতে একটু স্বচ্ছন্দে থাকা যায় তার চেষ্টা সবাই করেন। রাজকুমার সিদ্ধার্থকে তাঁর পিতা রাজা শুদ্ধোধন কত সুখে বিলাসে রেখেছিলেন কিন্তু তিনি মানুষের জরা ব্যাধি মৃত্যু দেখে বিচলিত হলেন। তার পরের কথা ইতিহাসে আছে। আমরা প্রথমেই বলেছি শাস্ত্র বাক্য—ত্যাগ কর ও ভোগ কর। কেউ কেউ সংসার অসার ভেবে বৈরাগী হয়ে যান আর অন্যেরা সংসারে ভোগের মধ্যেই জীবন কাটাতে থাকেন। তাঁরা কখনও ভাসেন আবার কখনও ডুবেন—এই ব্যাপার সবার চোখের সামনেই ঘটছে।

আমরা লক্ষ্য করছি—কথাটার মধ্যে ত্যাগ ও ভোগ দুই আছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—জীবনে ত্যাগ ও সেবা দুইটি চাই। সেবার মধ্যেই ভোগ আছে। কেবল ত্যাগ বা কেবল সেবা হলে চলবে না। আমরা একটাকে ধরতে গেলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না।

প্রথমেই বলেছি দুইটি করে জিনিস দেওয়ার নিশ্চয় কোনো উদ্দেশ্য আছে। যাঁরা সংসার ছেড়ে যেতে চান তাঁদের পথ আলাদা—তাঁদের তপস্যা আত্মনঃ মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ। কিন্তু আমরা শুনেছি স্বামীজীর বাণী জীব সেবার কথা। তিনি এ কথাও বলেছেন খুব সরলভাবে—তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে যেন দান করা না হয়। তাঁর উক্তি—দুটো পয়সা নে রে বেটা বলে পয়সা ফেলে দিলে দান হয় না বরং নিজের ক্ষতিই হয়। শ্রদ্ধায় দাও না হয় বরং দিও না—এই সাবধানবাণী আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। সংকেতে বলেছেন—জীবে দয়া নয়, শিব জ্ঞানে জীবের সেবা।

সেবা ধর্ম পরম গহনো—যোগিনামপ্যগম্য—এই রকম একটি কথা আছে। কারণ সেবা করবারও একটা রীতি আছে। জগতে আমরা সবাই সেবক, এক দিক দিয়ে কথাটা সত্য কিন্তু মহাপুরুষগণের বাক্যের মধ্যে কিছু গভীর অর্থ থাকে। যিনি সেবক হতে ইচ্ছা করেন তাঁর কিছু জ্ঞাতব্য আছে—যা জেনে শুনে শ্রদ্ধাভক্তি নিয়ে কাজ করতে হয়। তবেই নিজে ধন্য হবেন—অন্যদেরও উপকার হবে। আমরা কী দেখছি? চাঁদা আদায়কারীদল অথবা কোনো সমিতি আপনাকে ধরে কিছু আদায়ের জন্য কত রকম মিষ্ট কথা বললেন আর আপনি যশের লোভে গলে গেলেন—কিছু দিয়েও ফেললেন। আপনার কিছু অর্থ নষ্ট হল। আরও যে বড় ক্ষতি হল দাতার অভিমান এল—দানের ফল থেকে আপনি বঞ্চিত হলেন। দানের আগে আপনার অবস্থা বরং ভাল ছিল। যাঁরা দেশের কাজে সবেতনে বা অবেতনে নিযুক্ত আছেন তাঁদের

ধারণা—আমি ডিউটি করছি—মাহিনা পাই—আমার দ্বারা দেশের সেবা হচ্ছে। অকৃতজ্ঞ দেশবাসী আমাকে ঠিকমত চিনছে না। আপনার বিচারে এখানে একটু কম্‌তি অছে। ত্যাগ ও সেবার সমন্বয় আপনার হয় নাই—তাই আশানুরূপ ফল লাভ হল না।

আবার অন্য চিত্র দেখুন। কোনো বাবুর বৈরাগ্য হল—বেরিয়ে গেলেন। তিনি তীর্থে তীর্থে বা পাহাড়ে পর্বতে ভ্রমণ করতে লাগলেন বা তপস্যা করতে লাগলেন। যারা তাঁকে পালন-পোষণ করল তাদের কিছু সেবা করাও তাঁর কর্তব্য। এই সেবা প্রত্যক্ষ না হয়ে পরোক্ষ হতে পারে। জনগণের কল্যাণে আপনার সেবা তখন উপদেশের আকারে আসতে পারে। মানুষের দেহের সেবার চেয়ে মনের সেবা বেশী আবশ্যক এবং তার মূল্য কম নয়। আপনার এই তপস্যা নিশ্চয় সফল হবে।

জলসেচন করছেন—নালা দিয়ে জল যাচ্ছে, কিন্তু জমিতে যদি না যায়, মাঝে পথে শোষ পড়ে, তাহলে জলসেচনই সার হয়। আমাদের সরকারী বা আধাসরকারী কর্মকর্তারা যখন অবসর নিলেন পিছনে তাকিয়ে দেখলেন—এক মহাশূন্য তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। সাধকেরা এই অবস্থাকে ভূতের বেগার বলেন। যাঁরা দেশের মুক্তিযুদ্ধে শত নির্যাতন সহ্য করেছেন তাঁরা শেষ জীবনে যদি মান সম্মান না পান সেজন্য দুঃখ করার কিছু নাই—তাঁদের সেবা যদি ঠিকমত হয়ে থাকে তাতেই তাঁদের তৃপ্তি, তাঁদের আনন্দ আসবে—ত্যাগ ও সেবা তাঁদের জীবনে দুই দিক দিয়ে সফল হবে।

অনুসন্ধান

প্রবাদের দেশ মহিষাদল

মহিষাদলের লোক রহস্য প্রিয়। কথাবার্তায় অনেকে উপমা ও অলঙ্কার ব্যবহার করেন। এগুলি মুখে মুখে চলিত আছে। এই রকম কয়েকটা এখানে উল্লেখ করা হল। অর্থ স্পষ্ট করার জন্যে দুচারকথা বলা গেল।

□ নির্গুণের তিনগুণ ঝাল :
গুণবান ব্যক্তি নম্র হয়। কিন্তু গুণহীন লোক বৃথা আড়ম্বর ও দম্ভ প্রকাশ করে।

□ কাঁকপেটা খায়দায় নাদা পেটার নাম যায় :
রোগা চেহারার লোকে বেশী আহার করলেও মোটা লোক বেশী খেয়েছে মনে করলে বিচার বিভ্রাট হয়।

□ চোরের চৌরাশি বুদ্ধি :
চোরদের অনেক রকম বুদ্ধি থাকে—লোকে বুঝতে পারে না, প্রতারিত হয়।

□ আগে যায় কানা, পিছে যায় সেয়ানা :
বুদ্ধিমান লোক দলের পিছনে থাকে, কেননা বিপদ এলে আগের লোকই আঘাত পাবে।

□ সোল মাছ লেজ নাড়ে, মেছুনীর পয়সা বাড়ে :
সোল মাছ নিজেই লেজ নাড়ে, মেছুনী তখন দর বেশী হাঁকে জ্যান্ত মাছ বলে।

□ গরজে সানমার পায় গড় :
যেহেতু বিমাতা সুতরাং ইচ্ছা না থাকলেও প্রয়োজনে প্রণাম করতে হয়।

□ শেয়াল বনে কটাশ রাজা :
যেখানে অযোগ্য লোক বেশী সেখানে যে একটু মুখপাত লোক সেই সর্দার হয়ে বসে।

□ পড়ে পাশা জিতে কোদাল বাঁট :
দৈব অনুকূল হলে অতি অযোগ্য ব্যক্তিও সফল হয়।

□ পথে পাইল কামার ফাল গড়ে দে আমার :
হঠাৎ সুযোগ এসে গেলে কাজ সারবার চেষ্টা করা হয়।

□ আলসে গরু অমাবস্যা খোঁজে :
অমাবস্যার দিন লাঙ্গলের কাজ বন্ধ থাকে, যে অলস সে বিশ্রাম খোঁজ করে।

- আন খন্তা মার মুযা :
  অপ্রস্তুত লোক কাজ উপস্থিত হলে সাজ সরঞ্জাম খোঁজ করে।
- কাঠের বেড়াল ইন্দুর মারলে হল :
  কোনো লোক অপদার্থ হলেও কাজ উদ্ধার করে দিতে পারলে এরূপ উপমা দেওয়া হয়।
- সর্ব দোষ হরে মারুকা :
  যে বৃথা আড়ম্বর ও লম্ফ করে লোকে তাকেই বেশী কাজের লোক মনে করে।
- মন কী না জানে মিছরীর গুণ, শুঁকে শুঁকে বলে সন্দেশ নুন :
  এখানে আগেকার দিন যারা লবণ তৈয়ার করত তারা খুবই সরল প্রাণ লোক ছিল—তারা মিছরিকে সৈন্ধব লবণ মনে করত।
- অ্যাং যায় ব্যাং যায় খলসে বলে আমি যাই :
  নিজের কোন দরকার নাই—কেবল অপরে যাচ্ছে দেখে এগিয়ে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।
- তিন টাকার কীর্তনে চৌদ্দ সিকার খোল ভাঙ্গা হচ্ছে :
  কারবারে লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশী হলে এই উপমা।
- ভাদ্রমাসে চাষীর পনর দিন, মুচির পনর দিন :
  কতকদিন বৃষ্টি কতকদিন রোদ ভাদ্রমাসে হয়।
- যাচ্ছে তাঁতি ঘর, বলবে যাচ্ছি তারকেশ্বর :
  কপট লোকে এইরূপ বলে থাকে।
- তাঁতি করে সূতা চুরি—খোদা করে থান :
  তাঁতি কাপড় বোনার সময় সূতা কম লাগিয়ে লাভের চেষ্টা করে কিন্তু ভগবান বিরূপ হলে সর্বনাশ হয়।
- ভায়ের ভাত ভাজের লাথ :
  যে মেয়ে ভাইয়ের অন্নে প্রতিপালিত হয়, তাকে ভাজের লাথি খেতে হয়। মেয়েরা স্বামীর ঘরই পছন্দ করে।
- হাগা না মানে বাঘার ভয় :
  সঙ্কট উপস্থিত হলে কোন স্থানে ভয় আছে জানলেও লোকে এগিয়ে যেতে বাধ্য হয়।
- পয়সার পো পাথর কাটে :
  খরচ করে যাকে মানুষ করা হয়, সে কাজের লোক হয়।
- কানা খোঁড়া এক গুণ বাড়া :
  কানা ও খোঁড়া লোক কিছু বেশী বুদ্ধি রাখে এরূপ মনে করা হয়।
- পাব খাটো গনেশ পেটা, তার মধ্যে সান্ধায় কেটা :
  বেঁটে ভুড়িওয়ালা লোক কুটীল হয়, এমন মনে করে বলা হয়।

- কিপ্পনের ধন দুল্‌পা বনে :
  কৃপণের সঞ্চিত ধন বৃথা নষ্ট হয়—কোন কাজে লাগে না।
- গরজে গয়লা ঢেলা বয় :
  দুধ বিক্রি হয়ে গেলে বাঁকের দুই ধার সমান করার জন্য গয়লা ঢেলা চাপান দিলে এরূপ বলা হয়—বৃথা ভার বহন করলে এমন উপমা দেওয়া হয়।
- নল টানলে বুদা আসে :
  সামান্য সূত্র ধরে বড় ব্যাপার জানা যায়।
- মূলা বাড়ী কোরো না, বেগুন বাড়ী কোরো :
  মূলা উপড়ালে শেষ, বেগুন গাছ থেকে পরে পরে ফল পাওয়া যায়। এমন কাজ কর যেন পরে ফল মিলে।
- গদাকে পবনা কোরো না :
  সামান্য কাজের লোককে বড় কাজের ভার দিওনা।
- দুলী ভাড়ায় বৌ বিক্রী কোরো না :
  কাজে অতিরিক্ত খরচ করে আসল নষ্ট কোরো না।

আঞ্চলিক শব্দসম্ভার : মহিষাদল

এখন যুগ পরিবর্তন হয়েছে—যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে। জীবিকার প্রয়োজনে ও রাজনীতিক আবর্তনে বহু স্থানচ্যুত লোক আমাদের এই মহিষাদল অঞ্চলে এসে পড়েছেন। উড়িষ্যা সীমান্ত আর শহর কলকাতা কোনটাই এখান থেকে বহুদূরে নয়। আবার হলদিয়া হওয়ার ফলে—বিভিন্ন রাজ্যের মানুষের আনাগোনাও বেড়েছে মহিষাদল এলাকায়। এখানে সমাজের মধ্যে বাংলায় নানাস্থানের কথ্য ভাষার সংমিশ্রণ সবার অজ্ঞাতে হয়ে চলেছে। কিন্তু অনুসন্ধান করলে আমরা এমন বহু শব্দ পেতে পারি যা বাংলা ভাষার অভিধানে নাই অথবা থাকলেও এদেশে ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়।

আঞ্চলিক শব্দ সংগ্রহের কাজে রমণীমোহনকে সহায়তা করেছেন, শ্রীমতী আলপনা মাইতি।

অঁছাড়—আড়াল
অঁটা—কোমর
অদা—ভেজা/অদা কাপড়
অমবতী—অম্বুবাচী
অল্যাতল—ছাঁচতল/যেখানে চালের জল পড়ে
আইলু—এলে/"কবে আইলু"
আউলা—খোলা, আলগা
আউন্দ—জোয়ালের সঙ্গে যে দড়ির ফাঁসের মধ্যে ইষ গলানো থাকে
আনক—চশমা
আলতি—কচু
অ্যান্যা—কাপড়ের পাড় থেকে তোলা সুতা
আস্‌সে—এসেছে/'কাই নু আস্‌সে'
আমানকে—আমাদের প্রত্যেককে
ইত্রানী—উপদ্রব
উমুন/উমুনটা—বিনা কারণে শুধু শুধু
উতা—উনুনের পাশে জ্বালানী গরম বা উত্তপ্ত করতে দেওয়া
উলা—নামিয়ে রাখা
উইচিংড়ী—উচ্চিংড়ে পোকা
উধার করা—ধার করা
উধারে—ও পাশে, ঐদিকে
উন্দুর/উঁদুর—ইন্দুর, মুষিক
উজাগরী—কোজাগরী [পূর্ণিমা]
একসা—একরকম, একত্র অর্থে
এঠি—এখানে
ওকুস্মাৎ—সহসা/হঠাৎ
ওঝুর—অবিশ্রাম/বিরামহীন
ক—বল/এটা কি কাই ক ?
কশা/কসা—কুয়াশা
কষাফল—হরিতকী
করভাঙ্গা—কামরাঙ্গা ফল
কচি—ছোট ছেলে বা মেয়ে
কাই—কোথায়
কাপ-ছো—তামাসা, ঠাট্টা
কাবাচ্ছে/কাবায়টে—চীৎকার করছে
কান্দোল—বাড়ীর পিছন ভাগ
কাঁধাবাড়—বাঁধের সলগ্ন জায়গা

কাঁটা—মাছ ধরার বড়শী
কাকড়ীতলা—শুকনো মাটিতে ধানের বীজ তলা ফেলা
কাছায়নি—নিকটে আসছে না
কালকাপাতাড়ি—কালীনৃত্য শেষে পতন
কুকাপ—ঘোর অন্ধকার
কুনঠি—কোথায় [ওড়িয়া-কোঁঠি]
কুন্দগে—কোন দিকে
কুল্লে—মোটের উপর
কেবাট/কেবাড়—দরজা হিন্দী কিওয়াড়
কেতার দিয়ে—সারি দিয়ে আরবী কতার
কোকতুল—ঘুঘু পাখি
খঁজা—দুটি খড়ের চালের সংযোগস্থল
খঁপড়া—অমসৃণ, উচুঁনীচু
খলাবার—খামার-শস্য ঝাড়াই স্থান
খাবোল—গ্রাস
খাল—চামড়া
খাইসোদ—বদঅভ্যাস
খিরানো—ছড়িয়ে দেওয়া
খুড়্যা কলাই—খেসারি কলাই
গইরা—গভীর
গদা—নীচু মাঠ
গড়া দানা—যেখানে গৃহস্থের গরু সারি সারি বাঁধা থাকে
গাগরা—কলসী
গাংরুই—মৃগেল মাছ
গিরা—গিঁট/বাঁধন
গিরযা—ঘামাচি
গিলাফ—চাদর
গেড়্যা—ডোবা, পুকুর
ঘনা—ঘানি অর্থে
ঘুনী—মাছ ধরার যন্ত্র
চগার—চীৎকার, হৈচৈ
চপা—তরকারীর খোসা
চস্যড়—অভদ্রলোককে গালি অর্থে
চাবি—তালা অর্থে; চাবিছাড়ানি
ছাড়ানি—যা দিয়ে তালা খোলা যায়
চাট—পাঠশালার ছাত্র [পূর্বে ছাত্ররা বসবার আসন চাটা নিয়ে স্কুলে যেত]
চাটা—তালপাতার আসন
চামানি—মাথার উকুন [ছোট অর্থে]
চ্যাংলা—কম বয়সের ছেলে—নিন্দার্থে
ছাঁদ—জমির বাঁধ
ছ্যাঁড়া—মন্দ লোক
ছেন্যা—হেতাল পাতার ঝাঁটা
ছামড়া—চট বা কাপড়ের আবরণ
জলা—চাষজমি অর্থে
জান—জল নির্গম পথ
জামির—কমলা লেবু অর্থে
জালতি—গরুর মুখে লাগানোর জাল
জুঁড়ি—ছোট ডোবা
টঁকা—চাল ধোয়ার পাত্র
টাবা—টক লেবু
টঙ্গর—অড়হর কলাই
টেক—জিদ
ডাব—[১] নীচু মাঠ
[২] কচি নারিকেল
ডিএগ—[১] মাছ ধরার গর্ত
[২] বড় পিঁপড়ে
ডিঙ্গোর—মাথার উকুন বড় অর্থে
ডিংরা—দুষ্ট প্রকৃতির ছেলে
ডোমরা—মাদুলী
ডোলা—নুন মাখানো শুকনো আমের ফালি
ঢেলা—চোখ

ঢিপা—[১] অলস লোক
[২] ভিটা, বাস্তু
তন্নে/তন্যে—তোরা, তোমরা
তরে তরে—পৃথক পৃথক
তানাতোড়—জ্বালাতন করা, উল্টে পাল্টে দেখা
তঁ্যাদড়—দুষ্টপ্রকৃতির লোক
তেলানি—মাটির তৈরি পাত্র বিশেষ
দর—দরজা/সদর অর্থে
দামড়া—কমবয়সী বলদ গরু
দাউলি—কাটারি
দের—দেবর
দোরখা—কাঠের দীপাধার
ধাড়ি—বড় অর্থে [ধাড়ি ইন্দুর]
ধূপ—রৌদ্র
নলঢুড়কা—হারানো জিনিষ খোঁজবার জন্য মন্ত্রপূত বাঁশের দুটি খন্ড
নান্দা—বড় কলসী
নাড়া—ধান কেটে নেওয়ার পরে থেকে যাওয়া গোড়া
নিক্—মাথার উকুন [ছোট অর্থে]
নিস্—গোঁফের মত [যেমন চিংড়ী মাছের]
নিমকী পুলিশ—আবগারী পুলিশ [আগে নিষিদ্ধ লবণ ধরত]
নিরাম—নিরামিষ
নিদ্ধুমা—খুব বড় অর্থে
পড়েক— ছোট ছেলে
পতা—চওড়া ঢিপি জায়গা
পতরা—গাছের পাতা
পট করে—তাড়াতাড়ি/চট করে
পনখী—বঁটী
পাগাড়ী—গরু বাঁধবার দড়ি
পাসা—কোদাল/কুড়ালের গোড়ার অংশ
পাতি—ঘাস জাতীয়-চাটাই বোনা হয়
পাই— জমির লাইন
পিটনা—কাঠের বড় মুগুর
পিড়াই—খইল
পিরান—ঢিলা জামা
পিছা—হেতাল/খেজুর পাতার ঝাঁটা
পুত্‌রা—ভাইপো/দেওর পো
পেখ্যা—তালপাতার আবরণ—ছাতার বদলে ব্যবহৃত হয়
বচ্ছাতী—দেবমন্দিরে পরিচারক
বড়—খড়ের তৈরী মোটা দড়িবিশেষ
বড়কী—বড়বৌ, এরূপ—মাজকী/সাজকী/ছোটকী
বদা—পুংছাগল
বাখল—নিকটতম প্রতিবেশী
বাণ—আতসবাজী
বাঁদর লাঠি— সোন্দাল
বাসনা গাছ—বকফুলের গাছ
বাইচে বাইচে/বাইচি-বাইচি—অপেক্ষা করে
বাজে দিনা—কোনো কোনো দিন/হঠাৎ একদিন
বাতা/বাখারি—বাঁশের ফালি
বিচা—বীজ
বুদা—ঝোপ গাছ [নল টানলে বুদা আসে]
বেলেই—বিড়াল
বেঁউতি—মাছ ধরার জালবিশেষ
বৈতাল—মিষ্টি কুমড়ো অর্থে
ভঁড়া—মোচা অর্থে
ভদ্রা—কাঠের বসার আসন
ভাগারী—অংশীদার জ্ঞাতি
ভাউল্যা—ছোট পানসী নৌকা
ভিতা—জমির ধার
ভুকা—মুষ্ঠ্যাঘাত

ভুজা—মুড়ি
ভেড়া—বড় উঁচু বাঁধ
মট করে—দ্রুত, তাড়াতাড়ি
মষ্টে মষ্টে—চুপি চুপি, গোপনে
মন্নে—আমরা
মাড়া—মাঠের মধ্যে পায়ে চলা পথ
মামু ঝিঙ্গা—ফড়িং
মাকান্দু—সঙ্গিনী [বিবাহের পর মেয়ের সঙ্গে যায়]
মাতারী—মাতৃ/কন্যা স্থানীয়া
মুগরী—মাছ ধরা যন্ত্র/বাঁশের তৈরী
মুনাৎ—গরুর মুখের দড়ির ফাঁস
রম্ভা কলাই—বরবটি
লম্ফ—ল্যাম্প [ইং]
লক করে—যত্ন করে
লাফুর—বৃথা বাগাড়ম্বরকারী
ল্যাকা—বিনা আমন্ত্রণে যে খাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে
সঁপ—মাদুর
সঁয়—ভিন্ন, ব্যতীত
সুঞ্চা—সমস্ত
সেঠি— সেখানে
সোড়ো—স্ত্রীর ভগিনীপতি
শারে—প্রায়ই
হড়কা—পিচ্ছিল পথ
হিটমা—জেদী
হোড়—ঘোরতর কাদা।

কবিতা

রমণীমোহন খুব বেশী কবিতা লেখেননি। তবে তিনি বিভিন্ন ভাষায় কবিতা লিখেছেন—সংস্কৃত, ইংরাজি, এবং বাংলায়। 'ছোটবেলা থেকেই কবিতা ও কাব্যের দিকে আমার স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। কবিতা রচনার সময় মন অন্য এক জগতে চলে যায়।'—একথা উল্লেখ করেছেন তিনি। শতাব্দীর প্রথম পাদে 'মাধবী', 'মাহিষ্যসমাজ' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর কিছু কিছু লেখা প্রকাশিত হয়। অনেক পরে 'ভাব ও ভাবনা' নামে একটি ছোট কবিতা সঙ্কলন প্রকাশিত হয়েছে। 'বেঙ্কটেশ মাহাত্ম্য' নামেও তাঁর একটি দীর্ঘ কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর 'বিশ্বকর্মা' নাটক এবং অন্যান্য উপলক্ষ্যে রমণীমোহন বেশ কিছু গানও রচনা করেছেন—এসব গানের সুরও তিনি দিয়েছেন। রমণীমোহন কবি মনের মানুষ ছিলেন বলে পঁচাশি বছর বয়সেও কবি সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তলহরী

জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীপ্রভু চরণপদ্ম হৃদয়ে ধরিয়া
অতীব সভীত চিত্তে মরমে মরিয়া
দীন চাহে ভক্তলীলা গান করিবারে
বামন যেমন চাহে চাঁদ ধরিবারে
হে প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণ হইয়া সদয়
শক্তি দেহ যেন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়
দুরন্ত আকাঙ্ক্ষা মম জাগিয়াছে প্রাণে
শুদ্ধ হব কথঞ্চিত ভক্তগুণ গানে
প্রভুপাদে সমর্পিয়া নিজ কায়মন
যাঁহারা করিল তাঁর মহিমা ঘোষণ
সে সব মহাত্মাপদে নমি বারবার
প্রভু প্রিয় ভক্তগণ প্রিয় যে আমার
কাতরে করুণা মায়ের যাচি বারে বারে
তাঁর কৃপা বিনা মুখে বাক্য নাহি সরে
অসংখ্য সুভক্তবৃন্দে করিলা পালন
এই অভাজন কিন্তু না পাইল চরণ
অক্ষম সন্তানে স্নেহ সমধিক মার
সেই ভরসায় করি এ হেন বিচার
অভাগা সন্তানে যদি দয়া না হইবে
মাতৃনামে তব কলঙ্ক রটিবে
শত অপরাধী হই তবু সুত তব
এই গর্বে বক্ষঃস্থল ফুলাইয়া রব।।

(বেলুড় মঠ, ১৯২৯)

স্বামী বিবেকানন্দ

কলিকাতা নগরীর সিমলা পল্লীতে
শ্রীরামমোহন নাম দত্তের বংশেতে
আইন ব্যাপারে অর্থ কৈলা উপার্জন
লোকমধ্যে মান্যগণ্য অতীব সজ্জন
তাঁর পুত্র একমাত্র নামে দুর্গাদাস
পঁচিশ বৎসরে তিনি করিলা সন্ন্যাস
একপুত্র বিশ্বনাথ শিশু তেয়াগিয়া
সংসার ছাড়িয়া গেলা মোক্ষের লাগিয়া
কালক্রমে বিশ্বনাথ হৈলা মান্যমান
আইনজ্ঞ বলি বহু লভিলা সম্মান
ধন উপার্জন বহু—গৃহে মহোৎসব
রাজার সমান তাঁর ঐশ্বর্য বিভব
গৃহিনী ভুবনেশ্বরী সংসারে তাঁহার
অন্নপূর্ণারূপে আলো করেন সংসার
চারি কন্যা হইল কিন্তু পুত্র নাহি হয়
কাতরে শ্রীবীরেশ্বর প্রভুরে পূজয়
সেবায় হইয়া তুষ্ট শম্ভু দিলা বর
শিব অংশে জনমিলা কুমার সুন্দর
বড়ই চপল শিশু কিন্তু মেধাবান্
উপদ্রবে সবাকার অস্থির পরাণ
লোকত আচার সব হেয় করি মানে
দেবদেবী লয়ে কিন্তু বড় মতি ধ্যানে
বড়ই দুরন্তপনা যদি কভু করে
শিব শিব বলি মাতা জল দেন শিরে
তখনই স্থির হন বীর বীরেশ্বর
নরেন্দ্র বলিয়া পুনঃ হৈল নামান্তর
"মহাদেব না আসিয়া পাঠাইলা ভূত"
মাতা কন, "এত বড় ব্যাপার অদ্ভুত
এতেক দুরন্তপনা যদ্যপি করিবে
শিব তোরে কৈলাসেতে যেতে নাহি দিবে"
শিশু কহে, "যদি মাগো সাধু হই আমি
তবে তো নিবেন মোরে কৈলাসের স্বামী"
শুনি মাতা মনে মনে যাট্ যাট্ বলি
কতমতে প্রবোধেন পরাণ পুতলি
শীঘ্র গুরুমশায়ের পড়া সাঙ্গ করি
বিদ্যাসাগরের বড় বিদ্যালয়ে পড়ি
লভিলা প্রচুর বিদ্যা তীক্ষ্ণ মেধাবলে
অসামান্য প্রতিপত্তি বান্ধব মহলে
গানেতে মাতায় সবে দয়ায় ভুলায়
রূপে গুণে সকলের মন ভুলে যায়
উপস্থিত হৈল আসি দুর্দিন এখন
পিতা করিলেন যবে স্বর্গেতে গমন
হাজার তঙ্কার স্থলে চল্লিশ তঙ্কায়
বহুকষ্টে কোনরূপে দিন চলে যায়
এদিকে অন্তরে জাগে বৈরাগ্য অনল
সংসারের বিভীষিকা তাহাতে প্রবল
অনুক্ষণ চিন্তা কোথা ঈশ্বর পাইব
সংসারের তাপ জ্বালা কিসে নিবারিব
হেনকালে শুন কিবা অদ্ভুত ঘটন
রাম দত্ত ভবনেতে তাঁর আগমন
নরেন্দ্রের ডাক সেথা গান গাহিবারে
গানে যেন স্বরগের মন্দাকিনী ঝরে
ধন্য প্রভু রামকৃষ্ণ সন্তাপ হরণ•
আপন সন্তানে তুমি দিলে দরশন
নদীই সাগরে ধায় সর্বলোকে জানে
সাগর হইয়া তুমি গেলে নদী পানে
তনু মন প্রাণ সব আকৃষ্ট করিয়া
ধীরে শ্রীদক্ষিণেশ্বরে আসিলে চলিয়া
মহিমা তোমার ভক্তজনে কৃপা কত
শক্তি সঞ্চারণ আদি অন্য লীলা যত
কে পারে বর্ণিতে তাহা অক্ষরে ভাষায়
অধমে কেবল বৃথা কলম চালায়
শ্রীনরেন্দ্র গুরুপদে অর্পিলেন মন
লভিলা অতুলশান্তি দেবারাধ্য ধন
সংসারের কষ্ট কিছু দূর হয়ে গেল
ধ্যান যোগ তপস্যায় আকাঙ্ক্ষা বাড়িল
শ্রী প্রভুর তাঁর প্রতি মায়ার তুলনা
কেবা পারে দিতে যাহা অলোকসামান্যা

কোনো স্থানে কোনো কিছু খাদ্যদ্রব্য পেলে
নরেন্দ্রের তরে তাহা রাখিতেন তুলে
জহুরী জহরৎ চিনে স্যাকরায় সোনা
আমা সবা অধমের শুধু আনাগোনা
পীড়িত হলেন প্রভু সেবার কারণ
নরেন্দ্রাদি ভক্তগণ কৈলা প্রাণপণ
সে সময়ে একদিন কাশীপুরোদ্যানে
গৈরিক দানিলা প্রভু বাল শিষ্যগণে
আশীর্বাদ কৈলা সবে হউক চৈতন্য
প্রসাদ লভিয়া ভক্তবৃন্দ হৈলা ধন্য
লীলা সংবরণ করি যেদিন চলিলা
তার পূর্বে নরেন্দ্রের সংশয় চূর্নিলা
যেই রাম সেই কৃষ্ণ তাঁর এই দেহ
লীলা হেতু দেহধারী নাহিক সন্দেহ
প্রভু যবে ভক্তজনে ছাড়িয়া চলিলা
বালক সন্ন্যাসীবৃন্দ মঠ বানাইলা
ধন্য শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র ভক্তবর
ভ্রাতৃগণ তরে এক যোগাইলা ঘর
ধ্যান জপ তপস্যায় কত দিন গেল
পরিব্রাজকের বেশে ভারত ভ্রমিল
হিমালয় হৈতে গেলা শ্রীকন্যাকুমারী
রাজা মহারাজা আদি বহু শিষ্য করি
সবাই পাঠাতে চান শ্রীনরেন্দ্রনাথে
পাশ্চাত্ত্য জগতে এক ধর্মের সভাতে
বলেন নরেন্দ্রনাথ মনেতে বিচারি
পাইলে প্রভুর আজ্ঞা তবে যেতে পারি
কতদিন হয় গত একদিন রেতে
প্রভু রামকৃষ্ণ দেখা দিলা স্বপনেতে
সমুদ্রের পারে যেতে করেন ইঙ্গিত
মনেতে স্পষ্টত এই হইল প্রতীত
শ্রীমার অনুমতি নাই তাই দ্বিধামনা
পত্রলিখি অনুমতি করেন প্রার্থনা
বহু রাজা শিষ্য তাঁর পণ্ডিত প্রধান
জননীর কাছে কিন্তু দুধের সন্তান
পাঠাতে সাগর পারে মন নাহি সরে
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা আজ্ঞা দেন পরে
আনন্দে নাচেন বীর মার মত পাইয়া
বিহ্বল ভকতবৃন্দ সংবাদ শুনিয়া
ধন্য মদ্রদেশবাসী ভক্ত বীরগণ
শ্রীগুরুচরণে যাঁরা সমর্পিত মন
আমেরিকা যাত্রা দিন হয়ে গেল স্থির
ক্ষেত্রী হতে উপনীত সচিব সুধীর
রাজ শিষ্য পুত্র লভি গুরু আশীর্বাদে
অন্নপ্রাশনের দিনে পদধূলি মাগে
যাত্রা বন্দোবস্ত তিনি লইলেন ভার
পশ্চিমের পথে বীর হন আগুসার
পশ্চিম দেশেতে গিয়া কি কীর্তি করিলা
বিশ্বধর্মসভা মাঝে সুযশ লভিলা
ভুঞ্জিলা অনেক দুঃখ শেষেতে সম্মান
পাইলা উদার বহু সুহৃৎ মহান্
বিজ্ঞবর শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
আপন চরিতগ্রন্থে করিলা বিস্তার
বেদান্তের মহাবার্তা করিয়া প্রচার
নাস্তিক পাষণ্ড বহু করিলা উদ্ধার
অসভ্য ও বর্বরের নহে হিন্দু ধর্ম
সুধী ও বিদ্বানজনে বুঝিলেন মর্ম
"ভগিনী ও ভ্রাতাগণ" সম্বোধিলা যবে
উদার হিন্দুর মত বুঝিলেন সবে
কহিলেন বিজ্ঞ এক—মূর্খ মোরা তাই
অর্থব্যয়ে হিন্দুস্থানে পাদরী পাঠাই
আমেরিকা ইউরোপে প্রচার করিয়া
বহুদিন পর দেশে আসিলা ফিরিয়া
সিংহল হইতে দূর হিমালয় চূড়
শ্রীপ্রভুর নামগানে হৈল ভরপূর
বেদান্তের নবব্যাখ্যা কর্মজীবনেতে
শুনিয়া বিস্মিত লোক বিমোহিত চিত্তে
নারায়ণ জ্ঞানে সেবা আর্তজন প্রতি
সাধিবারে আশ্রম স্থাপনে কৈলা মতি
ভক্তজন মিলি করি আশ্রম স্থাপন
শ্রীরামকৃষ্ণের নামে করিলা জ্ঞাপন

মাদ্রাজে শ্রীহরিদ্বারে বারানসী ধামে
আশ্রম স্থাপিত হল শ্রীপ্রভুর নামে
বেলুড়ে প্রধান মঠ করিলা স্থাপন
হিমালয় মধ্যে হৈল অদ্বৈত আশ্রম
ইতিমধ্যে পুনঃ গেলা পাশ্চাত্য দেশেতে
বহুস্থান ভ্রমি পুনঃ ফিরিলা ভারতে
কঠোর শ্রমেতে ক্রমে জীর্ণ কলেবর
তথাপি কর্মেতে বীর নহেন কাতর
ইংরাজী উনিশ শ দুই চল্লিশ বছরে
যোগে দেহত্যাগ করি মিলিলা প্রভুরে
চারিদিকে ঘোরতর হল হাহাকার
আশ্রিত অনাথ ভক্ত ফেলে অশ্রুধার
অবনত ভারতের মুক্তি মন্ত্র গানে
জাগিছে স্বদেশপ্রেম লক্ষ লক্ষ প্রাণে
তাঁর শুভ আশিসের ক্ষুদ্র এক কণা
কিঙ্কর লভিতে পারে সতত প্রার্থনা।।

(১৯২৯-১৯৮৬)

স্বামী ব্রহ্মানন্দ

প্রভুর মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ
মহারাজ নামে যাঁর উথলে আনন্দ
সমৃদ্ধ কায়স্থ বংশে সে মহাসত্তম
আনন্দ ঘোষের ঘরে লইলা জনম।
চব্বিশ পরগণা জেলা শিকরায় বাস
আঠার বাষট্টি অব্দ জানুয়ারী মাস
পঞ্চম বর্ষেতে মাতা গেলা পরলোক
কোমল বালকহৃদে দিয়া বড় শোক
পুনঃ বিভা করি পিতা আনিলা গৃহিনী
গুরুস্থানে রাখালেরে পাঠালেন তিনি
বড় মনযোগ তাঁর লেখায় পড়ায়
সেইমত আকর্ষণ খেলায় ধূলায়
ভীমসম পরাক্রম বাল্যকাল হতে খেলায়
পড়ুয়া কেহ না পারে আঁটিতে
দেবদেবী প্রতি যেন স্বতঃ আকর্ষণ
কে জানে বিচিত্র লীলা তাঁহার কেমন
কভু পীর দরগায় গ্রামের দক্ষিণে
সঙ্গীগণ সঙ্গে মত্ত কালী নাম গানে
দ্বাদশ বৎসরে পাঠে আরো অনুরাগী
রাজধানী আসিলেন উচ্চ শিক্ষা লাগি
ক্রমে শিক্ষালাভ হল বয়স বাড়িল
সংসারে সাহায্য হেতু আদেশ হইল।
শ্রীপ্রভুর ভক্ত মনমোহন মহোদয়
তাঁহার ভগিনী সাথে হল পরিণয়
অগণিত ভক্তবৃন্দের গুরু কর্ণধার
তাঁহার বিবাহ শুধু লৌকিক ব্যাপার
বুঝি এই সূত্রে নাম পশিল শ্রবণে
ছুটিলেন তাঁর প্রতি মহা আকর্ষণে
ক্রমে প্রভু সনে হল অন্তরঙ্গ ভাব
সংসারের যত কিছু ঘুচিল অভাব
সন্তানের মত রন প্রভুর গোচরে
কভু ক্রোড়ে কভু রন স্কন্ধের উপরে
পিতাপুত্রে নিত্যলীলা স্বর্গীয় বারতা
বর্ণিবারে হারি মানে কল্পনা ও কথা
প্রভুর দেহান্তে মঠে রহি কিছুদিন
আশ্রয় করিলা গিয়া যমুনা পুলিন
পুষ্করাদি বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়া
আসিলেন পুনর্বার মঠেতে ফিরিয়া
স্বামীজী ফিরিয়া যবে পাশ্চাত্য হইতে
চাহিলেন সেবাধর্ম প্রচার করিতে
মহারাজ মিশনের হয়ে কর্ণধার
সাধিলেন এ জগতে অপূর্ব ব্যাপার
পাপী তাপী মুক্ত হল অগণ্য অসংখ্য
চারিদিকে নিনাদিল উচ্চে জয়শংখ
শ্রীক্ষেত্রে কয়েকবার করিয়া গমন
আনন্দে ভজনানন্দে করিলা যাপন
শ্রীধাম শ্রীক্ষেত্র হতে গেলা মদ্রদেশ
সেথায় হইল তাঁর সমাধি আবেশ

সেতুবন্ধ রামেশ্বর দর্শন লাগিয়া
সঙ্গীগণ সহ সেথা উত্তরিলা গিয়া
কয়দিন রহি ফিরি মাদুরা নগরে
দর্শন করিতে গেলা মীনাক্ষী দেবীরে
মাতার দর্শনে হৈল মহা ভাবোদয়
শ্রীচরণে বদ্ধদৃষ্টি অশ্রুধারা বয়
থরথর কাঁপে দেহ ভাবের আবেশে
সঙ্গীগণ ঘিরি দাঁড়াইল চারিপাশে
দুই দন্ডাধিক কাল পরে ভাব শেষে
বহু দৃশ্য দেখিলেন আনন্দ বিশেষে
পরে মহীশূরে নব আশ্রম স্থাপনে
চলিলেন মহারাজ আনন্দিত মনে
ধন্য সেই দেশবাসী ভাগ্যবানগণ
মধুর বক্তৃতা তাঁর করিলা শ্রবণ
বনের কুসুম সম জীবন তাঁহার
মুখর হইল আজি প্রভুর কৃপায়
আরবারে কাঞ্চীদেশ দর্শন করিয়া
শ্রীক্ষেত্রেতে মহারাজ এলেন ফিরিয়া
সঙ্গেতে আনিলা মধুমাখা রামনাম
কীর্তনে যাহার মধু ঝরে অবিরাম
প্রচারিলা বঙ্গদেশে ভক্তের কারণে
আজি প্রচারিত তাহা ভবনে ভবনে
পর বৎসরে বারানসী আগমন
সেবাশ্রম দ্বার করিলেন উদ্‌ঘাটন
আশীর্বাদ করিলেন সমাগত জনে
আনন্দের স্রোত বহি গেল কয়দিনে
পরবর্ষে হরিদ্বার কনখল গিয়া
আরাধিলা সমারোহে দেবী মহামায়া
যাপিলেন কতদিন বারানসী তীর্থে
তথায় অদ্ভুত এক দেখিলেন চক্ষে
একদিন রাম নামে মহারাজ বসি
অন্য অলক্ষিতে এক বৃদ্ধ বিপ্র আসি
রঘুবীর পার্শ্বে করি আসন গ্রহণ
শুনিতে লাগিলা মধু নাম সংকীর্তন

অচেনা দেখিয়া মহারাজ বারবার
দৃষ্টিপাত করিলেন বদনে তাঁহার
সহসা কোথায় গেল না পান দেখিতে
মহারাজ মনে মনে লাগিলা চিন্তিতে
অন্য কেহ নয় উনি স্বয়ং মহাবীর
যেথা হয় রাম নাম সদাই হাজির
একদিন হৈল তাঁর কঠিন ব্যারাম
শ্রীশ্রীমার পাদোদকে হইল আরাম
শ্রীশ্রীপ্রভু আবির্ভূত কহিলেন তাঁরে
প্রসাদ ব্যতীত নাহি সহে রাখালেরে
সত্ত্বেতে গঠিত দেহ নিত্যসিদ্ধ বীর
অশুদ্ধ ভক্ষণে তাঁর পীড়িত শরীর
পুনঃ কত বর্ষ ধরি কত স্থানে গিয়া
প্রভুর পবিত্র বাণী প্রচার করিয়া
ভ্রমিলেন পূর্ববঙ্গ উড়িষ্যা প্রদেশ
শ্রীভুবনেশ্বরে মঠ স্থাপিলা বিশেষ
একাম্রকাননে স্থিত প্রভু লিঙ্গরাজ
তারি পার্শ্বে শান্তিময় বনরাজি মাঝ
মন্দির পূর্ণিত দেশে অতি মনোরম
স্থাপিলেন শ্রীপ্রভুর পবিত্র আশ্রম
লীলা সংবরণ কাল হইলে নিকট
আপন মহিমা কিছু করিলা প্রকট
যেই ব্রজধাম হতে আগমন তাঁর
দেখিলেন সেইধাম সখাগণ আর
প্রাণ সখা কৃষ্ণ দেখি বিভোর আনন্দে
মহাসমাধিতে দেহ ছাড়িলা স্বচ্ছন্দে
তেরশ আটাশ সাল চৈত্রমাস শেষে
ইংরাজী এপ্রিল দশ উনিশ বাইশে
তাঁর মহিমার কথা কে পারে বর্ণিতে
কে পারে এমন শক্তি নাহিক জগতে!
তেজোময় রবি যথা বিচ্ছুরিছে জ্যোতি
সেইমত অদৃশ্য তেজ নিতি নিতি।
যে গিয়েছে তাঁর পাশে যে দেখেছে তাঁরে
পবিত্র ভাবেতে পূর্ণ করেছে তাহারে

সাগর সমান হৃদি পতিতে করুণা
কোথাও মিলেনা কভু তাঁহার তুলনা
তাঁর শুভ আশিসের মাত্র একবিন্দু
দীন মোহনের শিরে হোক পূর্ণ ইন্দু।
(বেলুড়মঠ, ১৯৩১)

স্বামী প্রেমানন্দ

প্রেমেতে আনন্দ যাঁর সেই প্রেমানন্দ
সার্থক যাঁহার নাম স্মরণে আনন্দ
প্রভুর গোষ্ঠীর মাঝে অম্লান কমল
মহিমাপূর্ণিত যার নভ জল স্থল।
ব্রজেশ্বরী শ্রীরাধার অংশে জন্ম যাঁর
কে পারে বর্ণিতে তাঁর মহিমা অপার
আঁটপুর নামে গ্রাম হুগলী জেলায়
ঘোষ আর মিত্র বংশ বিরাজে সেথায়
ঘোষের বংশেতে তারাপদ গুণমণি
মিত্রকন্যা মাতঙ্গিনী তাঁহার গৃহিনী
ধর্মকর্মে রত সদা গৃহস্থ সুজন
তাঁহাদের তিনপুত্র এক কন্যা হন
জ্যেষ্ঠ কন্যা তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণভাবিনী
প্রভুর পার্ষদ বলরামের গৃহিনী
তুলসীরাম বাবুরাম আর শান্তিরাম
তিনপুত্র রূপেগুণে সবে অভিরাম
পাঠ তরে কলিকাতা আসি বাবুরাম
উচ্চ বিদ্যালয়ে এক পাইলেন স্থান
প্রভুর চরিতকার শ্রীম মহাশয়
গুপ্ত নামে রহে সদা যাঁর পরিচয়
তিনিই সে প্রতিষ্ঠানে হন কর্ণধার
প্রভুর নিকটে সদাগমন তাঁহার
দৈবযোগে রাখালও মিলেন তথায়
প্রভুর অজ্ঞাতপন্থা বোঝা বড় দায়
দুইজনে সেই হতে মধুর মিলন
প্রভুপার্শ্বে এক দিন দোঁহার গমন
সন্ধ্যার পরেতে পান প্রভুর দর্শন
রাখালের কাছে প্রভু পরিচয় লন
প্রদীপের আলো লয়ে সম্মুখে তাঁহার
আরতির ছলে হেরি বদন তাঁহার
নিরখিয়া তুষ্ট হয়ে পরে প্রভু কন
নরেন্দ্রের তরে বড় মন উচাটন
সে রাত্রি রহেন তাঁরা আনন্দিত মনে
ভাবেন নরেন্দ্র তরে চিন্তা কি কারণে
গভীর নিশিতে প্রভু মত্ত ভাবাবেশে
উপস্থিত হইলেন তাঁদের সকাশে
"ঘুমে কি তোমরা আছ? শোন মোর কথা
নরেন্দ্রের তরে প্রাণে বড় ব্যাকুলতা
নিশ্চয় বলিও তারে বারেক আসিতে
কাপড় মোচড়ে যেন অন্তর মাঝেতে
নিশিমাঝে কতবার এইরূপ আসি
নরেন্দ্রের তরে তীব্র যাতনা প্রকাশি
অনুনয় করি কত কহেন তাঁদেরে
কষ্টেতে রাখাল শান্ত করেন তাঁহারে
বাবুরামের বালক আকার স্বভাব
অতি বাল্য হতে পূর্ণ বৈরাগ্যের ভাব
পবন সংযোগে অগ্নি যেমন প্রবল
প্রভুর দর্শনে তথা বৈরাগ্য অনল
পুনঃ একদিন বনভোজন আনন্দে
রাখাল সহিত তিনি মিলেন নরেন্দ্রে
গুণে রূপে মুগ্ধ তাঁর হইলা সেদিনে
প্রীতিতে রহিলা বদ্ধ সমস্ত জীবনে
ক্রমে প্রভুপদে করি আত্মসমর্পণ
হইলেন শ্রীপ্রভুর আপনার জন
সমাধি আবেশে প্রভু যে সময়ে রন
না পারে ছুঁইতে কোন অপবিত্র জন
শুদ্ধসত্ব, সুপবিত্র মন মাঝে যাঁর
অপবিত্র ভাব কোন না হয় সঞ্চার
এহেন শ্রীবাবুরাম নিকটে রহিতে
কহিলেন শ্রীশ্রীপ্রভু ব্যাকুলিত চিতে

কিন্তু পাছে নিজ লোকে ঘটায় ব্যাঘাত
সর্বদা রহিতে নাহি পান তার সাথ
একদা জননী তাঁর প্রভুর দর্শনে
আসিলে দক্ষিনেশ্বরে সেই শুভক্ষণে
প্রভু কহিলেন মোরে এক ভিক্ষা দাও
তোমার শ্রীবাবুরামে মোরে দিয়ে যাও
সিংহীগর্ভে জন্মে সিংহ সাগরে রতন
যেমন জননী তাঁর সন্তান তেমন
আনন্দে জননী মানি পরম আহ্লাদ
সঁপিলেন পুত্র লাগি প্রভুর প্রসাদ
এ এক অপূর্বভাব প্রভুর ঘটন
আপনার জনে নিজে ভিক্ষা মাগি লন।
অপার করুণা তাঁর নারি বর্ণিবারে
দীনবেশে প্রেম যাচি যান দ্বারে দ্বারে
শুদ্ধজন কিবা কথা পাপী দুরাচার
দ্বার বহি প্রেম দিয়া করেন উদ্ধার
করিলেন বাবুরাম অপূর্ব সাধন
মূর্খ অভাজন কিবা করিবে বর্ণন
ক্রমে প্রভুর দেহ অন্তে নব মঠে আসি
গুরু ভ্রাতাগণ সহ হইলা সন্ন্যাসী
প্রেমানন্দ নাম লভি স্বামীজীর পাশ
প্রেমের বাজার নব করিলা প্রকাশ
যে জনের যাওয়া আসা এ হাটে হয়েছে
সারাটি জীবন তার ধন্য হয়ে গেছে
বেলুড়ের মঠে বসে হয়ে স্পর্শমণি
কত লোহা সোনা করে দিয়েছেন তিনি
গুণের বর্ণনা করি নাহি পাই শব্দ
অক্ষম লেখনী লজ্জা পেয়ে হয় স্তব্ধ
পূর্ববঙ্গ ভেসে গেল প্রেমের বন্যায়
হিন্দু ও মুসলমানে জয় জয় গায়।
করিলেন কত শত সন্ন্যাসী গঠন
মিশনের কালজয়ী গর্ব নিদর্শন
তেরশ পঁচিশ সালে শ্রাবণ মাসেতে
দিব্যধামে মিলিলেন প্রভুর সঙ্গেতে
আড়ম্বরহীন সদা তাঁহার জীবন
একটী ক্যাম্বিস ব্যাগ তার নিদর্শন
স্মৃতিরূপে কয়খানি পুস্তক রহিল
আর কোন স্মৃতিচিহ্ন না পাওয়া গেল
তাঁর করুণার কণা মঙ্গল বিতরে
বর্ষিত হউক দীন মোহনের শিরে।।

(বেলুড়মঠ ১৯৩১)

স্বামী শিবানন্দ

পথিক চলিয়া যেও বারাসত গ্রাম
পথের পাশেতে আছে শিবানন্দ ধাম
প্রভুর গণের মধ্যে প্রবীণ পবিত্র
মহাপুরুষ মহারাজ নামেতে বিদিত
কানাই ঘোষাল বাবু মহাভাগ্যবান
তাঁর পুত্ররূপে এল তারক মহান্
মোক্তার কানাইবাবু তন্ত্র মন্ত্রে দড়
যাতায়াত ছিল তার দক্ষিণ শহর
প্রভুর অঙ্গের জ্বালা প্রশমন তরে
কবচ দিলেন এক কানাই তাহারে
নানাস্থানে তারকের কাটিল সময়
শেষে প্রভুপদে আসি লভিলা আশ্রয়
পিতৃমাতৃ সত্যব্রত পালনের তরে
সংসারে প্রবেশ তিনি করিলেন পরে
কিন্তু যে যাহার লোক সে চিনে তাহায়
আবার প্রভুর ঠাঁই লইলা আশ্রয়
বুদ্ধগয়া মহাতীর্থ করেন দর্শন
সঙ্গেতে নরেন্দ্র কালী আনন্দিত মন
যবে ঘুচে গেল তাঁর সংসার বন্ধন
মঠে তপস্যায় মগ্ন হলেন তখন

স্বামীজী দিলেন আখ্যা মহাপুরুষ নাম
সর্বদেশে প্রচারিত সেই সে আখ্যান
ধর্মপ্রচারের তরে গেলেন সিংহলে
আলমোরা আশ্রম স্থাপিলা হিমাচলে
কাশীতে অদ্বৈত মঠ ঘোষে তাঁর কীর্তি
কনখলে পাঠশালা লাগিয়া খেয়াতি
পূর্ববঙ্গ ভ্রমিলেন প্রভুর প্রচারে
বোম্বাই উতকামন্দ আর নাগপুরে
উনিশ ছাব্বিশ শালে মহা সম্মেলন
সভাপতি হয়ে তাহে দিলেন ভাষণ
অকাতরে দানধর্মে সতত প্রবৃত্তি
ভক্তজন হিত তরে প্রবল আকুতি
বেলুড়ের শ্রীমন্দির তাঁর বড় কীর্তি
আপনি স্বহস্তে যার স্থাপিলেন ভিত্তি
মহাপুরুষের এই নিয়ত প্রার্থনা
সবার আনন্দ লাগি করেন কামনা
শরীরটা ভাল নয় আছি ভাল মনে
হাতটি বাড়ায়ে আছি ঠাকুরের পানে
পাঁচটী বছর পাই তাঁহার দর্শন
স্বপনেও শুনি তাঁর মধুর বচন
এত ভাগ্য লভিলেক দীন অভাজন
গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করি সমাপন।

স্বামী অখণ্ডানন্দ

১৮৬৪ সাল এক শুভ দিনে
জন্মিলেন শিশু এক বোসপাড়া লেনে
ঘটক পদবী তার নাম গঙ্গাধর
মহাসত্ব মহাজ্ঞানী সর্বগুণাকর
কলিকাতা নগরীর উত্তর পল্লীতে
সঙ্গী হরিনাথ সনে চলেন ভ্রমিতে
চুম্বকের আকর্ষণে লোহা ছুটে যায়
দক্ষিনেশ্বরে গিয়ে যাত্রা শেষ হয়
শ্রীপ্রভু সাক্ষাতে যবে উপনীত হন
তুই ত এখানকার—মিষ্ট সম্ভাষণ
রাত্রিবাস করিলেন কালীর মন্দিরে
ক্রমে বহু ভ্রান্ত মত চলে গেল দূরে
প্রভু কন—দেখেছিস আমার নরেনে
তাঁহারে চিনিতে বড় বাঞ্ছা হয় মনে
প্রভুর অবর্তমানে ঘুচিল সংসার
পরিব্রাজকের বেশে যাত্রা তাঁহার
স্বামীজী ও মহারাজ দুজনের সঙ্গে
কেটে গেল কিছুকাল ভ্রমণের রঙ্গে
চিকাগো সহরে সভা মহাধূমধাম
স্বামীজী লভেন সেথা অপূর্ব সম্মান
তাঁর অনুগত প্রিয় ভাই গঙ্গাধর
দরিদ্র সেবার পথে হন অগ্রসর
ইষ্টজ্ঞানে শিবরূপে দুঃস্থজন সেবা
এমন করেছে কেহ এ জগতে কেবা
দুর্ভিক্ষ দমনে তাঁর একান্ত প্রয়াস
সেই সূত্রে করিলেন অনাথ আবাস
শিক্ষার বিস্তার হেতু হল বিদ্যালয়
তাহা ভিন্ন সারগাছি আশ্রম আলয়
দীনের সৌভাগ্য তাঁর চরণ দর্শন
বেলুড় মঠেতে মধ্যে মধ্যে আগমন
অপূর্ব ভ্রমণ কথা তিব্বতে ভারতে
শোনালেন ভক্তজনে মধুর ভাষাতে
শ্রীঅন্নদানন্দ স্বামী সেবক তাঁহার
করেছেন লীলাগ্রন্থে বর্ণন তাহার
শিশুসম গঙ্গাধর শিশুসম মন
অথচ কর্মেতে সিংহ সম বীর্যবান
ধন্য এ ভারতভূমি জনমে তাঁহার
শ্রীপ্রভুর মহাশক্তি তাঁহাতে প্রচার।।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ

শ্রীপ্রভুর নাম সনে যুক্ত যাঁর নাম
ধন্য সে ধরণীতলে পুণ্য কীর্তিমান
শ্রীশশিভূষণ নাম ব্রাহ্মণ নন্দন
ভাগ্যবলে লভিলেন প্রভুর দর্শন
আদিবাস আদিগঙ্গা প্রবাহের কূলে
জয়নগর মজিলপুর লোকে খ্যাত বলে
বাপুলি উপাধি ছিল পরে চক্রবর্তী
কলিকাতা এসে হেথা করেন বসতি
ঈশ্বর ও গিরীশ নামে দুই জ্ঞাতি ভাই
পটলডাঙ্গা অঞ্চলেতে রহেন সবাই
দুইজনের দুইপুত্র শশী ও শরত
হেয়ার স্কুলের ছাত্র পাঠাভ্যাসে রত
কেশবচন্দ্রের ছিল ধর্মের সমাজ
ধর্মকথা শুনিবারে সেথা যাতায়াত
পরমহংসের বার্তা তিনি প্রচারিলা
দুই ভাই সেই সূত্রে তাঁহারে মিলিলা
অন্তরঙ্গ গোষ্ঠী মধ্যে পাইলেন স্থান
শ্রীশশিভূষণ সদা গুরুগত প্রাণ
যবে করিলেন প্রভু লীলা সংবরণ
শিষ্যবৃন্দ করিলেন মঠ সংস্থাপন
সে মঠে ঠাকুর পূজা করি প্রবর্তন
শ্রীশশিভূষণ সবে করেন রক্ষণ
বরাহনগরে সেই মঠ হয়েছিল
ঠাকুরের ত্যাগী শিষ্য সবে মিলেছিল
তীর্থপথে একে একে সকলে চলিল
শ্রীশশিভূষণ কিন্তু মঠেতে রহিল
অতি দীনভাবে করে প্রভুর পূজন
কেহ দেখে নাই হেন সেবার অতুলন
রামকৃষ্ণানন্দ নাম সার্থক হইলা
মঠ মিশনের কাজে মাদ্রাজ চলিলা
শঙ্করের নিন্দা তিনি না করেন সহন
পুনঃ রামানুজের করে চরিত লিখন
ঠাকুরের মত মন অপূর্ব উদার
ভক্তজন চিত্তে করে আনন্দ সঞ্চার
কঠিন শ্রমেতে হল শরীর কাতর
আরোগ্যের জন্য এলেন কলিকাতা সহর
উনিশ এগার সালে আগস্ট একুশে
মিলিলেন এক ক্ষণে প্রভুর সকাশে
তাঁর পুণ্যস্মৃতি লয়ে ধন্য ভক্তজন
আশীর্বাদ লাভ তরে করি আকিঞ্চন।

স্বামী সারদানন্দ

মায়ের সন্তান বীর শ্রীসারদানন্দ
মাতৃনামে নাম তাঁর স্মরণে আনন্দ
রামকৃষ্ণ লীলাগানে শ্রীল ব্যাসসম
সার্থক লেখনী তাঁর বিশ্বে অনুপম
ঋষিকৃষ্ণ দলে দুই প্রধান ভকত
শশী ও শরৎ নামে ছিলা পরিচিত
মঠ মিশনের ভার আপনার শিরে
বহিলেন আজীবন বিনম্র অন্তরে
কলিকাতা ঠনঠনে পল্লীর ভিতরে
পন্ডিত বংশেতে জন্ম গিরীশের ঘরে
মাতা নীলমণি দেবী অতি ভাগ্যবতী
তিনকন্যা পরে পুত্র শরৎ সুমতি
জ্যোতিষী বলেন বংশ করিবে উজ্জ্বল
অতি শান্ত ধীর স্থির স্বভাবে কোমল
আঠার পঁয়ষট্টিসাল বিশে ডিসেম্বর
শুভ জন্মলাভ তাঁর বঙ্গের ভিতর
একঘরে জন্মেছেন শশী গুণবান
একসাথে বাল্যলীলা হয় সমাধান
হেয়ার স্কুলের ছাত্র তর্কে অতি দক্ষ
শরীর চর্চায় পটু মনোহর স্বাস্থ্য
বাল্য থেকে মানব সেবায় বড় মন
নানা ধর্ম মতে জ্ঞান করে অন্বেষণ

নদীধারা হয় যথা সাগরে ধাবিত
শ্রীরামকৃষ্ণের স্থানে হন উপনীত
প্রতি গুরুবার যান গুরুর সকাশে
কৃপালাভ করিলেন একই দিবসে
কলেজ সেদিন বন্ধ পুণ্য অবসর
শ্রীপ্রভু তাঁদের প্রতি প্রসন্ন অন্তর
দুই ভাই করিলেন নরেন্দ্র মিলন
সঙ্গীত শ্রবণে আরো আনন্দিত মন
আঠার বিরাশী সালে পাঠ হল শেষ
ডাক্তারী পড়িতে সবে দেন উপদেশ
কাশীপুরে গুরুসেবা অন্তিম সময়ে
পিতাও এলেন সেথা সশ্রদ্ধ হৃদয়ে
কল্পতরু দিনে কৃপা করিলেন লাভ
সারা জনমের মত মিটিল অভাব
শ্রীপ্রভু গেলেন চলি নিজ নিকেতন
আকুল সন্তানগণ করেন ক্রন্দন
নরেন্দ্র বলেন ভাই কি চান ঠাকুর
এস সবে মিলি করি মায়ামোহ দূর
নূতন মঠেতে দুই ভাই অধিস্থান
সংসার ছাড়িয়া পরমার্থ লাগি মন
মাতা পিতা আসিলেন লয়ে আশীর্বাদ
বিশ্বে বিঘোষিত এই আনন্দ সংবাদ
পঞ্চবর্ষ গেল পরিব্রাজকের বেশে
মায়ের চরণে জয়রামবাটী অবশেষে
ম্যালেরিয়া ও দেশেতে বড়ই প্রবল
সেইজ্বর ভোগে হইলেন দুরবল
লন্ডন হইতে ডাক এল স্বামীজীর
চল রামকৃষ্ণ কাজে প্রিয় ভক্তবীর
হলেন নূতন বক্তা প্রিয় স্বামীজীর
সঙ্গী লভিলেন গুডউইন সুধীর
স্বামীজীর কথা তিনি করেন রক্ষণ
যার ফলে উপকৃত সারা বিশ্বজন
মায়ের গণেশ তিনি তাঁর সেবা কাজ
তথা মঠ মিশন ও সাধুর সমাজ
বেলুড় মঠেতে মায়ের সমাধি মন্দির
জনম ভিটাতে আবার মার মন্দির
সমাহিত মহাযোগী প্রভুলীলা ধ্যানে
লীলার প্রসঙ্গ শেষ হল এতদিনে
ক্রমে জীর্ণ হল দেহ উনিশ সাতাশে
সেই কর্মক্ষেত্রে দেহ রাখিলেন শেষে
এ দীন অধম কাঁদে শেষ চিতা জ্বলে
বেলুড় মঠের প্রান্তে জাহ্নবীর কূলে
ধন্য তাঁর মাতৃসেবা নাহিক তুলনা
কণিকা লভিতে করি আকুল প্রার্থনা।।

স্বামী তুরীয়ানন্দ

তপস্যা, তিতিক্ষা, ত্যাগ যেন মূর্তিমান
ধন্য হরি মহারাজ সাধুর প্রধান
বাগবাজারেতে বাস চাটুয্যে বংশেতে
পিতা চন্দ্রনাথ মাতা প্রসন্ন কোলেতে
আঠার তেষট্টি সাল বিশে জানুয়ারী
কনিষ্ঠ সন্তানরূপে জনম তাঁহারি
বাল্যহতে সদাচারী অতি শুদ্ধাচার
তিনবার গঙ্গাস্নান হবিষ্য আহার
দীননাথ বসু গৃহে এলেন ঠাকুর
দর্শনে তাঁহার মনে আনন্দ প্রচুর
আরবার বলরাম বসুর ভবনে
দর্শন লভেন আরো কত ভক্তসনে
মিশনারী স্কুলে শিক্ষা খ্রিষ্ট শাস্ত্র পাঠে
কিছুদিন আনন্দেতে তাঁর দিন কাটে
খুড়তুতো ভাই এক যবে চলে গেল
মৃত্যুর প্রতাপ দেখে বৈরাগ্য জন্মিল
গঙ্গাধর তুলসীর একস্থানে বাস
বাল্যখেলা তাঁহাদের সাথে বার মাস
একদিন গঙ্গাধর বলে হরি ভাই
চল দুইজনে মিলে সাধু স্থানে যাই

সাধন ভজন চাই ভগবৎ দর্শন
আশ্বাস পাইয়া হয় আনন্দিত মন
ঠাকুরের মুখে বাণী শোন তোরা সবে
ঈশ্বরের কৃপা বিনা কিছু নাহি হবে
অতএব কর তাঁরে নির্ভর একান্ত
সদয় হইয়া তিনি দেখাবেন পথ
ঠাকুর সমাধিমগ্ন কভু বসে রন
কভু বিভু গুণ গাহি করেন কীর্তন
তুই তো হরির দাস ভাবনা কি তোর
আশ্বাস করেন প্রভু আনন্দ অন্তর
প্রভুর অবর্তমানে ভাইদের সাথ
মঠে আসি যোগ দেন সবার সাক্ষাত
কভু স্বামীজীর সনে কভু অন্য ভাই
নানা তীর্থ ভ্রমিলেন পদব্রজে যাই
দ্বাদশ বৎসর নানা তীর্থপথে গেল
ইতিমধ্যে কতরূপ ঘটনা ঘটিল
বিবেকানন্দের নাম ছড়াল ভুবনে
বেলুড়েতে মঠ হল সবার কারণে
সেখানেতে আসিলেন হরি মহারাজ
তুরীয় আনন্দ নাম সাধুর সমাজ
এখানেতে স্বাস্থ্যহানি দেখিয়া তাঁহার
স্বামীজী বলেন চল পাহাড়ে এবার
আলমোড়া মঠ হিমালয়ের ভিতরে
গঠন করিতে হবে সাধুদের তরে
স্বামীজী অসুস্থ পুনঃ চিন্তার কারণ
আমেরিকা যাইবার হয় আয়োজন
হরি ভাই চলে সাথে আর নিবেদিতা
লন্ডন হইয়া সবে গেলা আমেরিকা
আছেন অভেদানন্দ তখন সেথায়
সবে মিলে বেদান্তের করেন প্রচার
আমি দেখায়েছি ভাই ক্ষত্রিয়ের বল
তুমি হরি ভাই জ্বাল ব্রাহ্মণ্য অনল
রহিলেন সেথা প্রায় তিনটি বৎসর
পরে ভারতের পথে হন অগ্রসর
পূর্বপথ দিয়ে এল জাহাজ রেঙ্গুনে
দারুণ শোকের বার্তা গেল তাঁর কানে
ভাই নরেনেরে আর না পাব দেখিতে
এই বলি শিশুসম লাগিলা কাঁদিতে
আবার যাইতে চান ধাম বৃন্দাবন
বিচলিত মহারাজ আদি বন্ধুজন
অনুগত কৃষ্ণলাল ধীরানন্দ যিনি
সেবার কারণে সঙ্গে চলিলেন তিনি
তিনটি বৎসর গেল কৃষ্ণ কথা রঙ্গে
কাটাইলেন ভাগবত কথার প্রসঙ্গে
আলমোড়া মায়াবতী আশ্রমে আবার
স্বামীজীর গ্রন্থাবলী করিলা প্রচার
আবার তপস্যা হিমালয়ের নানাস্থানে
জিতনিদ্র মহাযোগী বারণ না মানে
কাশীধামে করিলেন অন্তিম আশ্রয়
সেইকালে সেখানেতে দুর্গাপূজা হয়
চণ্ডীপাঠে মগ্ন তিনি কণ্ঠে চণ্ডী তাঁর
একাসনে বসি পাঠ করেন আবার।
ইতিমধ্যে সংঘমাতা করিলা প্রয়াণ
পরে মহারাজ নিজে করিলা প্রস্থান
লাটু ভাই সঙ্গে ছিল সেও চলে গেল
ভাবিলেন এ শরীর চলে গেলে ভাল
ব্রহ্মসত্য জগৎ সত্য রামকৃষ্ণ জয়
এত বলি চলিলেন অমর নিলয়।।

স্বামী অভেদানন্দ

কলিকাতা নগরীর আহিরীটোলায়
বসতি করেন রসিক চন্দ্র মহাশয়
ইংরাজীর অধ্যাপক ধর্মশাস্ত্রে মন
সমগ্র ভগবদ্‌গীতা ছিল অধ্যয়ন
তাঁর ঘরে জন্মিলেন মধ্যম তনয়
আঠার ছষট্টি দুই অক্টোবর হয়
মাতার নাম নয়নতারা অতি ভাগ্যবতী
কালীপ্রসাদ নাম রাখেন করিয়া ভকতি

বাল্যকাল হতে টান শিশুর সংস্কৃতে
বড়ই আগ্রহ তার বক্তৃতা শুনিতে
প্রভুর দর্শন লাভে সতত আকুল
যোগ শিক্ষা দিতে তিনি হন অনুকূল
তখনই দয়ালের কাছে দীক্ষা লাভ
প্রভুপদ সার জানি সংসারে বিরাগ
ঠাকুর গেলেন চলে মঠে যোগদান
শ্রীকালীতপস্বী সেথা হন অধিষ্ঠান
পরিব্রাজকের পথ করিয়া গ্রহণ
সমগ্র ভারত করিলেন পর্যটন
কভু গঙ্গাধর সঙ্গে কভু বা তুলসী
এটাওয়া পৌঁছিলেন তিনজনে আসি
বিপ্রদাস সেই স্থানে উকীল মহান্
তিন সন্ন্যাসীর সেবা সযত্নে করান
ব্রজধামে জয়পুরে তিনের ভ্রমণ
এমতে অনেকদিন করেন যাপন
হিন্দুধর্ম প্রচারিত ছিল আদি যুগে
পুনঃ তাহা প্রচারিতে মনে সাধ জাগে
স্বামীজীর ডাক এল পাঠাও কালীরে
তখনই চলিলেন লণ্ডন নগরে
প্রথম বক্তৃতা সেথা দর্শন বিষয়ে
মহা হর্ষ উপজিল স্বামীজী হৃদয়ে
সার্থক তাঁহার নাম শ্রীঅভেদানন্দ
আমেরিকা দেশ যাতে পাইল আনন্দ
করিলা অদ্ভুত কীর্তি সেই ভূখন্ডেতে
চব্বিশ বৎসর ধরি পাশ্চাত্য জগতে
উনিশ শ একুশে যবে দেশে ফিরিলেন
কলিকাতা কেন্দ্রে নিজ মঠ স্থাপিলেন।
বজ্রগর্ভ বাণীযুত বেদান্ত প্রচার
মাধ্যম হইল ভাল বিশ্ববাণী তার
সে সময়ে এই দীন সৌভাগ্যবশেতে
পাইল দর্শন তাঁর নব আশ্রমেতে
বেদান্ত সমিতি নামে করিলেন সব
শ্রীরামকৃষ্ণের নামে হইল গৌরব
আঠার বৎসর শেষে দেখিলেন চাহি
সঙ্গের সাথীরা কেহ আর সঙ্গে নাহি
ঠাকুরের কোলে মাথা রাখিলেন তিনি
বিষাদে আচ্ছন্ন হল সমগ্র অবনী।।

স্বামী সুবোধানন্দ

আমাদের বড় প্রিয় খোকা মহারাজ
প্রসিদ্ধ মহাত্মা তিনি বালক স্বভাব
কলিকাতা কেন্দ্রস্থলে কালীমাতা স্থান
ঠনঠনে পল্লী বলি রয়েছে আখ্যান
শঙ্কর ঘোষের বংশ অতি উচ্চ হয়
সেই বংশে জন্মেছেন এই মহাশয়
সুবোধ নামেতে যথা স্বভাবে তেমন
আঠার সাতষট্টি নভেম্বরেতে জনম
পুস্তকে পড়িয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী
দর্শনের অভিপ্রায় হইল তখনি
জনক আশ্বাস দেন নিয়ে যাব তোরে
দেরী দেখি নিজে যান মিলিতে প্রভুরে
ঠাকুর বলেন অতি অন্তরঙ্গভাবে
বলেছেন কালীমাতা ইষ্টলাভ হবে
শ্রীপ্রভুর কৃপা লভি ধ্যানসিদ্ধ হন
মাতারে বলেন জ্যোতি করেছি দর্শন
মাস্টার মহেন্দ্রগুপ্ত পড়শী তোমার
তার সাথে দেখা শোনা কর একবার
প্রথমে সংশয় গৃহী মাস্টার মশায়
কেন যাব তার কাছে কিসের আশায়
বলেন ঠাকুর যা না লাভ হবে তোর
তাহলে নিশ্চয় যাব—করেন উত্তর
যা কিছু যেথায় পাব নিজেই বুঝিব
অপরের শোনা কথা কভু না শুনিব
প্রভু অদর্শন হলে সংসার ছাড়িয়া
গুরুভ্রাতাগণ সাথে মিলিলেন গিয়া

সন্ন্যাস গ্রহণ করি প্রভুর প্রচারে
সারাটী জীবন দেন মিশনের তরে
এক সার কথা তাঁর—সত্য কথা বল
আর সব হয়ে যাবে—বিশ্বাস প্রবল
পূর্ববঙ্গ ভ্রমি ফিরি অসুস্থ শরীর
বেলুড় মঠেতে আসি হইলেন স্থির
কেমন আছেন বাবা? শরীর কেমন?
সেইমত আছি প্রভু রাখেন যেমন
ভাঙ্গা শরীরেতে আর রেখোনাকো মোরে
আশীর্বাদ করে যাই সকল ভক্তেরে
লভিলেন ইচ্ছামৃত্যু সাক্ষাতে সবার
রামকৃষ্ণ নাম হল জগতে প্রচার
উনিশ বত্রিশ সাল ডিসেম্বর মাসে
মিলিলেন সুখে নিজ প্রভুর সকাশে
দর্শন লভিনু ভাগ্যে আছে চিত্তে গাঁথা
তাঁহার অমূল্য স্মৃতি কহি সেই কথা।।

স্বামী নির্মলানন্দ

শ্রীগুরু চরণপদ্ম স্মরণ করিয়া
কাহিনী কিঞ্চিৎ লিখি বিমূঢ় হইয়া
বিঘাটী নামেতে গ্রাম হুগলী জেলায়
বসতি করেন সেথা দত্ত মহাশয়
ভৈরব তাঁহার নাম বড় মান্যমান
তাঁহার ছয়টি পুত্র সবার প্রধান
সব চেয়ে ছোট দেবনাথ মহাশয়
কলিকাতা বাগবাজারে করিলা আশ্রয়
ভারী বুদ্ধিমান তিনি ব্যবসায়ে দড়
কবিরাজী শাস্ত্রেতেও জ্ঞানী ছিলা বড়
কখন কাহার গঙ্গাযাত্রার সময়
নাড়ী ধরি করিতেন সঠিক নির্ণয়
গঙ্গাদত্ত নাম তাই পল্লীর ভিতর
সকলের শ্রদ্ধাপান গুণের সাগর
শ্বশুর ভবন তাঁর বারাণসী ধাম
ছয়পুত্র লভি তিনি মহাভাগ্যবান
কনিষ্ঠ তুলসীদাস স্নেহের সন্তান
তুলসী কৃপায় লভি আনন্দিত মন
আঠার তেষট্টি সাল তেইশ ডিসেম্বর
শুক্লা চতুর্দশী তিথি শুভ জন্ম তাঁর
বাল্যে বড় ক্ষীণ স্বাস্থ্য গেলা কাশীধাম
মাতুল আলয়ে থাকি স্বাস্থ্য ফিরে পান
বাঙ্গালী টোলার স্কুলে সঙ্গী হরিভাই
বিজ্ঞান আনন্দ নামে মঠে তাঁরে পাই
পরে কলিকাতা আসি পাঠে রত হৈলা
পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠ স্থান পদক লভিলা
হেথা বোসপাড়া লেনে সঙ্গী পান আর
সকলের প্রিয় হরি আর গঙ্গাধর
ভক্ত বলরাম বসু তাঁহার ভবনে
আসিলেন রামকৃষ্ণ এক শুভক্ষণে
ঠাকুরের কৃপালাভ ঘুচিল সংসার
বৈরাগ্য আশ্রয় হল জীবনে তাঁহার
যখন শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা সংবরণ
গুরুভ্রাতৃগণসহ করিলা মিলন
কিছু দিন মঠবাসী—তীর্থ ভ্রমণেতে
কালী গঙ্গাধর সনে বাহির পথেতে
বদরী কেদার গঙ্গা গোমুখ দর্শন
পরিব্রাজকের অতি কঠোর জীবন
আলমবাজার মঠে পরেতে ফিরিলা
স্বামীজীর অতিশয় অন্তরঙ্গ হৈলা
শাস্ত্রব্যাখ্যা শিক্ষাদানে নিপুণ শিক্ষক
নির্মলানন্দ নামে হলেন বিখ্যাত
স্বামীজীর দেহ অন্ত বড় দুঃখী মন
অভেদানন্দের সাথে করেন মিলন
আমেরিকা মহাদেশে বেদান্ত প্রচারে
করিলেন তিন বর্ষ যাপন সুদূরে
হিমালয়ে চম্বা রাজ্য ভ্রমণের কালে
রাজা ও অমাত্যবর্গ বহু ভক্ত মিলে
রহিবেন সেথা মন কিন্তু ঠাকুরের
অন্যরূপ বিধানেতে কর্মবন্ধ ফের

মহীশূরে বাঙ্গালোর আশ্রমের দায়
পাইলেন গুরুভ্রাতাগণের কৃপায়
মহারাজ ব্রহ্মানন্দের তিনি কৃপাধন্য
করিলা কঠোর শ্রম আশ্রমের জন্য
দক্ষিণভারতে আরো অনেক আশ্রম
কেরল দেশেতে তিনি করেন স্থাপন
তার মধ্যে ওট্টাপালম তাঁর প্রিয় স্থান
যেখানে অন্তিম বাস করেন গ্রহণ
অনেক সন্ন্যাসী শিষ্য ভক্ত বহুতর
তাঁর কৃপালাভ করি আনন্দ অন্তর
উনিশ আটত্রিশ সাল এপ্রিল ছাব্বিশে
তাঁর মুক্ত আত্মা গেল মহাকাশে মিশে
পূর্বদিন বিজ্ঞান আনন্দ মহাভাগ
প্রয়াগ ধামেতে তনু করেছেন ত্যাগ
ওট্টাপালমে তুলসী মহারাজ মন্দির
স্থাপন করেছেন যত ভক্তবীর
ভগ্যবলে তাঁর কৃপা লভিয়া জীবনে
নির্ভয়ে ভ্রমণ করি সংসার অরণ্যে।।

(১৯৮৪)

স্বামী অদ্বৈতানন্দ

শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ মহাভাগ্যবান
মুরব্বি গোপাল নামে যাঁহার আখ্যান
প্রভুর সন্তানদলে বয়সে প্রবীণ
ব্যবহারে কর্মযোগে সদাই নবীন
জন্ম জগদ্দলে পরে সিতি গ্রামে ঘর
ভক্ত বেণী পালের তিনি বিশ্বস্ত কিঙ্কর
বেণীপাল ব্রাহ্মভক্ত বড় মতিমান
উৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণে করেন সম্মান
গোপালের সংসার গেল অশান্তি অপার
দিনরাতে শান্তি নাই—অকূল পাথার
মহেন্দ্র কবিরাজ নামে ছিল বন্ধুজন
তাঁর সাথে প্রভু পদে হয় আগমন
সেবক লাটুর সনে সখ্য ভাব হল
ক্রমে ঠাকুরের প্রতি বিশ্বাস জন্মিল
ঠাকুরের বড় প্রিয় এ দুই সন্তান
আনন্দ কৌতুক করে সময় কাটান
কাশীপুর উদ্যানেতে যে কান্ড করিল
কার থেকে কি যে হয় কেই বা জানিল
বারখানি বস্ত্রখন্ড গেরুয়া বসন
প্রভুর সম্মুখে গোপাল করেন অর্পন
মহানন্দে প্রভু দিলেন এগার সন্তানে
বাকী এক পাঠালেন গিরীশের স্থানে
শ্রীরামকষ্ণ সংঘ হল সেদিন পত্তন
শ্রীগোপাল ভাগ্যবান সেই সাথে রন
প্রভুর অভাবে দুঃখে বৈরাগী হইয়া
তীর্থে তীর্থে ভ্রমিলেন শান্তির লাগিয়া
অষ্ট বর্ষ পরে আসি আলম বাজারে
মিলিলেন ভাইদের সেবার আগারে
শ্রীঅদ্বৈতানন্দ নাম সন্ন্যাসে হইল
পরে বেলুড়ের মঠে অবস্থান হৈল
সাধুগণ সেবা ও মঠের কাজকর্ম
বুড়োদাদা বুঝিলেন তাঁর শ্রেষ্ঠ ধর্ম
বয়স অনেক হল আশী হল পার
তবুও সরলদেহ আনন্দ অপার
একদিন শেষকাল হল উপস্থিতে
মহাহর্ষে চলিলেন প্রভুরে মিলিতে
বাবুরাম মহারাজ আদি বিদ্যমান
মহাযাত্রাপথে তিনি করিলা প্রয়াণ
ডাক্তার মতিবাবুকে নমস্কার করে
মহানিদ্রাগত তিনি হইলেন পরে
শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত সন্তান মহিমা
কে পারে বর্ণিতে তার নাই কোন সীমা।।

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ

ধন্য শত ধন্য কলিকাতা পুণ্যস্থান
শত মহাত্মাজীর যেথা সদা অধিষ্ঠান
শ্রীপ্রভুর প্রিয় শিষ্য শ্রীম মহাশয়
শ্যামবাজারেতে ছিল তাঁর বিদ্যালয়
সারদাপ্রসন্ন মিত্র ছিলা ছাত্র তাঁর
শান্ত দান্ত ধীর স্থির পরম উদার
পরীক্ষার আগে তার ঘড়ি চুরি যায়
বালক মনেতে এল মহা বিপর্যয়
আশা অনুরূপ ফল করিতে না পারি
পরম বিষাদে তার মন হৈল ভারি
আচার্য বলেন চল শ্রীদক্ষিণেশ্বর
কোথা হতে কি যে ঘটে বুদ্ধি অগোচর
প্রভু রামকৃষ্ণসনে সাক্ষাৎ হইল
জীবনের পথ তার ঠিক হয়ে গেল
পরম বৈরাগে পুরীধাম যাত্রা করি
পথে বনমধ্যে কেবা অন্ন দিল ধরি
ঘরে নিয়ে এল ফিরে আত্মীয়স্বজন
এবারে পরীক্ষা দিয়ে খুসী হল মন
ঠাকুরের সেবাকার্যে আসে কাশীপুরে
পিতার আপত্তি তবু দ্বিধা নাহি করে
বড় ভাই কত চেষ্টা করেন ফিরাতে
বৈরাগ্য অনল জ্বলে সাধকের চিতে
প্রভু করিলেন যবে লীলা সংবরণ
গুরুভাইদের সনে করিল মিলন
স্বামীজী দিলেন নাম ত্রিগুণঅতীত
তীর্থে তীর্থে ভ্রমনেতে কাল হয় গত
বৃন্দাবন মথুরাদি দর্শন করিয়া
আবার হেথায় মঠে এলেন ফিরিয়া
পরবর্ষে চলিলেন মানস কৈলাস
সতত বৈরাগ্যধর্মী পরম উদাস
আলমবাজার মঠে যবে অবস্থান
নূতন পথের এক পেলেন সন্ধান
রামকৃষ্ণ মহাবাণী করিব প্রচার
পত্রিকা প্রকাশ এক সঙ্কল্প তাঁহার
স্বামীজী বলেন এই ঠাকুরের কাজ
কর তুমি মন দিয়া হবে শুভ আজ
কম্বুলিয়া পাড়া রামচন্দ্র মৈত্র লেন
পত্রিকা প্রকাশ হল নাম উদ্বোধন
বিশ্বব্যাপী রামকৃষ্ণ নামের প্রচার
মিশনের মুখপত্র প্রকাশন আর
স্বামীজী বলেন ভাই সারদাপ্রসন্ন
আমেরিকা দেশে তুমি করহ গমন
সহসা জগতে এল আঁধার ছাইয়া
স্বামীজী গেলেন চলি সবারে ছাড়িয়া
ছয়মাস পরে এল সুযোগ আবার
পশ্চিমের পথে তিনি হন অগ্রসর
মার্কিন মুলুকে বড় পশ্চিম অঞ্চল
সানফ্রানসিস্কো নাম বন্দর বিশাল
সেথা হতে আরো দূরে দেবদূতাবাস
নূতন আশ্রম গড়ি করিলা নিবাস
সুন্দর মন্দির লাগি কত পরিশ্রম
দ্বারে দ্বারে ফিরি অর্থ কৈল আয়োজন
উনিশশত ছয় সালে হৈল মন্দির
ধর্মের প্রচার আরো হইল গম্ভীর
মুক্তিবার্তা নামে পত্র করিলা প্রচার
শান্তির আশ্রম আর হইল তথায়
উনিশ পনর সন হইল আগত
বিরাট ধর্মের সভা বহু সমাগত
সহসা দুর্মতি এক নিক্ষেপিল বোম
নিবিল জীবন দীপ ছেয়ে এল তম
জয় রামকষ্ণ নাম করিলা প্রচার
জগতে অতুল কীর্তি রহিল তাঁহার।।

স্বামী অদ্ভুতানন্দ

প্রভুর প্রথম শিষ্য লাটু মহারাজ
প্রথমে আগত তিনি ভক্তের সমাজ
জন্ম তাঁর বিহারের ছাপরা জেলাতে
কলিকাতা আসিলেন খুড়ার সঙ্গেতে
ডাক্তার শ্রীরামদত্ত ভবনেতে ভৃত্য
বড়ই বিনয়ী নম্র ব্যবহারে নিত্য
ভক্ত রামচন্দ্র যবে প্রভু পাশে যান
ফল মিষ্টি লয়ে সঙ্গে শ্রীরাখতুরাম
লাটু নাম দিলা প্রভু সস্নেহ বচনে
সেই নামে পরিচয় সকলেই জানে
অন্তরে জানিলা দোঁহে আপনার জন
লাটু বলে রব আমি তোমার সদন
বলেন শ্রীরামকৃষ্ণ এবে দেশে যাব
ফিরে এসে তোর কিছু ব্যবস্থা করিব
এখানে ঠাকুর নাই তবু আসে যায়
জিজ্ঞাসেন রামচন্দ্র যাসরে কোথায়
লাটু বলে সেথা তাঁর নিত্য অধিষ্ঠান
শুনিয়া বিস্মিত রামচন্দ্র মতিমান
হৃদয় বিদায় হল আপনার দোষে
ঠাকুরের সেবা হেতু লাটু সেথা আসে
প্রভু কন রাম এরে দিয়ে যাও মোরে
ভক্ত রাম প্রভু বাক্য ধরিলেন শিরে
পুত্রসম রহে লাটু প্রভুর সকাশে
অন্তরঙ্গ সেবা করে অশেষ বিশেষে
নরেন্দ্র রাখাল আদি প্রভুর সন্তান
সবাকার অতি প্রিয় লাটু পুণ্যবান
লেখাপড়া শিখাইতে করেন যতন
কিন্তু কোন ফল নাই মন্দ উচ্চারণ
বলেন ঠাকুর ওর লেখাপড়া নাই
কোন ক্ষতি নাই তাহে দেখিবে সবাই
গভীর অধ্যাত্ম বিদ্যা গুরুভগবান
তাঁর কৃপা লভি লাটু সিদ্ধিপ্রাপ্ত হন
জিতনিদ্র মহাযোগী গঙ্গাতীর বাসী
অদ্ভুত আনন্দ নামে হইলা সন্ন্যাসী
শ্রীশ্রীমার সঙ্গে বহু তীর্থ দরশন
তাঁর সেবা করি লাটু পুলকিত মন
স্বামীজী পশ্চিম হতে ফিরিলা যখন
লাটু রহিলেন কিছু সঙ্কুচিত মন
আমি তোর সে লরেন তুই লাটু ভাই
বলি তাঁরে ধরিলেন আনন্দে জড়াই
সর্বধর্ম সমন্বয়ে বিশ্বাসী মহান
অপূর্ব সৎকথা তাঁর শুনে ভাগ্যবান
কাশীধামে পঞ্চবর্ষ যাপন করিয়ে
লভিলেন বিশ্বনাথে অন্তিম সময়ে।।

স্বামী যোগানন্দ

রানী আখ্যা রাসমণি পুণ্যবতী যিনি
গঙ্গাতীরে কালীবাড়ী করিলেন তিনি
দক্ষিনেশ্বর নাম তাহে বিখ্যাত হইল
বার শিবালয় আর কালীঘর ছিল
পূজারী ঠাকুর সেথা গদাধর নামে
মালীর মতন ফুল তোলেন বাগানে
ঐ গ্রাম মধ্যে বাস চৌধুরী নবীন
তাঁহার সন্তান ছিল নামেতে যোগীন
ঠাকুরে বলেন মালী দাও মোরে ফুল
পরে বুঝিলেন তাঁর এই কথা ভুল
যোগীন ঈশ্বর কোটী বড়ই গম্ভীর
সকল কর্মেতে তাঁর মানস সুস্থির
ঠাকুরের কাছে তাঁর আসা যাওয়া ছিল
বিবাহ পরেতে আসা বন্ধ করিল
ঠাকুর আহ্বান করি দেন উপদেশ
সুতীব্র বৈরাগ্য কর একথা বিশেষ
বড়ই সরলবুদ্ধি সবে সমজ্ঞান
আচারে ও ব্যবহারে তাহার প্রমাণ

কড়াই এক কিনে আনে দোকান হইতে
পরে দেখা গেল কিছু খুঁত আছে তাতে
বলেন ঠাকুর ওরে সাধু হতে হবে
তা বলে কি বোকা হবি? লোকে কি না কবে
কাশীপুর বাগানেতে প্রভুর সেবায়
সকলের সাথে যোগীনের কাল যায়
অতঃপর শ্রীশ্রীমার সেবায় জীবন
কাটালেন মহাযোগী দিয়ে প্রাণ মন
স্বপনে ঠাকুর কন শ্রীশ্রীমার কানে
যোগীনে এ মন্ত্র দাও বিহিত বিধানে
মা বলেন কথাবার্তা কখনো বলিনে
তাহলে মধ্যস্থ কর অপর যোগীনে
যোগেন্দ্রমোহিনী মার সহচরী যিনি
তারেই মধ্যস্থ করি মন্ত্র দেন তিনি
স্বামীজীর সঙ্গে কথা কে এই ঠাকুর
সাক্ষাৎ বেদের মূর্তি চিন্তা কর দূর
তাঁর কৃপা হলে এক ধূলি মুষ্টি হতে
লক্ষ বিবেকানন্দ পারেন সৃজিতে
কঠিন পীড়ায় বীর যদিও কাতর
মহাযোগী মায়ামুক্ত তিনি নির্বিকার
তুই থেকে যারে ভাই আমি চলে যাই
বলেন নরেন্দ্র তাঁর প্রিয় গুরুভাই
নৌকাযোগে আনিলেন মঠে কষ্ট করি
কিন্তু কাল সমাগত ভাল নাহি হেরি
বলেন শ্রীশিবানন্দ—ঠাকুরে স্মরণ
খুব ভাল আছি দাদা সতত মনন
একটি খসিল কড়ি খেদ স্বামীজীর
বরগাগুলিও যাবে জেনো সবে স্থির
সেই অপরাহ্নে দেহ রহিত তাঁহার
দিগন্ত ব্যাপিয়া দেশে এল অন্ধকার।।

স্বামী নিরঞ্জনানন্দ

প্রভুর ভকতবৃন্দ ত্রিবিধ প্রকার
সাধনসিদ্ধ কৃপাসিদ্ধ নিত্যসিদ্ধ আর
যাঁহারা ঈশ্বরকোটী নিত্যসিদ্ধ যাঁরা
স্বভাবতঃ ভক্তিমান জন্ম হতে তাঁরা
সেইমত নিরঞ্জন মহারাজ হন
তাঁর কথা দীনভাবে করি নিবেদন
রাজারহাট বিষ্ণুপুর সুপ্রসিদ্ধ স্থান
কলিকাতা থেকে পূর্বদিকে অবস্থান
কালিদাস মিত্র বাস করেন সেথায়
সম্পর্কে পিতৃব্য স্নেহ করে অতিশয়
যত্ন করে লেখাপড়া তিনি করালেন
উত্তম কর্মেতে তাঁকে নিয়োগ করেন
ঠাকুরের কাছে তাঁর ছিল যাওয়া আসা
কিন্তু ধর্ম ধারণায় ছিল ভাসাভাসা
ভূত বিদ্যা চর্চা করে কোন কোন জন
সেদিকে তাঁদের কিছু ফিরে গেল মন
একদিন অন্তর্যামী কন কথা ছলে
ভূত নিলে ভূত হবি ভবিষ্যৎ কালে
নিরঞ্জন শুদ্ধ জ্ঞান লভেন তখন
একান্তে প্রভুর পদে নিলেন শরণ
মায়ের সেবার জন্য চাকুরী স্বীকারে
দোষ নাই কোন প্রভু বলেন তাহারে
মহাবীর নিরঞ্জন একনিষ্ঠ ভক্ত
প্রভুনিন্দা শুনিবারে সদাই বিরক্ত
একদিন নৌকাযাত্রী সঙ্গী কয়জন
শ্রীপ্রভুরে নিন্দা করি করে আলোচন
নিষেধ মানেনা তারা কটু কথা কয়
নৌকা ডুবাইয়া দিব দেখালেন ভয়
শুনিয়া এ সব কথা ঠাকুর তখন
নিরঞ্জনে করিলেন বিশেষ ভর্ৎসন
ক্রোধ রিপু ভাল নয় দমন করিবে
নচেৎ নিরীহ লোকে পীড়ন হইবে
কাশীপুরে যবে প্রভু শায়িত পীড়ায়
দ্বারবান নিরঞ্জন সদা দ্বারে রয়
কোন দর্শনার্থী নারে ভিতরে যাইতে
পীড়িত আছেন প্রভু চিন্তা সদা চিতে

স্ত্রীলোক ভক্তেরা নাহি যেতে পারে কাছে
বিশেষতঃ নিরঞ্জন পাহারা রয়েছে
পীড়িত প্রভুরে যবে দেখিবারে চায়
বিনোদিনী দাসী কোন না পায় উপায়
সাজিল সাহেব মূর্তি গেল কাশীপুরে
নিরঞ্জন খাড়া আছে ফটকের ধারে
চিনিতে না পারে যেতে দিল অনুমতি
প্রভুরে দর্শন কৈল অতি ভক্তিমতী
প্রভু বড় আনন্দিত দেখি বেশ তার
আশীর্বাদ করিলেন হাসি বার বার
ভকত সুরেন্দ্রে যবে করে নিবারণ
লাটু মহারাজ নিরঞ্জনে বলেন বচন
কেমন পাহারাদার না পার চিনিতে
বিনোদিনী এল গেল সাহেব বেশেতে
লজ্জিত শ্রী নিরঞ্জন সবাকার আগে
ঠাকুর আনন্দ পান ভেবে হর্ষ লাগে
কি কব মহিমা তাঁর নাহি যে তুলনা
নিত্যসিদ্ধ মহাযোগী এমন দেখিনা
শ্রীশ্রীমার আদরের ভকত সন্তান
মাতৃভক্ত মহাবীর তাঁর হস্তে খান
প্রিয় ভাই শ্রীতুলসী কেরল দেশেতে
আশ্রম স্থাপন কৈলা তাঁহার স্মৃতিতে
অকালে চল্লিশ বর্ষে প্রস্থান তাঁহার
ধরনী মলিনা হল নামে অন্ধকার।।

(১৯৮৭)

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

পথিক ভ্রমণ বহু করেছ সংসারে
দেখেছ কি হেন রত্ন ভুবন মাঝারে
শ্রীপ্রভু বলেন আমি রহিব সেথায়
নরেন আমারে স্কন্ধে যেথা লয়ে যায়
বেলুড়ে তাঁহারে রাখি নরেন্দ্র চলিলা
পশ্চাতে ভকতগণ মন্দির নির্মিলা
যাঁর মহাপ্রতিভার এই নিদর্শন
তিনিই বিজ্ঞানানন্দ শ্রীহরিপ্রসন্ন
বেলঘরিয়ায় পান প্রথম দর্শন
সেই হতে রামকৃষ্ণে তীব্র আকর্ষণ
মনে হয়েছিল এই সাধক কেমন
শ্বেতবস্ত্র পরিধান নির্মল নয়ন
চুম্বক লোহারে চিনে করে আকর্ষণ
যেমন দয়ালপ্রভু ভকত তেমন
শ্রীশরৎ মহারাজ সনে পরিচয়
প্রভুর সকাশে যাঁর গতিবিধি হয়
মহারাজ ব্রহ্মানন্দ সনে পরে স্থিতি
গম্ভীর প্রসন্ন আত্মা যোগীর প্রকৃতি
যন্ত্রবিদ্যা বিশারদ বড় বাস্তুকার
বেলুড়ের শ্রীমন্দির প্রমাণ তাহার
রাখিব প্রভুরে তাঁর উপযুক্ত স্থানে
স্বামীজীর কথা পূর্ণ হল এতদিনে
যদিও হয়েছে আজ বহুদিন গত
এ দীন গোড়ার কথা কিছু অবগত
মন্দিরের ভিত্তি হল গোলাপবাগানে
মহাপুরুষের হস্তে এক শুভদিনে
উপস্থিত ছিলা বহু সাধু ও সজ্জন
কেমন মন্দির হবে তার আন্দোলন
মার্কিন মহিলা ভক্ত ছিল দুইজন
বহু অর্থ এই কর্মে দিলা আয়োজন
ধৈর্য পরিশ্রম সহ চারিবর্ষকাল
মঠের মন্দির হল বিরাট বিশাল
বিজ্ঞান আনন্দ নাম হইল বিখ্যাত
মন্দিরে প্রভুর মূর্তি আজ বিরাজিত
কর্মবীর মহাভাগ তুল্য নিন্দামান
প্রয়াগেতে করিলেন আশ্রম স্থাপন
উনিশ আটত্রিশ সাল জানুয়ারী মাসে
মন্দিরের দ্বারমুক্ত হল অবশেষে
সেই উপলক্ষে হল মহাধূমধাম
বিশ্বে বিঘোষিত হল রামকৃষ্ণ নাম

লীলা সংবরণ হেতু ছিল বুঝি মন
আবার প্রয়াগধামে করেন গমন
গঙ্গা যমুনার যেই পবিত্র সঙ্গম
সেথায় রহিব তাঁর ছিল সদা মন
উনিশ আটত্রিশ সাল পঁচিশ এপ্রিল
সলিল সমাধি তাঁর অনুষ্ঠিত হল
বাল্যে কাশীধামে সঙ্গী ছিলেন তুলসী
তারবার্তা পাইলেন কেরালাতে বসি
আশ্চর্য প্রভুর লীলা তিনি পরদিন
দেহত্যাগ করি ব্রহ্মে হলেন বিলীন
অধম সন্তান তাঁর আজি এত কালে
দোঁহার তর্পন করে নয়নের জলে।।

(১৯৮৭)

শ্রীম—[মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত]

কলিকাতা নগরীর সিমলা পল্লীতে
১২৬৬ সালে আষাঢ় শেষেতে
প্রসিদ্ধ গুপ্তের বংশে তাঁর জন্ম হয়
শ্রীম নামে গুপ্তভাবে তাঁর পরিচয়
পিতা মধুসুদন মাতা স্বর্ণময়ী
তাঁদের তৃতীয়পুত্র মাষ্টারমশাই
অতি সুলক্ষণ শিশু যোগীর লক্ষণ
বিদ্যাভ্যাসে মহাযোগী বৃত্তিপ্রাপ্ত হন
দেবদেবী পদে ভক্তি বাল্যকাল হতে
মহাপ্রসাদ ভিক্ষা হাওড়া রেলেতে
বড় বড় স্কুলে হন প্রধান শিক্ষক
কর্মজীবনেতে নাম মহেন্দ্র সার্থক
ভক্তিমতী পত্নীলাভ সৌভাগ্যের বলে
নামটি নিকুঞ্জবালা জন্ম সেন কুলে
বরাহনগর থেকে ভ্রমিতে ভ্রমিতে
উপস্থিত পঞ্চবটী দক্ষিণেশ্বরেতে
শুনেছেন বড় সাধু আছেন সেখানে
দর্শন আশায় আশা তাঁর সন্নিধানে
একঘর ভর্তিলোক নীরবে বসিয়া
শুনিছেন তাঁর কথা সবে মন দিয়া
যেন ব্যাস পুত্র শুকদেব মহাশয়
শাস্ত্রব্যাখ্যা করিছেন মুনির সভায়
ঠাকুর পরমহংস পরিচয় চান
সসঙ্কোচে সব কথা তাঁহারে জানান
ক্রমে তাঁর কৃপা লভি অজ্ঞান আঁধার
দূর হয়ে হৃদে এল আনন্দ অপার
স্পর্শমণি ছোঁয়া লেগে লোহা হয় সোনা
মহাশক্তিধর তিনি কত জানা শোনা
ঠাকুরের কথামৃত রচনায় মন
করিলেন একরূপ অসাধ্য সাধন
ছয়বর্ষে যেই দিন যাহা ঘটেছিল
রামকৃষ্ণ কথা বিশ্বে প্রচারিত হল
শ্রীশ্রীমার পাদপদ্ম সেবায় মগন
তাঁর সনে তীর্থ যাত্রা বহু পর্যটন
বলেন শ্রীশ্রীমা তাঁরে তোমার নিকটে
ঠাকুর আপনকথা রেখেছেন বটে
বিংশ বর্ষাধিক নিজ আশ্রমে যাপন
পঞ্চভাগে কথামৃত হল সমাপন
দীনের সৌভাগ্য তাঁর চরণদর্শণ
আশীর্বাদ লভি ধন্য এই অকিঞ্চন
১৩৩৯ জ্যৈষ্ঠ ঠাকুর বাড়ীতে
ত্যজিলেন কলেবর সজ্ঞানে নিভৃতে
শ্রীপ্রভুর শেষকৃত্য হয় যেই স্থানে
লভিলেন শেষ স্থান একই শ্মশানে।।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ স্তোত্র

দীপ্তমহিমোপেতমশেষ গুণযুতমভীষ্টদং প্রিয়মীশম্
বন্দে করুণাকরমভয়দাতারং তং দেবং রামকৃষ্ণম্
কলিকলুষভয়-ভঞ্জনং ভক্তজন মনোরঞ্জনং
সংসার-দাবদহন-পীড়িতং শান্তিভেষজদায়কম্
নমামি তং রামকৃষ্ণং দেবদেবং রামকৃষ্ণং
দয়ানিধিং রামকৃষ্ণং কৃপাম্বুধিং রামকৃষ্ণং [ধ্রু]
সরল দেব বালকং আশ্রিত জন পালকং
ভুক্তি মুক্তিদায়কং কৃপয়া কলৌ অবতীর্ণং
যাচে তব পদে শরণং কুরু কৃপামামরণং
কালভয়াতিভীতং দেহি পদাম্বুজমুদারম্।।

(বেলুড়মঠ : ১৯২৮)

শ্রীমদ্ বিবেকানন্দ স্তোত্রানি

জাহ্নবী তটস্থে শ্রীমন্দিরমধ্যে বিরাজিতং সেবা ধর্মস্য রূপং
শ্রীরামকৃষ্ণ দাসসাগ্রগণ্যং বীরেশ্বরং দেবং শরণং প্রপদ্যে।।
স্বার্থান্ধভাব সমাকুল বিশ্বে আবির্ভূতং সেবাধর্ম স্বরূপং
কলৌ কৃপয়া শ্রীশঙ্করাবতারং বীরেশ্বরং দেবং শরণং প্রপদ্যে।।
ভোগ বিলাস প্রমত্ত চিত্তৈঃ বিঘ্নীকৃতা যদা বিশ্বস্য শান্তিং
দদৌ সর্ব্বান্ সেবাধর্মস্য চামৃতং বীরেশ্বরং তং শরণং প্রপদ্যে।।
সুদুরং নীত্বা বিবেকস্যবার্তা বিবেকানন্দ ইতি খ্যাত বিশ্বে
জ্ঞানে প্রেমে কর্মে তুল্যাধিকারীং বীরেশ্বরং শরণং প্রপদ্যে।।

(বেলুড় মঠ : ১৯২৯)

শ্রীশ্রীমাতৃস্তোত্রানি

যা দেবী করুণাবিষ্টা অবতীর্ণা কলৌ যুগে
সমুদ্ধর্ত্তুং মূঢ়াতাঞ্চ শান্তিং দাতুং ভয়াতুরান্
যা মাতা সংসারে ঘোরে দীপরশ্মি সমপ্রভা
তামহং বন্দেহহর্নিশং মনসি সুপ্রতিষ্ঠাতাম্।।
অলক্তরাগরঞ্জিতৌ যস্যা শ্রীচরণ যুগৌ
সুধারস্যনিস্যন্দিনৌ যস্যা নয়ন কমলে
অযুতৈঃ নতমস্তকৈঃ সুভক্তৈঃ সেবিতা চ যা
সন্তানেষু দুঃখভাক্ষু সা দেবী বরদাভবেৎ।।

যা দেবী সোপচারেণ রামকৃষ্ণেণ পূজিতা
ভগবদ্ভিরপি বন্দ্যাং তাং নমামি চরণাম্বুজে
দুস্যহস্তে পতিতাহপি মূঢ়তাং যা নাভিগতা
পিতৃসম্বোধনোস্য সুবুদ্ধিমজাগন্তদা।।
পশ্চাতেন সং সেবিতা স্বপত্ন্যা ভোজ্যাদিসহ
সাশ্রুনেত্রং পথিমধ্যে যা দেবী বিদায়ীকৃতা

সেবকান্ বহুসংখ্যনকান দারাসুত পরিবৃতান
আকৃষ্য সংসার কারাৎ দদৌ মুক্তি সুভাবিনী।।
সা মাতা সংসার বিষ জর্জরেহস্মাকম্ বেশ্মনি
সুখ শান্তি দাত্রী ভূত্বা কুর্যাচ্চবস্থানং চিরং।।
সংসার ঘোর অটব্যাং শোনিতাস্বাদ লোলুপঃ
ক্রীড়তি যথেচ্ছং তাবৎ ভীষণঃ কামশার্দুলঃ
অসীম দুঃখদায়কঃ ভবিষ্য সুখ হারকঃ
কমহং যামি শরণং তব পদাম্বুজং বিনা।।
বিশেষণ সমাহারৌ যস্যা গুণানুকীর্তনং
কর্ত্তুমসক্তোহহং সদা নমামি চরণাম্বুজে।।

(বেলুড় মঠ-১৯৩০)

বিশালাক্ষী বন্দনা

শার্দুল বাহনাং দেবীং নানালঙ্কার ভূষিতাং
নক্র বরাহ সেবিতাং মৃগক্রীড়া বিমোদিতাং
রম্য শ্রীসুন্দরবনে অধিষ্ঠাত্রীং বরপ্রদাং
নমামি তাং বিশালাক্ষীং ভক্তজন চিরপ্রিয়াম্।।

তাম্রলিপ্ত বন্দনা

ধন্য পুণ্যস্থান তমলুক নাম
বিখ্যাত জগতে এই সহর সুন্দর
রূপনারায়ণ তীরে সবাকার মন হরে
ইতিহাসে সুপ্রাচীন সমুদ্র বন্দর।
বিভাসক তীর্থক্ষেত্র বড় পীঠস্থান
মাতা বর্গভীমা যাঁরে করেন রক্ষণ
তমলুক তমোহর আলোর বর্ষণ
এলেন এ বেলাকূলে বিদেশী সজ্জন।।

ধনী শ্রেষ্ঠী মহাজন ডিঙ্গা চলে তাঁর
দিকে দিকে বাংলার বাণিজ্য বিস্তার
সহসা কি হল পরে না পাই সন্ধান
ঢেকে গেল মঠ স্তূপ প্রাসাদ উদ্যান
আবার মানুষ জাগে মায়ের কৃপায়
ইতিহাস কথা বলে মধুর ভাষায়
বিদ্যার সাগর বীর মেদিনী গৌরব
এলেন বঙ্কিম নিয়ে সাহিত্য সৌরভ
আমাদের ক্ষুদিরাম কত খেলা খেলে
যাদুগোপালের যাদু রক্ষিত মহলে
শিরে ধরি শত বিপ্লবীর পদধূলি
আশীর্বাদ ভিক্ষা করি ছোট ভাই বলি।

(১৬ ফেব্রুয়ারি ৯১ সালে তাম্রলিপ্ত উদ্যান উৎসবে পঠিত)

উদ্বোধন সঙ্গীত

[মল্লার ঠুংরি]

দীপ জ্বালো দীপ জ্বালো দীপ জ্বালো
গুরু জ্বালো দেব জ্বালো প্রভু জ্বালো
আঁধার নিশি না হয় প্রভাত
মায়া মোহ আসি ঘটায় উৎপাত
যেদিকে তাকাই কোনো সাড়া নাই
নাহি হেরি কিছু ভালো
জীবনে নাহি সুখ মরণেও সুখ নাই
দুর্বহ ধরা ভার বহি মোরা আজ তাই
কোথায় দয়াল দেব দয়া করে মুছে দাও
মোদের নয়ন হতে কালো।।

(৩১ ডিসেম্বর ৩১-দক্ষিণ কাশিম নগর মধ্য হাই বিদ্যালয় উদ্বোধন সঙ্গীত)

রথযাত্রা সঙ্গীত

ধন্য পুণ্যস্থান হাজরা পুকুর নাম বহু দেবদেবীর শুভ অধিষ্ঠান
মধু চৈত্রমাসে শ্রীরাম নবমী দিবসে রথযাত্রা মেলার হয় অনুষ্ঠান।
আছেন মা শীতলা গ্রাম হিত লাগি বাশুলি দেবীর মন্দির আদি
সদাশিব সত্যপীর ওলাবিবি ভক্তজন প্রিয় চির শোভমান।

শ্রীরাধা গোবিন্দ বৈষ্ণবের ঠাকুর
সেবা অভিলাষে হয়ে অনুরাগী
রথের শোভা অতি মনোমুগ্ধকারী
চারুশিল্প তত না হলেও বেশী
নরনারী কত আসে সারি সারি
ক্ষুদ্র মেলাখানি কলরবে ভরি
ছাত্রছাত্রীবৃন্দ শতাধিক সংখ্যে
বাদ্য কীর্তনেতে হরিধ্বনি মুখে
পণ্যবীথি শোভে যেমন চমৎকার
ধন্য শত ধন্য স্রষ্টা এ মেলার
কবি ধীরে কয় করিয়া বিনয়
কীর্ত্তিমান যাঁরা উন্নত হৃদয়

উজল করিলেন ভক্ত ভুবনপুর
দারুময় রথ করিলেন নির্মাণ।
যাহাতে আরোহণ করেন শ্রীহরি
ধ্বজ পতাকায় অতি শোভমান।
ভাবুকের চিত্ত দোলা দেয় তারি
বাপীতট হর্ষে হয় কম্পমান।
শ্রীরথ বেষ্টনে চালায় নিঃশঙ্কে
শত শত ভক্ত চলে অবিরাম
শিশু মনোলোভা তুল্য নাই তার
জগদীশ স্বর্গে তাঁরে দিন স্থান।
যতই যা কর কালে করে লয়
চিরদিন তাঁদের গাহি গুণগান।।

(মে-১৯৪৫)

সুস্বাগতম্ নেলসন ম্যাণ্ডেলা

কোন্ সে সুদূর দেশ আফ্রিকা দক্ষিণ
মানুষের অধিকার হল সেথা ক্ষীণ
শাদা ও কালোর মাঝে বিভেদ সেথায়
বিধাতার বিধানের ভুল ব্যাখ্যা হয়
নিজ প্রাণপাত করে জন্মালে প্রত্যয়
শাদা কালো ভেদাভেদ বিধাতার নয়
দুর্দম শ্বেতাঙ্গগণ না করে বিশ্বাস
কৃষ্ণাঙ্গ মানবগণ ফেলে দীর্ঘশ্বাস
তুমি এলে তার মাঝে সাম্যধ্বজা ধরি
মানুষের মান তরে প্রাণপণ করি
বন্দী হলে কারাগারে সুদীর্ঘ জীবন
সহিলে লাঞ্ছনা কত অকথ্য কথন
কারা অন্তরালে গেল তিরিশ বছর
তোমার সংগ্রাম কিন্তু তবু অগ্রসর
যেমন দেবতা সম জীবন তোমার
পেয়েছ সঙ্গিনী এক সর্বগুণাধার
কত সঙ্গী পড়ে গেল পথের মাঝারে
অটল অচল তুমি সমুন্নত শিরে

'ধন্য তারা ধরাধামে আমার কারণ
লাঞ্ছনা গঞ্জনা যাঁরা করেন বরণ।'
প্রভু যীশু বাক্য সার দেখালে জীবনে
সারা বিশ্ব পরিতৃপ্ত তব বাণী শুনে
আঁধার খনির মাঝে মণি মিলে যায়
তুমি সেই মণি সম সুদীপ্ত প্রভায়
ভারতভূমিতে শুভাগমন তোমার
মানবের মহামিত্র—লহ নমস্কার।।

মানুষের গান

গাহি মানুষের গান।
সবার উপরে মানুষ সত্য
তারাই ত মতিমান্।
আছেন ঠাকুর আছেন মন্ত্র,
আরো কত আছে যন্ত্র তন্ত্র,
সবার উপরে রয়েছে মানুষ
তারাই যে ইনসান্।
তারা পশু নয়, পশুরাজ সম
দেখেছি তাদের মহা বিক্রম—
জীবের দুঃখ বেদনা নাশিতে
তারা সদা আগুয়ান।
নর কিংবা নারী, বালক, বৃদ্ধ
মহৎ হৃদয় সবে সমৃদ্ধ
কে কোথায় কাঁদে তারে প্রবোধিতে
আঁধারে, প্রান্তরে, সাগরে, মরুতে
তারাই ত ধাবমান।
গাহি তাহাদের গান।
তাহাদের জয় হবে নিশ্চয়
তাহারা যে মহাপ্রাণ
গাহি শতবার, সহস্রবার
তাহাদেরই জয় গান।।

শহীদের গান

আমি গাহি তাহাদের গান—
জীবন মূল্যে রেখে গেল যারা
দেশ জননীর মান।
আমি গাহি শহীদের গান।
তাম্রলিপ্তে মহিষাদলে
বাহিরিয়া তারা এল দলে দলে।
মুক্তি যজ্ঞে প্রাণ বলি দিয়ে
তারা মহা মহীয়ান।
কে কাঁদিছে পিছে, কেবা মোছে চোখ,
সরে যাও, সরে যাও—
হয় স্বাধীনতা, না হয় মৃত্যু
কালের বিধান নাও।
ত্রিদিব হইতে তাঁদের আশিস্
আসিছে নামিয়া দীপ্যমান্।
গাহি প্রাণ ভরে উচ্চ কণ্ঠে
তাঁহাদের যশোগান।
আমি গাহি শহীদের গান।।

আমাদের ছেলে

এরা মোদের মেদিনীপুরের ছেলে
এরা মোদের মহিষাদলের ছেলে—
দেশের কাজে, দশের সেবায়
সবার আগে চলে—
এরা মোদের বীর বাহাদুর ছেলে
এদের হুঙ্কারেতে দুশ্‌মন কাঁপে
তারা পালায় মুলুক ছেড়ে
এ আজাদি হাসিল করে বুক ফুলিয়ে চলে
এরা মেদিনীপুরের ছেলে।
সবাই ঘুমায় রাতের ঘোরে
এরা লাঠি হাতে পাহারা করে
চোর ডাকাতে তফাৎ ভাগে
এদের সাড়া মাত্র পেলে—
এরা মহিষাদলের ছেলে।

বীর শহীদে নোয়ায় মাথা
শোনে তাদের কীর্ত্তিগাথা
সবার প্রিয় সবার সেরা
যেন হীরা মানিক জ্বলে—
মায়ের নামে জয়ধ্বনি দিয়ে সবাই চলে
কেননা এরা মহিষাদলের ছেলে॥

আমাদের জীবনে রবীন্দ্রনাথ

এল এল পঁচিশে বৈশাখ,
চারিদিকে বেজে ওঠে শত শত শাঁখ।
প্রভাতের পাখী গায় জাগরণী গান।
নব রবি-কর আসে ছড়াইয়া প্রাণ।।
আমরা যেদিন থেকে নয়ন মেলেছি,
টাপুর টুপুর বৃষ্টি পড়ে তখন শুনেছি।
ভাঙিল পাষাণ কারা রবীন্দ্র নির্ঝর,
যত বড় হই শুনি তার মধুস্বর।
সংগ্রাম অঙ্গণে যবে আসিলাম সাজি,
তাঁর বাণী শত তূর্য নাদে উঠে বাজি।।
পথে পড়ে গেল কেহ, কেহ বা পিছায়,
একলা চলার ডাকে আবার আগায়।
ঝড়ের খেয়ায় উঠে জমালাম পাড়ি—
অপার সাগর বুকে গৃহকোণ ছাড়ি।
জনগণমন স্রোতে এসে মিশিলাম।
তাই তাঁর পদে রাখি মোদের প্রণাম।।

দিন রাতের বাসনা

মায়ের দেশেতে যাব, মায়ের দীঘিতে নাবো
সাধুভক্ত জনের সাথে মায়ের প্রসাদ পাবো
মায়ের দেশেতে যাবো।।

জয়রামবাটী কামারপুকুর দর্শন করিব
শিওড় দেরে কোয়ালপাড়া ভ্রমণ করিব
মায়ের দেশেতে যাবো।।

জয়রামবাটীর পথের ধূলা অঙ্গে মাখিব
সাধুভক্ত পদধূলি শিরে ধরিব
আমোদরের ঘাটে ঘাটে ভ্রমণ করিব
সিংহবাহিনী মন্দিরেতে পূজা দেখিব
রক্ষাকালী মায়ের থানে মাথা লোটাব
মায়ের দেশেতে যাবো।।

পুণ্যিপুকুর আমোদর ঘাট দর্শন করিব
অমরপুর হরিশোভা গ্রামেতে যাব
আনুড়েতে বিশালাক্ষী দর্শন করিব
মানিকরাজার বাগান দীঘি দর্শন করিব

মায়ের ও ঠাকুরের দেশেতে যাবো
জয় জয় রামকৃষ্ণ বলে নৃত্য করিব
মায়ের নামে জয়ধ্বনি হুঙ্কারি দিব
মায়ের দেশেতে যাবো।।

(১৯৭৬)

রমণীমোহনের চিঠিপত্র

রমণীমোহন তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে শতশত পত্র লিখেছেন।

সংবাদপত্র-বেতার মাধ্যম থেকে শুরু করে সাহিত্যিক, অধ্যাপক প্রভৃতি সমাজের বিভিন্নস্তরের বিভিন্ন ধরনের মানুষের কাছে চিঠি লিখেছেন তিনি। চিঠি লিখেছেন মাননীয় মন্ত্রী, রাজ্যপাল, প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতিকে-ও বিচিত্রতর বিষয়ে গভীর মানসিক সচেতনতা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে।

অতি দরিদ্র নিখোঁজ দুটি মুসলমান বালিকার সন্ধান সংবাদ জানার জন্য নানা জায়গায় ব্যর্থ হয়ে রমণীমোহন শেষপর্যন্ত ভারতের রাষ্ট্রপতিকেও পত্র দিয়েছেন। মাননীয় রাষ্ট্রপতি মহোদয়ের পক্ষ থেকে তাঁর চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করে দিল্লী পুলিশকে যথাযথ নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। আবার এক স্মৃতিভ্রষ্টা মা যাতে তাঁর বাড়ীতে ফিরে যেতে পারেন সেজন্যে সর্বোচ্চ প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে তিনি দীর্ঘ চিঠি লিখেছেন এবং অবশেষে সেই সন্তানহারা মা তাঁর বাড়ীতে ফিরে যেতে-ও সমর্থ হয়েছেন।

আবার জাতীয় সংহতির বিকাশে, গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে এরকম নিজের অনুবাদ পুস্তক প্রকাশের জন্য তিনি মাননীয় রাজ্যপাল, জাতীয় শিক্ষা-গবেষণা প্রশিক্ষণ পরিষদের কাছে প্রার্থনাও জানিয়েছেন তাঁর চিঠিতে। কখনওবা বেতারে সাঁওতালি ভাষা শিক্ষা কিরূপে পরিচালিত হওয়া উচিত সে প্রসঙ্গে বিস্তারিত লিখেছেন বেতার কর্তৃপক্ষকে।

স্থানাভাবে এখানে সামান্য কয়েকটি মাত্র চিঠি মুদ্রিত হল। সময়ে সতর্ক না হওয়ায় রমণীমোহনের প্রাপ্ত চিঠির অধিকাংশই রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। তাঁর গুরুদেবের চিঠিগুলির ঐতিহাসিক মূল্য থাকায় সেগুলির কয়েকটি মুদ্রিত হল।

চিঠিপত্র

□ প্রখ্যাত সাংবাদিক-সাহিত্যিক রূপদর্শী গৌরকিশোর ঘোষকে লিখিত :

প্রিয় ভাই,

এই পত্র লেখার জন্য কিছু মনে কোরো না। আমি জীবনে অনেক রকম পেশা নিয়েছি বটে [তবে] মূলত আমি সাংবাদিক, তোমার জাতভাই। যখন ফিলিপাইন থেকে পুরস্কার পেয়েছ তখন থেকে তোমার কথা জানা। যখন ১৯৭৫ সালে কিছু নির্যাতিত হয়েছ তাও আমি লক্ষ্য করেছি, তবে আমি এত ছোট যে কখনও সামনে আসতে পারিনি। এখন ৯০ বছরে এসে পড়েছি সুতরাং ভীমরথী ধরেছে মনে করতেও পার।

তাহলে ও আশা করব যে জন্য এই লেখা তার দিকে নিশ্চয় মন দিবে।

আজকাল তোমরা যে সব মূল্যবান কথা লিখে থাক তার ভাষা বড় কঠিন হয়—অনেকে কতকগুলি শক্ত বাংলা কথা ব্যবহার করেন—যাতে সাধারণ লোকে বুঝতে পারবে না। লেখা যেন সবাই বুঝতে পারে তার যথাসাধ্য চেষ্টা করবে আশা করি।

২৬শে জানুয়ারি কাগজে যে দিক দিয়ে লিখেছ তা চমৎকার হয়েছে। বিশ্ব পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে তোমার জুড়ি নাই। ঐ কাগজেই কেবল বর্মা এক প্রবন্ধ ফেঁদেছেন সেখানে-ও সমাজতন্ত্রের বেশ আলোচনা আছে। চিদানন্দবাবুর সরস রচনায় সিনেমার সরসতাও আছে। এখন আমি কি বলছি তা একটু শোনো।

বর্তমান খণ্ডিত ভারত নিয়ে মনের ব্যথা মনেই চাপা আছে—বৃথা আক্ষেপ করে লাভ নাই। স্বাধীনতার যে সংজ্ঞা মানবেন্দ্র রায় দিয়েছেন তা মাথার পিছন ঘুরে নাক দেখানোর মত। আমি বলি কী অত হাঙ্গামার দরকার নাই। সরল জিনিসকে সরলভাবেই নিলে দোষ কি? আমরা সকলেই শ্রমজীবী মানুষ তা বড়লাট বা জেলাশাসক যা হই না কেন। নিজের শ্রমের ফলে উৎপন্ন ফসল বা পয়সা যেন ভোগ করতে পাই এই স্বাধীনতা চাই। মাঝখানে চালাক লোকেরা ভাগ বসিয়ে না নিতে পারে।

শোষণের শতরূপ যে সমাজে চলে তাকে স্বাধীন বলতে পারি না। যে জ্ঞান দিলে মানুষ এই বিষয়টা বুঝতে পেরে সাবধান হতে পারবে আমি বলি সেই রকম শিক্ষাই স্বাধীন মানুষ সৃষ্টি করবে। মানুষ জন্ম থেকেই পরনির্ভর, অন্য পাঁচজনের দয়ায় সে বেঁচে থাকে। সুতরাং তাদের জন্য তাকে কিছু করতেও হবে। এইটাই স্বাধীনতার পথ।

আমরা তিনরকম স্বাধীন লোক দেখেছি—আমি তাদের তিন ক্লাস বলি। যে প্রথম সে স্বার্থ ত্যাগ করেও অন্যদের উপকার করে। যে দ্বিতীয় সে নিজের স্বার্থ-ও দেখে অপরের হিত-ও বিবেচনা করে। আর তৃতীয় বা অধমেরাই দেশে বেশী তারা কেবল নিজের সুবিধা দেখে অন্য লোকদের ভালমন্দ কিছুই বুঝতে চায় না। সুতরাং স্বাধীন সরকার হলেই লোক স্বাধীনতা পায় না। আদর্শ সমাজতন্ত্র, কেমন হবে তা তোমাদের মত লোকে নিশ্চয় চিন্তা করে ঠিক রেখেছ। বেশী বলার কোন দরকার নাই।

কেন লিখছি তার মূলে একটু আনন্দ আছে, সাংবাদিকমহল দেশকে চালায়, আমি তাদের মধ্যে একজন এই পরিচয় দিয়ে শুভেচ্ছা জানাতে চাই। আবার বলি কিছু মনে কোরো না। ইতি ১/২/৯০

□ বিখ্যাত লেখক সমরেশ বসুকে লিখিত :

প্রিয় ভাই,

সম্বোধনের জন্য রাগ কোরো না। আমার থেকে তোমরা বয়সে নিশ্চয় ছোট; আর আমি যতটা জেনেছি তুমি আমাদের প্রহ্লাদ প্রামানিক ভাই-এর অনেক দিনের জানা শোনা লোক। তুমি একজন সংগ্রামী লোক, অনেক বাধা বিপত্তির মধ্যে তোমার জীবন চলেছে।

এই চিঠির উদ্দেশ্য খুব স্পষ্ট—'দেশ' পত্রিকায় শিল্পী রামকিঙ্কর বেজ মহাশয়ের বিচিত্র জীবন নিয়ে যে একটা লেখা লিখছ তা তোমাকে নূতন যশ প্রদান করবে। এরকম লেখক বাংলায় খুব কম আছে মনে হয়। এ একটা নূতন লাইন—একটা প্রতিভার সফল মূল্যায়ন। অথচ কি সুন্দর তোমার প্রকাশভঙ্গী ও বাঁকুড়ার ভাষার বৈচিত্র। আমার নিজের জীবন আরম্ভ হয়েছে ১৯০১ সালের প্রথমে—এখনও তোমাদের লেখা পড়ি— তোমার সমান নাম সমরেশ মজুমদারের লেখা পড়েও খুব আনন্দ পাই।

বিরাট অখণ্ড বাংলা দেশের প্রায় সমস্ত জেলার ছেলে আমার ছাত্ররূপে পেয়েছি, তার মধ্যে বাঁকুড়ার স্থান সবার আগে। লোকদের বলে থাকি আমার সব জায়গার ছেলেদের মধ্যে বাঁকুড়ার ছেলেরা বেশী প্রিয় ছিল। প্রথম জীবনে কলেজ ছেড়ে অসহযোগ আন্দোলনের ঠেলায় বাঁকুড়ায় গিয়ে পড়ি—জাতীয় বিদ্যালয়ে এক বছরের বেশী থাকি—তোমার লেখা পড়ে যে আনন্দ পেয়েছি —মনে হচ্ছে যেন আমার সে সব দিন ফিরে আসছে।...গঙ্গাজল ঘাটিতে গোবিন্দবাবু ও শিশুরাম মণ্ডল জাতীয় বিদ্যালয় করেছিলেন সেখানেও আমি গিয়েছি। কাজীদাদা নজরুল সেই অমরকানন নিয়ে কবিতা করেছেন। আমি অনিল্ বাবুর [অনিলবরণ রায়-শ্রীঅরবিন্দ গীতার ভাষ্যকার] ছাত্র কিছু দিন তাঁর কাছে গীতাও পড়েছি। বোধহয় আমি বিভূতিবাবুকে দেখেছি।...

তোমার লেখায় নূতনত্ব আছে—রামানন্দ বাবুর কথা কিছু লিখো। আশা করি তোমার এই জীবনী কথাচিত্র কালজয়ী হবে। ইন্দ্রানীকে নিয়ে যে করুণ রস সৃষ্টি করেছ, তা আমাকে কাঁদিয়েছে। এজন্য তোমাদের উপর রাগ হয়। আমি তারাশঙ্কর বাবুকে এক সময় লিখেছিলাম—আপনি ও শরৎবাবু বড় চোখের জল বহিয়েছেন এজন্য রাগ হয়। বাঙালী এত কাঁদছে তাদের আরও কাঁদান নিষ্ঠুরতা।

তোমার কলম ধন্য হোক—কবির দৃষ্টি ঋষির দৃষ্টি আমরা তাদের ঠিক বিচার করতে পারিনা—সে শক্তি নাই।

☐ অধ্যাপক ড. অমলেশ ত্রিপাঠীকে লিখিত :

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরণম্

১০/৩/৯৪

আমাদের প্রিয় ভাই,

আপনি বলে লিখতে মন চাইছে না, কিন্তু তোমরা বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ একথা ভুলতে পারি না। তোমাদের পুণ্যশ্লোক পিতৃদেবের সময়ে আমি দেউলপোতা স্কুলের একজন ছাত্র ছিলাম—আমার গুরুদেব বাবু চুনীলাল কুইতি নিশ্চয় তোমার জানা শোনা লোক হবেন—তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। আমার পরিচয় ছিল [তোমার] বড়দাদা হৃষীকেশ ত্রিপাঠীর সঙ্গে—একসঙ্গে তমলুকে সমবায় সোসাইটিতে কাজ

করেছি। আমার খুব ইচ্ছা ছিল তোমাকে একবার চোখে দেখবার জন্য—তা ঠাকুরের ইচ্ছায় কয়দিন আগে আনন্দবাজারে ছবিসহ বিবরণ দেখেছি। ছোটবেলার ছবি দেখতে মন চায়। তুমি আমি একগাছের পাখী—আমি ১৯২০ সালে হ্যামিল্টন স্কুল থেকে পাশ করি প্রথম ছাত্র রূপে—তুমি পাশ করেছ মহাগৌরবে ১৯৩৬ সালে—আমাদের আনন্দের সীমা নাই। ঠাকুরের সম্বন্ধে দেশ পত্রিকায় লেখা এখন আমার সামনেই আছে —এমন লেখা আর কারো দ্বারা সম্ভব নয়। কুমারবাবুর স্মরনিকাতে character of a district আমি অনুবাদ করে হলদিয়া পত্রিকায় প্রকাশের জন্য দিয়েছিলাম। আশা করি তোমার কলম থামবে না। এখন বড় অপটু হয়ে পড়েছি—৯৪ বছরে যতটা ভাল সম্ভব তাই আছি—তোমাদের কুশল প্রার্থনা করি। শ্রীশ্রী ঠাকুরের আশ্রয়ে বেলুড়ে আমি ১৯২৭-৩১ ছিলাম—তিনি দেশে ঠেলে দিলেন। এখন যেমন রেখেছেন তেমন আছি।

যদি দেশে আসা হয় একটু খবর যেন পাই। ইতি।

□ শ্রীঅতুল্য ঘোষকে লিখিত :

বন্দেমাতরম্

মাননীয় মহাশয়,

আপনার যে সব মূল্যবান লেখা 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় আমি তা পড়ে থাকি এবং এখনও যে আপনি দেশের জন্য লিখতে ব্যস্ত আছেন এজন্য ধন্যবাদ জানাই।

সম্প্রতি ১৫ সেপ্টেম্বরের কাগজে ধর্ম ও অধর্ম বিষয়ে প্রবন্ধটি গভীর আগ্রহে পড়েছি। প্রসঙ্গতঃ আমার মনে হয়েছে যে গল্প উপন্যাস লেখকেরা সুকৌশলে মদ্যপানকে জনপ্রিয় করবার চেষ্টায় আছেন এবং পরোক্ষভাবে প্রচারের কাজ চলছে। এতে জাতির ক্ষতি হচ্ছে অথচ আমরা প্রতিবাদ করতে পারছি না। তাঁরা কি মাদক ব্যবসায়ীদের প্রতি দয়া করে এরকম লেখা লিখছেন? অথবা তাঁরা কি কিছু আর্থিকলাভ করেন এরূপ লেখার জন্য? সম্পাদকগণ লেখাকে লোকপ্রিয় করার লোভে প্রচারের সুবিধা করে দিচ্ছেন। মহাত্মাজী আমাদের মাদক নিবারণ বিষয়ে ১৯২০ সাল থেকেই বলে গিয়েছেন অথচ আমরা এখন ঐ রকম চোরাগোপ্তা আঘাতের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারছি না। [আমার বয়স এখন ৮৪ বৎসর] আপনাকে এই বিষয় একান্তে জানাচ্ছি বড় দুঃখে—আজ বাংলায় কে আছে যে এই মাদক অভিশাপ থেকে দেশকে রক্ষা করবে? আমাদের গ্রামাঞ্চলে এখন মাদকের প্রসার বেশী হয়েছে—তার উপরে বিদেশ ভ্রমণ কাহিনী ও অন্যান্য লেখার মধ্য দিয়ে গুপ্ত প্রচার ভাল ভাল কাগজে চলছে। অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমরা আতঙ্কিত—হয়ত আর দশ বৎসরের মধ্যেই পাশ্চাত্ত্য অনুকরণ প্রিয় ছেলেমেয়েরা সব মদ্যাসক্ত হয়ে রাস্তায় ও স্কুল কলেজেও নৃত্য করবে। একটি মাত্র সান্ত্বনা আমাদের মত পুরাতন লোকদের আছে—আমরা ততদিনে থাকব না।

পত্রটিকে ব্যক্তিগত মনে করবেন ও সম্ভব হলে প্রাপ্তি স্বীকার করবেন। আপনার কুশল প্রার্থনা করি।

সম্ভবতঃ আমি জেলা পরিষদ সমূহের সদস্যদের মধ্যে বয়সে বড়। একখানি সাপ্তাহিক পত্র করার চেষ্টা করছি। ইতি

□ ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র, সভাধিপতি মেদিনীপুর জেলা পরিষদ -মহাশয়কে লিখিত :

বন্দেমাতরম্

৭/২/৭৯

মহাশয়,

আমি ভাল রকমেই জানি আপনার সময় খুবই কম তথাপি কেন যে কয়টি কথা লিখছি তা অবসর মত পড়ে নিলেই বুঝতে পারবেন। আমাদের জেলার ভার অনেক বিষয়েই আপনার উপরে নির্ভর—সুতরাং আপনাকে কিছু কথা জানান কর্তব্য মনে করি। সভাতে আলোচনার মত জিনিষ এটা নয় কেবল আপনিও আমি একান্তে এ বিষয় আলোচনা করছি।

৫/২/৭৯ সভায় আমি ছিলাম এবং আপনি যেভাবে জিলা পরিষদ বাজেট উত্থাপন ও পরিষদের অন্যান্য বিষয় উপস্থাপিত করিয়াছেন এবং যেরূপ তৎপরতার সহিত তর্ক জবাব দিয়াছেন তাহাতে আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি—বস্তুতঃ আপনি যে বিশ্রাম তুচ্ছ করে এখন থেকেই কাজে মন দিয়েছেন তা বুঝেছি, এমন কি আপনি ডাক্তার হইলেও আপনাকে নিজ স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিতে অনুরোধ করিব।

আমার বয়স আগামী ফাল্গুন মাসে ৭৯ তে পড়িবে—অনেক দূর পথ এসেছি—অনেক রকম দেখেছি—প্রথম জীবনে সংবাদপত্র পরিচালন করেছি—তাই কাগজওয়ালাদের ভয় রাখি—কে জানে আমাদের হলের দরজার মুখে কোন রিপোর্টার ছিল না। যদি থাকে ও আমাদের লক্ষ্য করে আমাদের কিছু বাঁকা চোখে দেখিতে পারে।

সভায় আমাদের কাজ শেষ হবার পর দুটী প্রস্তাব উঠে—একটি ত্রিপুরা অপরটি চটকল ধর্মঘট বিষয়ে। আমি প্রথমেই বুঝি জিলা পরিষদের বা মেদিনীপুর জিলার কথা হইতেছে না। সুতরাং আমি একজন নীরব পর্যবেক্ষক মাত্র ছিলাম। আমার ধারণা সভারম্ভে প্রথমেই এক আপত্তিকারী সভ্যের উক্তির জবাবে বহুকণ্ঠে ধ্বনি ওঠে যে পার্টির কথা এখানে বলা চলবে না—আমরা পরিষদ সদস্য হিসাবেই কাজ করিতেছি—এইটা ঠিক কথা। কিন্তু তাঁহারাই শেষে নিজেরাই এমন দুইটি বিষয় তুলিলেন যাহা ঐ হলের বাহিরে আমরা আলোচনা করিতে পারিতাম এবং সেখানে উহা লইয়া সপক্ষে ও বিপক্ষে মতামত প্রকাশ করিলে শ্রোতাগণের তাহাতে আপত্তির কিছু ছিল না। লোকে যদি মনে করে সদস্যগণ অন্যান্য কথা ও বলাবলি করে তাহাতে আপনাদের প্রবল দল আছে—আপনাদের তথা আমাদের মর্যাদা কমে যেতে

পারে। ঐ দুটা কথা ছাড়া আরও গন্ডা গন্ডা এমন বিষয় আছে যাহা কেন আলোচনা হইল না এমন কথা উঠিতে পারে এবং আমরা লোকের কথার তলে পড়িয়া যাইব। পশ্চিমবঙ্গের এই বৃহত্তম জিলা পরিষদ হিসাবে আমরা নিশ্চয়ই এমন নাম পাইব যাহাতে লোকে বলে ইহারা বিশেষ বিবেচনার সহিত কাজ করেন।

অবশ্য সভাধিপতি হিসাবে আপনার স্বাধীনতা কম, সকলের মতের মূল্য দিতে হয়। আমার পরামর্শ আপনি নিজেকে সকলের উপরেই রাখিবেন এবং প্রস্তাবক ও সমর্থকগণই যাহা বলিবার তাহা বলিবেন—সিদ্ধান্ত মাত্র আপনার মুখ দিয়া বাহির হইবে। আপনি এইরকম বলিতে পারিতেন—যদি ও জিলা পরিষদের আইনের ও নিয়মের কথা নয় তথাপি যখন মাননীয় সদস্যগণ এই বিষয়টি আলোচনা করিতে চাহেন তখন সভার অনুমতি হইলে আপনি আলোচনা করিতে সম্মতি দিবেন। বোধ হয় আমার উক্তি আপনি এখন বুঝিয়াছেন, আপনি একজন কর্তা হিসাবেই কাজ করিবেন। কাদা মাখিয়া ধৌত করা অপেক্ষা যাহাতে কাদা না লাগে তাহাই আমার মত অল্পবুদ্ধির লোকে পছন্দ করে—কারণ উহা ন্যায়শাস্ত্রের কথা।

সর্বদা আপনার ব্যক্তিগত কুশল ও স্বাস্থ্য প্রার্থনা করি। ইতি—

□ আকাশবাণী কলিকাতার 'প্রাত্যহিকী' বিভাগে প্রেরিত— ২১/৯/৯৩

[১]

মহাশয়,

বড় দেরী হয়ে গেল। এখন আমর বয়স ৯৩। সংক্ষেপে কথাটা আপনার দপ্তরে নিবেদন করি।

১৯৫৫/৫৬ সাল বোধ হয়—একদিন চণ্ডীচরণ ও সুধীর দুই ভাই আমাকে বলে তাদের পদবী "ছাগল" শুনতে ভারী মন্দ লাগে—বদল করতে হবে। আমি তমলুকে গিয়ে উকিল ধরে ব্যবস্থা করি—হাজরা পদবী করা হয়। সতীশবাবু [লোকসভার সদস্য] উপস্থিত ছিলেন। তিনি শুনে বলেন—রমণীবাবু ছাগলকে মানুষ করতে এসেছেন—এখন মনে পড়ল।

অতএব পদবী আবশ্যক মত আইনের সাহায্যে বদল করা যেতে পারে। ইতি—

[২]

প্রিয় মহাশয়,

আজ ১লা এপ্রিল ১৯৯৫। সকালেই আপনারা বিশ্বকবির যে গানটি দিয়েছিলেন 'এই কথাটি মনে রেখো' তার জন্য শত ধন্যবাদ। যিনি আমাদের বিশ্বসভায় ধন্য করেছেন তাঁর মুখে—এই কথাটি মনে রেখো—আমাদের হৃদয় স্পর্শ করেছে—তাঁকে মনে পড়ছে—চোখে জল আসছে। বেশী লিখতে পারছি না। ধন্যবাদ। শ্রীরমণীমোহন মাইতি, বয়স ৯৫।

□ মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়কে লিখিত :

To 7.2.78

His Excellency

Shri T. N. Singha

Governor of West Bengal.

May I please your excellency to look to my humble. prayer.

At first I may be excused for saying some words about myself and my works.

I am a poor resident of a village in Midnapore district who is going to enter his 78th year after a few days. I had the fortune to follow Mahatma Gandhiji in Non-co-operation days and worked in various spheres of life which will take much time to relate.

Mahatmaji believed that Hindi should be a great factor for integration of India and we shared his views. Though I had little chance to be helped in this matter, I learned by my own effort a bit and at this age have prepared two translations in Bengali which may advance the cause of Hindi to some extent.

(1) A short life story of Sri Aurobindo published by National Council of Educational Research and Training, New Delhi. I have doen it page by page, so that it will help to learn Hindi if a Bengali speaking person want to do so.

(2) A Bengali version of "Meri Asafalata" by Dr. Gulab Ray of Agra. This book reveals the beauty of the Hindi literature and though not very modern may be enjoyed with delight by all.

I will be highly obliged if I am allowed an interview by one of your officers to whom I may explain my prayer. I dare not approach your excellency on such a matter. Yet I expect my prayer will have a kind consideration as it is of some national importance.

I beg to remain

Sir,

Yours most obediently

Ramani Mohan Maity

□ ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রমণীমোহন মেদিনীপুর শহরের প্রান্তে অবস্থিত অবহেলিত এক সমাধিক্ষেত্রের বিস্তারিত বিবরণ সহ গবেষণাপত্র রচনা করেন এবং লণ্ডনের রয়াল

সোসাইটিতে পাঠান। লণ্ডন মিউজিয়াম কেনসিংটন প্রাসাদ থেকে এই পত্রের ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়। সেই পত্রটি মুদ্রিত হল ঃ

The London Museum
Kensington Palace
London W 8
21st October 1953

Dear Sir,

Thank you very much for sending us your account of the graveyard at Midnapore. This Museum, however deals only with the history of London : so I am afraid the paper is outside our scope entirly; but I am forwarding it to the Imperial Institute in case they are able either to make use of it themselves or to pass it on to some other institution which can.

Thank you nevertheless for your kindness in thinking of us.

Yours faithfully
(Sd.) Jean K Macdonald
Director's Secretary

□ স্বামী নির্মলানন্দজী মহারাজ লিখিত :

[রমণীমোহনের পত্রোত্তরে গুরুদেব শ্রীমৎ নির্মলানন্দজী মহারাজ ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তাঁকে বেশ কয়েকটি চিঠি লিখেছেন। রমণীমোহন আজীবন গুরুদেবের এই স্মৃতি পরমযত্নে রক্ষা করেছেন। এখানে কয়েকটি পত্র মুদ্রিত হল]

[১]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরণং

Benaras city
6.3.28

শ্রীমান রমণীমোহন,

তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি উপস্থিত যেখানে আছ ঐখানে থেকেই শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজ করবার সামর্থ্য লাভ কর এই আমার ইচ্ছা। আমি আবার আগামী বৎসরে ওখানে আসিব, তখন তোমার সঙ্গে দেখা হবে। তুমি আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
নির্মলানন্দ

[২]

শ্রীশ্রী গুরুদেব
শ্রীচরণকমল ভরসা

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
Trivandrum
25.8.28

শ্রীমান রমণী,

তোমার চিঠি গতকল্য এখানে পাইয়াছি। তুমি ভাল আছ ও মঠের এবং শিল্প বিদ্যালয়ের সমস্ত কুশল জানিয়া সুখী। ওদেশে খুব বৃষ্টি হওয়ায় শস্যের ক্ষতি হইয়াছে বড়ই আশঙ্কার বিষয়।

আজ প্রায় দুমাস হলো এখানে এসেছি। এদেশে চারটি নূতন আশ্রম তৈয়ারী হইতেছে সেই উদ্দেশ্যে বড় ব্যস্ত। এখানে আরও একমাস থাকিতে হবে। তারপর বেঙ্গালোরের আশ্রমে যাবো। আমার শরীর পূর্ববৎই আছে। পূজার পর কলিকাতা যাইব এরূপ ইচ্ছা। তার পর ঠাকুর যা করেন। তোমার লিখিত স্তোত্রটি বেশ হয়েছে। আমার স্নেহাশীর্বাদ তুমি জানিবে। সুহৃদ, শ্রীধর প্রভৃতি সকলকে জানাইবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
নির্মলানন্দ

[৩]

শ্রীশ্রী গুরুদেব
শ্রীচরণ কমলভরসা

Bangalore
17.10.28

শ্রীমান রমণীমোহন,

তোমার পোস্টকার্ড গতকল্য পাইয়াছি। তুমি পূর্বাপেক্ষা অনেকদিন ভাল আছ ও তথাকার অপরাপর সকলের কুশল জানিয়া বিশেষ সুখী। তুমি আমার 'বিজয়ার শুভাশীর্বাদ ও সাদর স্নেহাদি জানিবে ও বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে, সুহৃদ ও দেবেন মহারাজকে জানাইবে।

এখানে একপ্রকার সমস্ত মঙ্গল। ইতি

শুভানুধ্যায়ী
নির্মলানন্দ

[৪]

R. K. Mission
P.O. Wari, Dacca
20.3.29

কল্যাণবরেষু,

শ্রীমান রমণী, তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ ও তোমরা সব ভাল আছ জানিয়া সুখী হইলাম। কুমিল্লাতে আমি Influenza জ্বরে

১০/১২ দিন শয্যাগত ছিলাম। সেখান হইতে শিবরাত্রির দিন এখানে আসিয়াছি। এখন আমার শরীর ক্রমশঃ ভাল হইতেছে। ৫/৭ দিন পরে এখান থেকে ময়মনসিংহ যাব ও তারপর বেলুড়মঠে পৌছিব। সেখানে তোমাদের সহিত দেখা হইবে। পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজকে আমার প্রণাম জানাবে। তুমি ও অন্যান্য সকলে আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। ইতি

শুভানুধ্যায়ী
নির্মলানন্দ

□ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী মহারাজ, যুগ্ম সম্পাদক [বর্তমানে সম্পাদক] উদ্বোধন কর্তৃক রমণীমোহনকে লেখা পত্র :

Udbodhan Office
1, Udbodhan Lane,
Calcutta 700 003
9.9.88

শ্রদ্ধাভাজনেষু,

আপনার পোঃ কার্ড পেয়েছি কদিন আগে। তারপর বেলুড় মঠ থেকে 'redi-rected' হয়ে আপনার অপর চিঠিটিও পেয়েছি। 'দেশ' পত্রিকায় বেলুড় মঠের শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির সম্পর্কিত আমার লেখাটি আপনার মতো একজন প্রবীণ ভক্ত ও মন্দির নির্মাণ কালের প্রত্যক্ষদর্শীর ভাল লেগেছে জেনে খুবই তৃপ্তি লাভ করেছি। মাঝে আমি দিন কয়েক অসুস্থ ছিলাম বলে উত্তর দিতে দেরী হল। সেজন্য মার্জনা করবেন।

আপনার বয়স হয়েছে। আপনি কেন কষ্ট করে অতদূর থেকে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন? এখন ট্রেনে বাসে গোলমাল লেগেই থাকে। তাছাড়া বর্ষা শেষ হয়েও হচ্ছে না।

আমার তাই আপনার কাছে বিনীত অনুরোধ, আপনি বরং না এসে আপনার বক্তব্য আমাকে চিঠিতে জানালে আমি তার উত্তর দেবার চেষ্টা করব। মন্দির সম্পর্কে কোন নতুন তথ্য থাকলে তাও জানাতে ভুলবেন না।

আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার নেবেন। ইতি

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

বিদ্যালয় থেকে বিদায় অভিনন্দন

বন্দেমাতরম

যাঁহার মাথার পাগড়িতে বরাভয়বাণী উচ্চারিত, যাঁহার আজানুলম্বিত পরিধেয় বস্ত্রে বাসনা-ত্যাগের মন্ত্রোচ্চারিত, যাঁহার ফতুয়া ও উত্তরীয় মধ্যে পরকে আপন করিবার আহ্বানবাণী ধ্বনিত, যিনি অহম্‌কে জয় করিয়া জিতোহম্ হইয়াছেন, যিনি সংসারী হইয়াও সন্ন্যাসী, যিনি নরকে নারায়ণ জ্ঞানে সেবা করেন, যিনি বাপুজীর ভাবশিষ্য, স্বামীজীর কর্মযোগে দীক্ষিত যিনি শিশুর সারল্য, তরুণের তারুণ্য ও প্রবীণের বিজ্ঞতা লইয়া গণচিত্তে শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত, যিনি এই বিদ্যালয়ের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া ইহাকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন,—সেই সেবাব্রতী সন্ন্যাসী জ্ঞানভিক্ষু কর্মযোগী আদর্শ শিক্ষক শ্রীযুক্ত রমণীমোহন মাইতি মহোদয়কে বিদ্যালয় হইতে অবসর গ্রহণকালে গুণমুগ্ধ ছাত্র ও সহকর্মী শিক্ষক ভ্রাতাগণ শ্রদ্ধার স্রক চন্দনে অভিনন্দিত করিতেছে ও তাঁহার শতায়ু কামনা করিতেছে।

জয়হিন্দ্

দক্ষিণ কাশিম নগর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়
দেবীপল্লী, দক্ষিণ কাশিম নগর, মেদিনীপুর
বিবেকানন্দ শততম জন্মজয়ন্তী বর্ষ

রমণীমোহনের
পঁচাত্তরতম জন্মদিবসের শ্রদ্ধাঞ্জলি

প্রথম বসন্তের এই অনুপম অপরাহ্নে আমরা একজন মহান পুরুষের পদতলে সমবেত হয়েছি তাঁকে আমাদের পবিত্র প্রণাম জানানোর উদ্দেশ্যে। বর্তমান শতাব্দীর সমান বয়স্ক—যাঁর সুদীর্ঘ জীবন একজন সাধারণ মানুষেরই অসাধারণ আত্মোৎসর্গের ইতিহাস, যা স্পর্শ করে আছে সুবিশাল সময়ের নানা ঘাত প্রতিঘাত, নানা স্মরণীয়, অধ্যায়, অভিজ্ঞতা।

তাঁর ঋজুদেহ, শুভ্রকেশ, তীক্ষ্ণ দুই চোখের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, পরিণত এই শতাব্দীর অতিক্রান্ত কয়েকটি যুগের জীবন্ত স্বাক্ষর আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি। আজীবন অক্লান্ত তিনি সত্যব্রত, শিক্ষক ও স্রষ্টা হিসেবে প্রাতঃস্মরণীয়, যাঁর নিষ্ঠা, প্রজ্ঞা, দেশসেবা, সততা, উত্তরসুরী আমাদের পরম সম্বল।

মানুষের এই সুবিশাল তীর্থক্ষেত্রে তাঁকে আমরা দেখেছি গান্ধীভাবনায় উদ্বুদ্ধ, সত্যনিষ্ঠায় অবিচল, কুসুম কোমল হৃদয়ে ভালবাসায় বিগলিত পরমপুরুষ শ্রীশ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণের মন্ত্র ধন্য তিনি, দরিদ্র নারায়ণের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়িয়েছেন, অকিঞ্চন বেশী দেবতার মত।

উদার এই মানবের জীবনপদ্মের কয়েকটি পাঁপড়ির নাম সাধনা ও স্নেহ, সেবা ও ভালবাসা, প্রেম ও প্রতিজ্ঞা।

অজাতশত্রু, সেবাপরায়ণ, অভিমানহীন, ক্ষমাসুন্দর এই বাঙালী আচার্য্যের পদতলে আমরা চিরঋণী, পুত্রতুল্য আমাদের শুধু প্রণাম করার অধিকার আছে।
পয়লা ফাল্গুন ১৩৮১ দক্ষিণ কাশিম নগর।

সংবাদপত্রে রমণীমোহনের প্রয়াণ খবর

□ আজকাল ২রা ডিসেম্বর ১৯৯৬

শিক্ষাবিদের জীবনাবসান

আজকালের প্রতিবেদন : মেদিনীপুর জেলার প্রবীন স্বাধীনতা সংগ্রামী বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ রমণীমোহন মাইতি গত সপ্তাহে ৯৬ বছর বয়সে তাঁর টাঠারিবাড় গ্রামের বাসভবনে প্রয়াত হয়েছেন। গ্রামীণ জীবন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে তিনি বহু মূল্যবান নিবন্ধ রচনা করেছেন। পরবর্তীকালে খ্যাতকীর্তি বহু ব্যক্তি রমণীমোহনবাবুর ছাত্র।

□ আনন্দবাজার ৬ ডিসেম্বর ১৯৯৬

প্রবীণ শিক্ষাবিদ প্রয়াত

স্টাফ রিপোর্টার : মেদিনীপুরের প্রবীণ শিক্ষাবিদ ও স্বাধীনতা-সংগ্রামী রমণীমোহন মাইতি সম্প্রতি মহিষাদলে তাঁর গ্রামের বাড়িতে মারা গিয়েছেন। স্থানীয়ভাবে 'জালপাইয়ের গান্ধী' বলে পরিচিত এই শিক্ষাব্রতী আজীবন গান্ধীর আদর্শ অনুসরণ করেছেন। মহিষাদলে দক্ষিণ কাশিমনগর হাইস্কুল তাঁরই হাতে গড়া, সেখানেই তিনি শিক্ষকতা করেছেন। মেদিনীপুরে আরও কয়েকটি স্কুল তাঁর উদ্যোগে গড়ে ওঠে। গ্রামীণ জীবন, শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ে তাঁর বহু প্রবন্ধ-নিবন্ধ নানা পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

জীবনপঞ্জী

১৯০১ জন্ম ১৪ই ফেব্রুয়ারি [১লা ফাল্গুন ১৩০৭] মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল থানার টাঠারিবাড় গ্রামে। পিতা-রতনচন্দ্র মাতা-কুমারী দেবী। সাতমাস বয়সে পিতৃহীন।

১৯০৪ দক্ষিণ কাশিমনগর উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষারম্ভ।

১৯১৩ সূতাহাটা থানার দেউলপোতা মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়ে প্রবেশ।

১৯১৪ মধ্য ছাত্রবৃত্তি লাভ।

১৯১৫ তমলুক হ্যামিল্টন হাইস্কুলে ভর্তি।

১৯২০ প্রথম বিভাগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। মেদিনীপুর কলেজে আই.এস.সি. ক্লাসে ভর্তি। মহাত্মা গান্ধী ও দেশবন্ধুর আহ্বানে কলেজ পরিত্যাগ ও অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান।

১৯২১ বাঁকুড়া ন্যাশনাল কলেজে পাঠগ্রহণ। লালগঞ্জ ও সোনামুখী ন্যাশনাল স্কুলে শিক্ষকতা।

১৯২২ মহিষাদল থানার কাঁকুড়দা জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকরূপে যোগদান। এখানে অন্যান্যদের সঙ্গে অজয়মুখোপাধ্যায় ও সতীশচন্দ্র সামন্ত ও তাঁর সহকর্মী।

১৯২৩ পুরী ভ্রমণ ও শ্রীজগন্নাথ দর্শন।

১৯২৪-২৬ প্রথমে পাক্ষিক পরে সাপ্তাহিক পত্ররূপে 'পথিক' প্রকাশ দ্বারা বিংশ শতাব্দীতে তমলুক মহকুমায় সংবাদপত্র প্রকাশের পথপ্রদর্শক।

১৯২৫ কাঁথিতে মহাত্মা গান্ধীর জনসভায় সাংবাদিকরূপে উপস্থিতি। রাজা রামমোহনের জন্মস্থানে রাধানগরে অনুষ্ঠিত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে যোগদান।

১৯২৬ শ্রীহট্ট থেকে প্রকাশিত বিখ্যাত সংবাদ সাপ্তাহিক 'জনশক্তির' কার্যালয়ে সংবাদপত্র পরিচালনা শেখার জন্য অবস্থান। পুণ্যশ্লোক অশ্বিনীকুমারের বিদ্যালয়ে ঋষি জগদীশচন্দ্রকে দর্শন।

১৯২৭-৩১ বেলুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের শিল্পবিদ্যাপীঠে স্বেচ্ছাকর্মী। বহু সাধুসন্তর সান্নিধ্যলাভ। এই সময়ে প্রতিবছর কামারপুকুর-জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের জন্মস্থান দর্শন।

১৯২৮ গয়া ও কাশীধাম ভ্রমণ। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দ-এর সংস্কৃত স্তোত্রগীতি রচনা। মিস ম্যাকলাউড ও তাঁর ভগিনীর উপস্থিতিতে বেলুড়ে 'সংশোধন' নাটকে জগৎবাবুর ভূমিকায় অভিনয়।

এই নাটকে সুরারোপও করেন রমণীমোহন।

১৯২৯ ১৩ই মার্চ বেলুড়ে বর্তমান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা, ভূগর্ভে তাম্রফলক স্থাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত-মহাপুরুষ মহারাজ স্বামী শিবানন্দজীকে প্রণাম করবার সময় তাঁকে বলতে শুনলেন—"ঠাকুরের কাজ চলবেই—এ শরীর থাক আর যাক। পাঁচ সাত শত বৎসর এই স্রোত চলবে...."

১১ই এপ্রিল উদ্‌বোধন মায়ের মন্দিরে স্বামী নির্মলানন্দজী [তুলসী মহারাজ]-এর নিকট দীক্ষাগ্রহণ।

১৪ই এপ্রিল "শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তলহরী" রচনারম্ভ [সমাপ্ত ১৯৮৭]

১৯৩১ শারীরিক কারণে বেলুড় থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন। দক্ষিণ কাশিম নগর মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয় সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ—কিছুদিন অস্থায়ী প্রধান শিক্ষক এবং পরে শিক্ষকরূপে কর্ম আরম্ভ।

১৯৩৪ 'মোহন প্রেস' স্থাপন। ভুবনেশ্বর ভ্রমণ।

১৯৩৬ বিভাগীয় শিক্ষাবিষয়ক পরীক্ষা আর্ট অব্ টিচিং'-এ বর্ধমানে বিভাগে সপ্তম ও জেলায় প্রথমস্থান অধিকার।

১৯৩৭ সংসারাশ্রমে প্রবেশ। এ দেশে প্রথম ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপিত হলে উহাতে নির্বাচিত সভ্য [১৯৫০ পর্যন্ত]

১৯৩৮ ঋণসালিশী বোর্ডে মেম্বার। সাতবছর এই কাজে যুক্ত থেকে শত শত দরিদ্র মানুষের ঋণ মুকুবের ব্যবস্থা।

মেদিনীপুর জেলা কোর্টে জুরী রূপে নিযুক্ত [১৯৬০ পর্যন্ত]।

১৯৩৯ টাঠারিবাড় সমবায় সমিতি স্থাপন।

১৯৪০ জনগণনা কাজে সুপারভাইজার রূপে নিযুক্ত।

১৯৪১ দক্ষিণ কাশিম নগর কৃষি ঋণদান সমিতি তথা সমবায় ব্যাঙ্ক সংগঠন।

১৯৪২ টাঠারিবাড় গ্রামে পাঠক সমিতি ও ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরী গঠন। সরকারী রিলিফ কমিটির মেম্বার রূপে নিযুক্ত।

১৯৪৩ বিদ্যালয় থেকে ছুটি নিয়ে রিলিফের কাজে কঠোর পরিশ্রম।

১৯৪৬ দক্ষিণ কাশিম নগর মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়টি উচ্চবিদ্যালয়ে উন্নীত হলে সহশিক্ষকরূপে যোগদান ও বিদ্যালয় সংগঠন ।

১৯৪৭ স্বাধীন ভারতের অধিবাসীগণের জ্ঞাতব্য বিষয়ে পুস্তিকা রচনা।

১৯৪৮ কাঁকুড়দা গ্রামে শহীদ গুণধর হাজরা স্মৃতি স্তম্ভ উদ্‌বোধনের প্রথম বক্তা রমণীমোহন। তমলুক সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর নির্বাচিত।

১৯৪৯ চন্দ্রেশ্বর সংস্কৃত বিদ্যালয়ের সভাপতি-আজীবন এই পদে আসীন। স্বরাজ গঠন সম্পর্কে বিভিন্ন সভায় ভাষণদান। বীরসিংহ ভ্রমণ।

১৯৫০ ইটামগরা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টরূপে দায়িত্ব গ্রহণ [১৯৭৬ পর্যন্ত]।

১৯৫১ গবেষণামূলক প্রবন্ধ 'দি ফরগটন গ্রেভস' রচনা ও বিলাতে প্রেরণ লণ্ডন মিউজিয়ম থেকে প্রশংসাজ্ঞাপক স্বীকৃতিপত্র।

জনগণনা কার্যে দক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ ভারত সরকার কর্তৃক রৌপ্য পদক প্রদান।

মহিষাদল-হরিখালি পর্যন্ত দীর্ঘ নয় কি.মি. গ্রাম্য রাস্তা গাড়ী চলাচলের উপযোগী করার দায়িত্বগ্রহণ—সরকার প্রতিশ্রুত টাকা না দেওয়ায় পারিবারিক ছয়বিঘা জমি বিক্রয় করে শ্রমিকদের প্রাপ্য শোধ করেন।

১৯৫৩ অধুনালুপ্ত 'পল্লীজীবন' পত্রিকায় 'শ্রীপথিক' ছদ্মনামে ভ্রমণ ও সমালোচনাধর্মী বহুলেখা ছাপা হয়।

ইটামগরা ইউনিয়নবোর্ডে ন্যায় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে [১৯৬৪ পর্যন্ত] তিনশতাধিক মামলায় গুরুত্বপূর্ণ রায় প্রদান।

১৯৫৭ মহিষাদলে প্রজ্ঞানানন্দ স্মৃতিরক্ষা সমিতি স্থাপিত হলে রমনীমোহন এই প্রতিষ্ঠানের আজীবন প্রতিষ্ঠাতা সভ্যদের অন্যতম। দার্জিলিং ভ্রমণ।

১৯৫৯ জয়রামবাটী-কামারপুকুর ভ্রমণ [১৯৯৩ পর্যন্ত প্রায় পঁচিশবার]

১৯৬০ জনগণনা কার্যে কৃতিত্বের জন্য পুনরায় পদকপ্রাপ্তি।

১৯৬১ তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত কবিসম্মেলনে স্বরচিত কবিতা পাঠ।

১৯৬২ বিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ-শেষ দিনেও শেষ ঘন্টা পর্যন্ত ক্লাস নেন।

বৃক্ষরোপণে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের জন্য ইটামগরা ইউনিয়নবোর্ডের প্রেসিডেন্ট রূপে বনমহোৎসব পুরস্কার গ্রহণ।

১৯৬৩ মহিষাদলে সমবায় মার্কেটিং সমিতির প্রথম চেয়ারম্যান নিযুক্ত।

গঙ্গাসাগরে বিনোবাজীর পদযাত্রা-সঙ্গী।

মহিষাদল কেন্দ্রে ভারতসেবক সমাজের মুখ্যসহযোগীর দায়িত্ব গ্রহণ।

১৯৬৫ ভারতসেবক সমাজের কাজে দিল্লী-শ্রীনিকেতন।

১৯৬৬ উড়িষ্যা ভ্রমণ। একদিনে সাইকেলে ৩৪ মাইল যাতায়াত করে যথাসময়ে মহিষাদলে সমষ্টি উন্নয়ন সমিতির সভায় উপস্থিত।

১৯৬৭ শান্তিপুর-কালনা-মুর্শিদাবাদ-বাঁকুড়া ভ্রমণ।

১৯৬৮ কেরালা-ভ্রমণ—ওট্টাপালমে গুরুদেব স্বামী নির্মলানন্দজী মহারাজ প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে অবস্থান।

প্রজ্ঞানানন্দ ভবনের সভায় মহাত্মাজী সম্পর্কে শতবার্ষিকী প্রবন্ধ পাঠ।

১৯৬৯ আমেরিকা থেকে আগত ছাত্রী-গবেষককে সমাজবিজ্ঞান বিষয়ের গবেষণা কাজে সহায়তা প্রদান।

চরকায় স্বহস্তে কাটা সূতায় খদ্দরের কাপড় বুনিয়ে পরিধান। মালয়ালম পত্রিকা 'তুলসীসুগন্ধম' পত্রিকায় রমণীমোহনের ইংরেজীতে লেখা গুরুদেব স্মৃতিকথা মালয়ালম ভাষায় প্রকাশিত।

১৯৭০ কোয়ালপাড়া আশ্রমে অবস্থান—১লা জানুয়ারী স্বামী অটলানন্দজীর সঙ্গে সূর্যোদয় দর্শনে অভিভূত রমণীমোহন।

১৯৭১ জনগণনা কার্যে স্বীকৃতিস্বরূপ পরপর তৃতীয়বারের জন্য পদক প্রাপ্তি। পদবী মালা সংগ্রহ—প্রবন্ধ রচনা।

১৯৭৩ নরেন্দ্রনাথ দাস রচিত 'হিস্‌ট্রী অব মিডনাপুর' পুস্তকের বঙ্গানুবাদ করেন। প্রদীপ পত্রিকায় তাঁর বহু লেখা প্রকাশ।

১৯৭৫ পঁচাত্তরতম জন্মদিনের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে রমণীমোহনের আচার্য শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী উপস্থিত হয়ে মহকুমায় "সংবাদপত্র প্রকাশের পথপ্রদর্শক, সমবায়নীতি প্রচার দ্বারা মহকুমার কল্যানসাধক" রূপে রমণীমোহনকে আশীর্বাদ করেন।

১৯৭৬ ১৮ই সেপ্টেম্বর ইটামগরা অঞ্চলের অঞ্চলপ্রধানের দায়িত্ব স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করেন পঁচিশ বছর পরে।
হিন্দী পুস্তক 'শ্রীঅরবিন্দ জীবনী'-র বঙ্গানুবাদ করেন।

১৯৭৭ প্রখ্যাত হিন্দী লেখক গুলাব রায় রচিত 'মেরী অসফলতা' পুস্তকের অনুবাদ করেন।

১৯৭৮ মহিষাদল থেকে মেদিনীপুর জেলাপরিষদে প্রথমবারের জন্য নির্দল সদস্যরূপে রমণীমোহন নির্বাচিত হন [পর পর দুবার]।

১৯৮৪ রমণীমোহনের সম্পাদনায় মহিষাদল থেকে সাপ্তাহিক 'গুণধর' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ৪ঠা ডিসেম্বর। মোট ৩৯টি সংখ্যা প্রকাশের পর অর্থাভাবে পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হয়। পচাঁশি বছর বয়সে সংবাদপত্র সম্পাদনা, গ্রামান্তরে ঘুরে সংবাদ সংগ্রহ, পত্রিকা বিতরণ রমণীমোহনের জীবনের অক্ষয়কীর্তি বলা যায়। মহিষাদলের যাবতীয় গৌরবগাথা রমণীমোহন এই পত্রিকার পাতায় লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

১৯৮৭ বেলুড়মঠে সভাপতি মহারাজ গম্ভীরানন্দজীকে দর্শন। শিল্পবিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ মহারাজের সঙ্গে স্মৃতিচারণা।

১৯৮৮ উদ্‌বোধন পত্রিকার যুগ্মসম্পাদক [বর্তমানে সম্পাদক] স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজীর মহারাজের সঙ্গে পত্রালাপ।
তাম্রলিপ্ত পত্রিকায় নিয়মিত বিচিত্র বিষয়ে রমণীমোহনের রচনা প্রকাশিত হতে থাকে [আমৃত্যু প্রায় পাঁচশতাধিক রচনা প্রকাশিত হয়]

১৯৯৩ শেষবারের মত কামারপুকুর জয়রামবাটী ভ্রমণ করেন।

১৯৯৪ জেলায় সমবায় সংগঠনের অন্যতম পুরোধারূপে রমণীমোহনকে কন্টাই কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক তাঁদের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে সংবর্ধনা জানান।

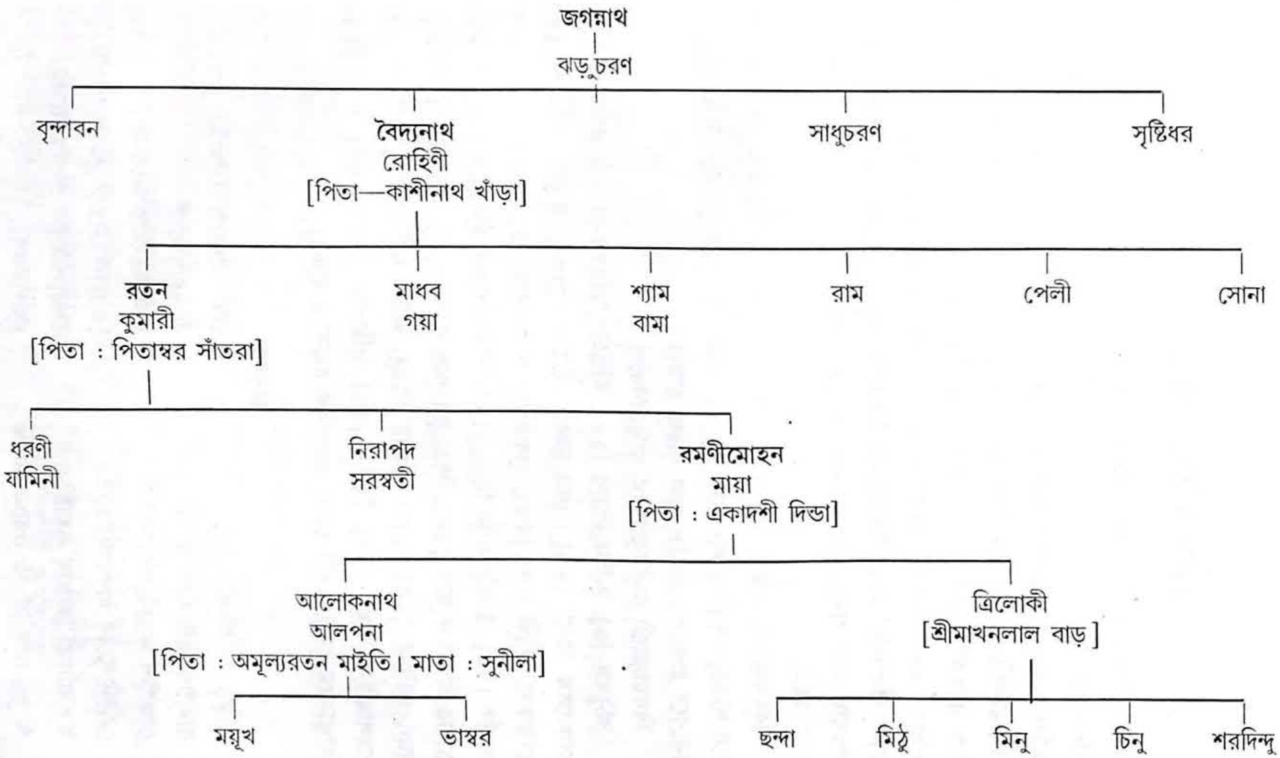
১৯৯৫ প্রজ্ঞানানন্দ ভবনে শ্রেষ্ঠ সমাজসেবীরূপে রমণীমোহনকে সংবর্ধনা প্রদান।

১৯৯৬ ১১ই আগষ্ট হ্যামিল্টন হাইস্কুলে প্রাঙ্গনে বিদ্যালয়ের প্রবীণতম ছাত্ররূপে রমণীমোহনের শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর মর্মরমূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী দিবসে স্টেটব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার তমলুক শাখা রমণীমোহনেক সংবর্ধনা প্রদান করেন। এখানে সংক্ষিপ্ত কিন্তু উদ্দীপনাপূর্ণ ভাষণে রমণীমোহন প্রত্যেককে দেশসেবার কাজে প্রত্যহ কিছুটা সময় দেবার জন্য মর্মস্পর্শী আহ্বান জানান।

মহাত্মাজীর জন্মদিনে মেদিনীপুর জেলা শিশুকল্যান পর্ষদ আয়োজিত রক্তদান শিবিরে উপস্থিত থেকে জীবনের সর্বশেষ ভাষণটি দেন রমণীমোহন।

নভেম্বর মাসে জিজ্ঞাসা করতে থাকেন ২৫ তারিখ কবে— আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণের কথা বলতে থাকেন— ২৫শে নভেম্বর [৯ই অগ্রহায়ণ ১৪০৩] রাস পূর্ণিমার দিনে অপরাহ্ন ৩.৪০ মিনিটে স্বগৃহে 'পথিক' রমণীমোহন যোগনিদ্রায় লোকান্তরে যাত্রা করেন।


জগন্নাথ
ঝড়ুচরণ
বৃন্দাবন
বৈদ্যনাথ
রোহিণী
[পিতা—কাশীনাথ খাঁড়া]
সাধুচরণ
সৃষ্টিধর
রতন
কুমারী
[পিতা : পিতাম্বর সাঁতরা]
মাধব
গয়া
শ্যাম
বামা
রাম
পেলী
সোনা
ধরণী
যামিনী
নিরাপদ
সরস্বতী
রমণীমোহন
মায়া
[পিতা : একাদশী দিন্ডা]
আলোকনাথ
আলপনা
[পিতা : অমূল্যরতন মাইতি। মাতা : সুনীলা]
ত্রিলোকী
[শ্রীমাখনলাল বাড়]
ময়ূখ
ভাস্বর
ছন্দা
মিঠু
মিনু
চিনু
শরদিন্দু

রমণীমোহন মাইতির রচনাপঞ্জী

[বিবিধ বিষয়ে প্রকাশিত-অপ্রকাশিত মিলিয়ে রমণীমোহনের রচনার সংখ্যা ছ'শোরও বেশি। স্থানীয় পত্রপত্রিকার মধ্যে প্রদীপ, প্রলাপ, পল্লীজীবন, নীহার, তাম্রলিপ্ত, আবাসী হলদিয়া, ল্যাকেটু প্রভৃতিতে তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও শিক্ষক, কৌশিকী, যোজনা পত্রিকাতেও তিনি লিখতেন। আসাম ও কেরালা থেকে প্রকাশিত কাগজেও তাঁর কয়েকটি লেখা ছাপা হয়েছে। রমণীমোহনের নিজের প্রকাশিত/সম্পাদিত 'পথিক' এবং 'গুণধর' পত্রিকাতে তাঁর বহু রচনা মুদ্রিত হয়েছে। বেশ কিছু লেখা তিনি 'শ্রীপথিক' নামে লিখেছেন। ইতিমধ্যে কয়েকটি পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এবং অন্যান্য কারণে রমণীমোহনের রচনার সম্পূর্ণ তালিকা প্রণয়ন করা সম্ভব হয়নি।

বিষয়ানুযায়ী বিভক্ত রচনার তালিকাতে প্রথমে রচনাটির নাম, পরে প্রকাশিত হলে পত্রিকার সংক্ষিপ্ত নাম [যেমন—তাম্রলিপ্ত—তা, অপ্রকাশিত—অ ইত্যাদি] এবং সবশেষে প্রকাশের খ্রীষ্টাব্দ সাল মুদ্রিত হয়েছে।

বিষয়ানুযায়ী রমণীমোহনের রচনা-বিভাগ :

অনুবাদ [৯], আইন/বিচার [১৫], ইতিহাস/ইতিহাসের গল্প/স্বাধীনতা সংগ্রাম সেকালের কথা [৪২], গ্রাম/সমাজ উন্নয়ন [৩৩], স্থানীয় পরিচয় [৩৫], স্মৃতিকথা/মণীষী কথা [৫৬], পঞ্চায়েত ও সমবায় [৯], ভারত ভাবনা/জাতীয় সংহতি [১৬], রাজনীতি/নির্বাচন, [১৮], শিক্ষা/শিক্ষক/মূল্যবোধ [২৭], সামাজিক আচার-বিচার-সংস্কৃতি [১৬], ঈশ্বর/ধর্ম/শাস্ত্র ব্যাখ্যা [১৯], পত্র পত্রিকার কথা [৮], ভ্রমণ কাহিনী [১০], ভাষা-সাহিত্য [১৪], নাটক/নাটিকা [২], কবিতা [৬০], সমসাময়িক বিষয় [৮৫], বিবিধ [৫২], দৃষ্টিপাত [পথের খবর ও উলটপুরাণ শিরোনামে মোট ৬৫টি রচনা, শ্রীপথিক ছদ্মনামে রচিত]

অনুবাদ

ওড়িয়া ব্যাকরণ/অ/৮১
রামায়ণ-কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড/অ/ ২৪
বেঙ্কটেশ মাহাত্ম্য/অ/৮৭
মেদিনীপুরের ইতিহাস/অ/৭৬
অপমানিতা [অস্কার ওয়াইল্ডের A women of no importance নাটকের বঙ্গানুবাদ] অ ৯০

মেরী অসফলতা/অ ৮৭
শ্রীঅরবিন্দ/অ
শ্রীমদ্‌ভাগবতগীতা/অ/৮১ [ওড়িয়া লেখক ফকির মোহন সেনাপতিকৃত গ্রন্থের বাংলা লিপিকরণ]
শ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ/অ/১৯৭১ [স্বামী ব্রহ্মানন্দসঙ্কলিত হিন্দী বই]

আইন/বিচার কথা

ইতিহাস/ইতিহাসের গল্প/স্বাধীনতা সংগ্রাম/সেকালের কথা

গ্রাম/সমাজ উন্নয়ন

স্থানীয় পরিচয়/ইতিকথা

জাগ্রত মেদিনী/তা/৯৪
টাঠারিবাড় বালিকা বিদ্যালয়/অ
তমলুকের সে একদিন/তা/৮৭
হিজলী ক্যানেলের কথা/অ
হে অতীত কথা কও/গুণ/৮৪
Villages of lower Bengal/অ

স্মৃতিকথা/মনীষী কথা

অদ্ভুত সংবর্ধনা/অ/৭৬
অহিংসা-সত্য-করুণা/গুণ/৮৫
আমি যে তাঁদের দেখেছি/অ
আমার কবিতা লেখার কথা/অ
আমার ছাপাখানা/অ
আমার জীবন আমার কাল/অ
আমার জীবনে শ্রীশ্রীঠাকুর/অ
আমার জীবনে দৈবসংযোগ/অ
আমার জুরার জীবন/অ
আমার মায়েরা/অ
আমার স্কুলের স্মৃতি/স্মরনিকা/৯১
আবার সেবা কার্য/অ
আমার স্মৃতিতে কুমারচন্দ্র/স্মরনিকা/৮৯
আমরা যাদের ভুলে যাচ্ছি/তা/৯৭
আমাদের গুণধর বাবু/গুণ/৮৪
আমাদের দেখা গান্ধীজী/অ
আমাদের জীবনে গান্ধীজী ও ভারত/তা/৯৮
আমাদের দেখা বীরেন্দ্রনাথ/অ
আমাদের সতীশবাবুর কাজ/তা/৮৭
আমাদের মাথার মণি চিন্তামণি/অ
উপেক্ষিত হলেও যাঁদের কথা ভোলা যায় না/তা/৮৫
কবি পূর্ণচন্দ্র দাস/গুণ/৮৫
করুণাময় শ্রীরামকৃষ্ণ/অ
কাজী দাদার কথা/গুণ/৮৫
A straggler of 20/অ
About old Age/অ
Freedom movement in Mahisadal/অ
কে এই বাঙালী/তা/৮৮
গান্ধী স্মৃতি/তা/৯৭
গান্ধীজীর স্মৃতি/৩/৮৭
গান্ধীজীর কটিবস্ত্র/গুণ/৮৫
দেউলপোতার স্মৃতি/স্মরনিকা/৮৫
নাটক নিয়ে দুচার কথা/তা/৮৯
পথিক হৃদয় [আত্মজীবনী]/৭৬
পণ্ডিতপ্রবর সতীশচন্দ্র/গুণ/৮৫
প্রথম স্বাধীনতা দিবস একটি বিবরণ/অ
বড় দেহে বড় প্রাণ আমাদের দেশপ্রাণ/তা
বিশ্ববন্দিতা মা টেরেসা/গুণ/৮৫
বেলুড়মঠের স্মৃতি/অ
ভ্রমণকারীর চোখে/তা
মহাবিদ্রোহী মহাত্মা/অ
মহিষাদলে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী/গুণ/৮৫
মাতঙ্গিনী হাজরা/কিশলয়/৮৮
যাঁদের আগমনে মহিষাদল গৌরবান্বিত/গুণ/৮৪
শ্রুতিনাথ চক্রবর্তীঃ নমো তস্মৈ শ্রীগুরবে/তা/৯১
সতীশচন্দ্রের স্মৃতি/অ
সে এক কি দিনই ছিল/তা/৯০
সেকালের কর্তাবাবু/অ
স্বাধীনতা সংগ্রামে মহিষাদল/অ
হিন্দী কবি নিরালাজী/গুণ/৮৫
Our Most Merciful Mother/অ

পঞ্চায়ত ও সমবায়

ভারত ভাবনা/জাতীয় ঐক্য সংহতি

রাজনীতি নির্বাচন ভোট

শিক্ষা/শিক্ষক/মূল্যবোধ

সামাজিক আচারবিচার সংস্কৃতি

ঈশ্বর/ধর্ম/শাস্ত্রব্যাখ্যা -

পত্রপত্রিকার কথা

ভ্রমণ কাহিনী

ভাষা/সাহিত্য

নাটক/নাটিকা

কবিতা

সমসাময়িক বিষয়

বিবিধ রচনা

একদিকে দুটি চোখ/গুণ/৮৫
কথা শুধু কথার জাল/গুণ/৮৫
কি পড়িব ইতিহাস পড়ুন/অ
গোলমালের গোড়া/গুণ/৮৫
চণ্ডীমণ্ডপ ও সভা সমিতি/তা
ছোট ছোট দুটি কথা/তা/৯৭
জয় বাংলা/অ/১৯৮০
জীবন ও জীবিকা/তা
টাকা কড়ির কথা/তা/৯৫
টাকা খরচের কথা/গুণ/৮৫
দুটো পয়সার জন্য/তা/
দুকান কাটা গাঁয়ের ভিতর দিয়েই যায়/তা/
নাম ধাম কথা/তা/৯১
নাবালকের সংসার/তা
নিরুদ্দেশের খবর/গুণ/৮৫
নূতনযুগের নূতন কথা/তা
বইমেলা চলছে/তা/
বড়লোকদের ভুলও বড় হয়/তা
বড়দিন/গুণ/৮৫
মানুষ কি সত্যই অভিশপ্ত/তা
মানুষ করার কথা/গুণ/৮৫
মানুষের দাসত্ব/গুণ/৮৫
মানসিক রোগ/গুণ/৮৫
মিতব্যয়-অপব্যয়/গুণ/৮৫
যন্ত্র ও যন্ত্রণা/তা/৮৮
যাত্রার আসর/গুণ/৮৫
যেখানে যা সাজে/গুণ/৮৫
যেদিকে তাকাই কেবল শত্রু
রবীন্দ্রসঙ্গীতের উৎস সন্ধানে/অ
শোষণের স্বরূপ/তা/
শোষণের বহুরূপ/ল্যাকেট্টু/৮০
সতীদাহে ঢাক বাজে কেন/অ
সভ্যতার মাপকাঠি/তা/৮৭
সময়ের বড় অভাব/তা/৯৭
সময় কাটান বড় দায়/গুণ/৮৫
সীমিত থাকাই ভাল/তা/৮৮
সাইক্লোন-৪২/অ
সাধুসঙ্গ কথা/অ/
The forgotten Graves/অ/
[লণ্ডন নিউজিয়ামে প্রেরিত ও প্রশংসিত]

দৃষ্টিপাত

পথের খবর/শ্রীপথিক ছদ্মনামে অধুনালুপ্ত পল্লীজীবন পত্রিকায় ১৯৫৩/৫৪ সালে ২৬টি লেখা প্রকাশিত।

উলট পুরাণ/শ্রীপথিক ছদ্মনামে তমলুকের প্রদীপ পত্রিকায় ১৯৭১ থেকে ৪০ টির বেশি লেখা প্রকাশিত হয়।

প্রকাশকের তর্পণ

শ্রীমতী আলপনা মাইতি

উনিশ শ ছিয়াত্তর থেকে ছিয়ানব্বই, লোকান্তরিত রমণীমোহনকে আমার কাছে থেকে দেখার, তাঁকে সেবা করার পরম সৌভাগ্য হয়েছিল। প্রথম দেখা জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। তিনিই আমাকে দেখতে গিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য, তাঁর একমাত্র পুত্রের বধূ হিসেবে নির্বাচন করা। তখন তাঁর বয়স ছিয়াত্তর হলেও, রমণীমোহনের দীর্ঘ ঋজু চেহারা, উজ্জ্বল বর্ণ, সাদামাঠা পোষাক, উত্তরীয়, সতেজ কণ্ঠস্বর, বাচনভঙ্গী, মানসিক সজীবতা সবই ছিল চোখে পড়ার মত।

পরে জেনেছি, আমার বিবাহের দিন তিনি বলেছিলেন : 'শ্রীশ্রীমা [সারদাদেবী] তাহলে এখন থেকে আমাকে দেখাশুনার ভার দিলেন এই মায়ের হাতে।' সত্যি বলতে আক্ষরিক অর্থেই অন্তিমশয্যায় তিনি আমার হাতে মাথা রেখেই সজ্ঞানে মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করলেন, রাসপূর্ণিমার অপরাহ্নে—১৯৯৬-এর পঁচিশে নভেম্বর।

ছিয়াত্তর বছর বয়স পর্যন্ত কর্মযোগী রমণীমোহনের যে সুদীর্ঘ কর্ম জীবনের ঘটনাপ্রবাহ তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় হয়নি। কিন্তু তাঁর জীবনের শেষ কুড়ি বছর প্রায় প্রতিদিন ভোর থেকে শুরু করে তাঁর জীবনচর্যার যে পরিচয় পেয়েছি, জেনেছি, সেও অবিস্মরণীয়। এমন সারল্য, অকপটতা, মমতা, এমন ঈশ্বরানুরাগ আমার এই সামান্য জীবনে দ্বিতীয় আর দেখিনি। একালে— এই বিংশ শতাব্দীর শেষেও এমন বিষয়-বৈরাগ্যহীন মন, আচরণ যে সংসারী মানুষের হতে পারে তা অন্তরঙ্গ রমণীমোহনকে কাছে থেকে কেউ দেখে না থাকলে বিশ্বাস করবেন না।

বই আর লেখালেখি ছাড়া রমণীমোহনকে ভাবাই যায় না। সব সময়ই প্রায়ই পত্র পত্রিকাদি পড়তেন— এমন কি খাওয়াদাওয়ার সময়েও। বিচিত্র ধরনের বিচিত্র স্বাদের ছিল এই সব বই; এমন কি বিভিন্ন ভাষার। লেখালেখি সাধারণত সকালের দিকে করতেন, কখনও বা বিকেলে। 'গুণধর' পত্রিকা সম্পাদনার সময় ভোর রাতে উঠেও লিখতে দেখেছি। নিয়মিত খবরের কাগজ পড়তে পছন্দ করতেন। সন্ধ্যাবেলা রেডিও শুনতেন। বিবাহের পরেও আমি বেশ কিছু দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতাম, এম.এ. পড়তে, লাইব্রেরি অ্যাণ্ড ইনফরমেশন সায়েন্স পড়তে। কলকাতা থেকে ফিরতে রাত হত। উনি দাঁড়িয়ে থাকতেন অশোকনগর স্টেশনের প্রান্তে। ট্রেন থেকে নেমেই আমি বলতাম— বাবা, আমি এসেছি— তখন ওঁর উদ্বেগ কমত। তারপর দুজনে হেঁটে হেঁটে কথা বলতে বলতে বাণীপুরের বাসায় ফিরতাম। যখন সংস্কৃত এম. এ পড়ছি তখন আমার জন্য সংস্কৃত কাব্য নাটকাদির সমালোচনা লিখে দিতেন। আবার যখন ইংরেজি নিয়ে এম. এ. পড়া শুরু করলাম—তখন ইংরেজি নাটক-কবিতাদির সমালোচনামূলক প্রশ্নোত্তর

তিনি আমার জন্যে লিখতে আরম্ভ করেন। আমার পড়ালেখায় তাঁর আগ্রহ-উৎসাহ যে কীরূপ ছিল, তার সামান্য পরিচয় দিতেই এই ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের অবতারণা। বহু বিষয়ে রমণীমোহনের পাণ্ডিত্য যে কী সুগভীর ছিল, এই ঘটনা তার উজ্জ্বল নিদর্শন। সর্বার্থেই রমণীমোহন ছিলেন সরস্বতীর বরপুত্র।

আমার পরম সৌভাগ্য তাঁর সঙ্গেই আমি প্রথম জয়রামবাটি-কামারপুকুর দর্শন করি, আমার বিবাহের কয়েকমাস পরেই। আবার ১৯৯৩ সালে রমণীমোহনের সর্বশেষ জয়রামবাটি-কামারপুকুর দর্শনের সঙ্গীও ছিলাম আমি। সেবারে তাঁর পৌত্রদ্বয় ময়ূখ-ভাস্বরও দাদুর ভ্রমণসঙ্গী ছিল। রমণীমোহন জয়রামবাটিতে মায়ের মন্দিরের ভেতরে প্রবেশ না করে প্রবেশপথের বাইরে বসে রইলেন। পরে তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন : 'আমি কিন্তু মন্দিরের ভেতর যাইনি বাবা! আমি মন্দিরের বাইরে বসে বেশ দেখতে পাচ্ছিলাম [মানস দৃষ্টিতে], আমার মা এই পথেই ছোটবেলায় কতবার যাতায়াত করেছেন।' তাই চুরানব্বই বছরের মানুষটি যখন বলেন, 'আমিই তোমাদের সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম' তখন অভিভূত না হয়ে পারি না।

জনসভায় রমণীমোহনের সর্বশেষ ভাষণের কথাগুলি আজও আমার কানে বাজে। ভারতের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১৯৯৬ সালের স্বাধীনতা দিবসে তমলুক রাজবাটি ময়দানে রমণীমোহনকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া। সম্বর্ধনার উত্তরে ছিয়ানব্বই বছরের রমণীমোহন স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অংশগ্রহণের কথা যে বিনম্রতার সঙ্গে উল্লেখ করে উপস্থিত শত শত মানুষকে, দিনের কিছুটা সময়—অন্তত পাঁচটা মিনিট, দেশের কথা ভাবার জন্য মর্মস্পর্শী ভাষা, কণ্ঠস্বর ও ভঙ্গিতে আহ্বান জানান তা ভোলার নয়।

একবার বাড়ির পাশে দোলমেলার দিন বিকেলবেলা আমি বললাম—বাবা, দোল দেখতে যাবেন। নব্বই উত্তীর্ণ রমণীমোহন শিশুর মত বললেন, আমার যে পয়সা নাই! প্রতিবছর দুর্গাপূজার সময় প্রতিমা দর্শনে যেতেন। কতবার গ্রামের গৌরাঙ্গ মেলার দিন হরিলুটের বাতাসা কুড়িয়ে এনে আমার হাতে দিয়েছেন। প্রতিবেশী গ্রামে অবস্থিত সত্যপীর-এর মহিমায় ছিল অগাধ বিশ্বাস। ধর্মীয় আচার আচরণ নিয়ে কণামাত্র সংস্কার দেখিনি। কতদিন দেখেছি, দেয়ালে রাখা শ্রীশ্রীমা ও শ্রীশ্রীঠাকুর-এর ছবিতে টর্চের আলো ফেলার পরে জপ ধ্যানে বসছেন।

ঘটনাচক্রে রমণীমোহনকে, স্থানীয় মহকুমা হাসপাতালে দুরাত কাটাতে হয়েছিল—খুবই অব্যবস্থা ও কষ্টের মধ্যে। সেদিন ছিল কালীপূজার রাত। রোগশয্যায় শুয়েও গভীররাতে তিনি বললেন, কবিতা শোনাতে পার! চেতনা-অর্ধচেতনার মাঝে রমণীমোহন বললেন—'আমি এখন কোথায় বল দেখি? আমি এখন কামারপুকুরে, আমার ঠাকুরের জন্মদৃশ্য দেখছি—আমার ভস্মমাখা ঠাকুর!' ঘন্টাখানেক যাবৎ বলে চললেন— শ্রীশ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের জীবনের নানা কথা। এমনই ছিলেন রমণীমোহন।

রমণীমোহন অনেক সময়ই ভোরবেলা উঠে কাউকে কিছু না বলে তমলুক-মহিষাদল বা অন্যত্র চলে যেতেন। কারুর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ বা কাগজে লেখা দেবার জন্যে।

নব্বই অতিক্রান্ত মানুষটিকে এ নিয়ে অনুযোগ করলে বলতেন, আমার পিছনে লোক আছে! মায়ের কৃপা আছে। আমি 'গুরু' বলে বলীয়ান!

মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন আগে হঠাৎ বলতে থাকলেন ভয় করছে! কীসের ভয়— জিজ্ঞাসা করায় বললেন, ভয়টাকে তোমরা তাড়াও! একদিন বললেন, পঁচিশ তারিখটা কবে— আর কদিন আছে। অন্য একদিন বললেন, দাদা এসেছিলেন। [রমণীমোহনের বড়দাদা ধরণীধর—শিক্ষক ছিলেন—উঁচুদরের জ্যোতিষচর্চা করতেন] দাদাকে আমি বললাম—দাদা আমি আর কতদিন আছি? দাদা বললেন, পঁচিশ তারিখটা যাক তারপর বলব। আর একদিন অস্থির হচ্ছেন দেখে—শেষের কদিন ঘুমাতে পারতেন না, শুলে কষ্ট হত— বললাম, শান্ত হন বাবা। তিনি বললেন— আমি শান্ত আছি— তোমরা সাবধানে থেকো। মৃত্যুর পূর্বদিন বললেন, এবার তোমরা আমাকে ছাড়,— যা কেউ কখনো করেনি, তুমি তাই করেছ মা, আমাকে এবার ছেড়ে দাও। নাতিদের বললেন— তোমরা আমাকে অমন করে ঘিরে থেকো না—এবার ছাড়—তোমরা না ছাড়লে আমি যে যেতে পারছি না!

২৫শে নভেম্বর অতি প্রত্যুষে আমার শাশুড়ীমাতার কাছে যেন অনুমতি চাইছেন, এভাবে বললেন— 'আমি এবার যাই'। সকাল হল। শীতের সূর্যালোক এসে পড়ল বারান্দায়। রমণীমোহনকে বারান্দায় নিয়ে আসা হল। কিছুক্ষণ বসলেন। জিজ্ঞাসা করলাম বাবা, এখন শোবেন। তিনি স্পষ্ট বললেন— হাঁ। অনেক দিন পরে শান্ত হয়ে শুলেন, নিদ্রাভিভূত হলেন। ডাকলে মাঝে মাঝে সাড়া দিচ্ছিলেন— সামান্য জলও খেলেন। শীতের সূর্য অস্তাচলমুখী, অপরাহ্ণ ৩.৪০ মিনিটে রমণীমোহনের জীবন-প্রদীপ নির্বাপিত হয়ে গেল। রমণীমোহনের 'দিন রাতের বাসনা' ছিল, 'মায়ের দেশেতে যাব' আজ এতদিনে পূর্ণ হল।

□

আমরা জানি, 'মহৎ ব্যক্তিত্বের কর্মগুলিই তাঁর কীর্তি বলে প্রকীর্তিত হয়। চিরদিন কীর্তিমান তার কীর্তির চেয়ে মহৎ।' রমণীমোহন কেমন মানুষ ছিলেন, সমকালীন দেশবাসী তাঁকে কীভাবে চিনেছিল, বুঝেছিল, উপলব্ধি করেছিল, তা হয়তো কোনো না কোনো একদিন তাঁর গুণমুগ্ধ কোন দেশবাসী তুলে ধরবেন। বর্তমান সমাজের রীতি অনুসারে তাঁর কোনো জয়ঢাক ছিল না। সুতরাং একাজ হয়তো নিরপেক্ষ গবেষকের কাছে খুবই কঠিন হবে। রমণীমোহন সর্বার্থেই গীতার মানুষ ছিলেন। আত্মপ্রশংসা বিমুখ, নিরভিমান, সদাপ্রসন্ন, স্বার্থশূন্য। রমণীমোহন গেরুয়াধারী ছিলেন না— কিন্তু অন্তরে ছিলেন এক সন্ন্যাসী। মহাত্মা গান্ধীর সত্য ও অহিংসা পথের পথিক, বিবেকানন্দের সেবাধর্মে উদ্বুদ্ধ রমণীমোহন গীতার নিষ্কাম ধর্ম অনুসরণ করে, সংসার ও সমাজে প্রায় এক শতাব্দী নির্ভয়ে ভ্রমণ করেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন, 'বাউলের দল, হঠাৎ এল, নাচল গাইল, তারপর হঠাৎ চলে

গেল, কেউ তাদের চিনল না জানল না।' রমণীমোহনের প্রায় শতবর্ষব্যাপী জীবনের পরিপূর্ণ ও সম্যক পরিচয় বর্তমান প্রচারসর্বস্বতার যুগে তাঁর প্রিয় দেশবাসীর কাছে কতখানি কীরূপ পরিস্ফুট তা আমার জানা নাই। কোনোদিন তা স্পষ্ট হবে কিনা তাও জানিনা। কেবল মনে হয়— 'An honest soul is the greatest creation.'— তার কিছুটা পরিচয়ও যদি লোকচক্ষে তুলে ধরা যায়—অন্তত তাঁর নিজের লেখার মাধ্যমে। রমণীমোহন শতবার্ষিক উপলক্ষে প্রকাশিত এই রচনা-সংগ্রহ তারই বিনম্র প্রয়াস। অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে সেই সব পত্রপত্রিকার সম্পাদককে কৃতজ্ঞতা জানাই, যাঁরা রমণীমোহনের রচনাগুলি প্রকাশ করার বিষয়ে দীর্ঘকাল ধরে আগ্রহ দেখিয়েছেন।

রমণীমোহন শতবার্ষিক রচনা-সংগ্রহের জন্য অগ্রিম গ্রাহক সংগ্রহে যে সকল উদারহৃদয় মানুষ সহায়তা করেছেন, তাঁদের প্রত্যেককেই আন্তরিক শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। লোকান্তরিত রমণীমোহনের আত্মার আশীর্বাদ তাঁরা সকলেই পাবেন, এই আশাও রাখি। আমার দৃঢ় প্রত্যয়, সমাজসেবায় নিবেদিত এক মহাজীবনের কিছুটা পরিচয় জনসমক্ষে 'বহুজনহিতায়' তুলে ধরার এই প্রয়াস, আগামী শতাব্দীতে জনচেতনা বিকাশে সহায়ক হবে। অর্থাভাবে পরিকল্পনামত রমণীমোহন রচনা-সংগ্রহের আয়তনবৃদ্ধি ও অঙ্গসজ্জা করা সম্ভব হল না, এজন্য সকলের ক্ষমাসুন্দর প্রসন্নতা প্রার্থনা করি। প্রকৃতপক্ষে বইয়ের মুদ্রিতমূল্যাপেক্ষা মুদ্রণব্যয় বহুগুণ বেশী হওয়ায়, ইচ্ছা থাকলেও এটা করা যায়নি।

পরিশেষে, বিশিষ্ট গবেষক-লেখক পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির প্রকাশন সম্পাদক রমণীমোহনের সবিশেষ স্নেহধন্য ছাত্র ড. প্রভাতকুমার দাস তাঁর অতি ব্যস্ততার মধ্যেও রমণীমোহন রচনাসংগ্রহ সম্পাদনায় সম্মত হওয়ায় আমরা তাঁর নিকট আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

রমণীমোহনের বর্তমান রচনা সংগ্রহ প্রকাশের ও অগ্রিম গ্রাহক সংগ্রহের কাজে প্রেরণা, উৎসাহ দিয়ে বিভিন্নভাবে বিভিন্নপর্বে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীসুশীলকুমার ধাড়া, শ্রীমুরারিমোহন সামন্ত, শ্রীকৃষ্ণপদ মাইতি, শ্রীগণেশচন্দ্র সামন্ত, শ্রীসুভাষ বর্মন, শ্রীসুধাংশু বারিক, শ্রীচিত্তরঞ্জন মাইতি, শ্রীকার্তিকচন্দ্র দোলই, শ্রীমাখনলাল রায়, শ্রীজগদীশচন্দ্র মাইতি, শ্রীনারায়ণচন্দ্র মাইতি, শ্রীনিরঞ্জন বেরা, শ্রীরঘুনাথ পণ্ডা, শ্রীহিরন্ময় চক্রবর্তী, শ্রীমনোরঞ্জন দাস, শ্রীবাদলচন্দ্র মাল, শ্রীঅমিয়কুমার দিণ্ডা, শ্রীগুরুপদ মাইতি, তাজপুর গ্রামোদ্যোগ সমিতির পরিচালনা সমিতির সদস্যবৃন্দকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমাদের বাল্যের শিক্ষক মহাশয়গণ
ভগবানের দূতরূপেই
আমাদের স্বর্গের পথ সরল করে
দিয়ে গেছেন।
তাঁদের স্মরণমাত্র নয়নে অশ্রু
সঞ্চার হয় না এরূপ পাষন্ড বোধহয়
সংসারে জন্মগ্রহণ করে নাই।
মাষ্টারমহাশয়ের মধ্যে যাঁরা ছোট-বড়
উপাধি দেন আমরা তাদের পছন্দ করি না।
—তুলসীপত্রের ছোট-বড় হয় না
উভয়েই নারায়ণের মস্তকে স্থান লাভ করে।

শ্রীরমনী-মোহন মাইতি